পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস

আধুনিক যুগ — যুক্তিবাদ

(দেকার্ৎ, স্পিনোজা ও লাইবনিজ)

[The History of Western Philosophy]

[Descartes, Spinoza and Leibnitz]

চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য
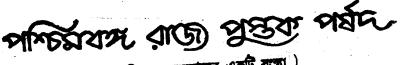
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

PASCHATYA DARSHANER ITIHAS

By— Chandrodaya Bhattacharya

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬ এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
কলিকাতা–৭০০০১৩

মুদ্রক :
শ্রীদুর্গা প্রসাদ মিত্র
এলম্ প্রেস
৬৩, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা–৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ :
শ্রীকমল শেঠ

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

ভূমিকা

অল্পবয়স থেকেই পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস লেখার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। ১৯২৫ সালে এই কাজ আরম্ভ করেছিলাম। তখন এই বিষয়ে আমার প্রধান উপজীব্য ছিল শুয়েগ্‌লার-প্রণীত ইতিহাসের স্টার্লিং-কৃত ইংরেজী অনুবাদ। গ্রীক দর্শনের প্লেটো-এরিস্টটল-পূর্ববর্তী ইতিহাস সম্পূর্ণও করেছিলাম। তারপর, বহু বৎসর নানা বাধা-বিঘ্নে, একাজে আর অগ্রসর হতে পারি নি। ১৯৪০ সালে আবার এতে হাত দিতে পারলাম। আমার দর্শন-শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু শ্রদ্ধেয় ডঃ রাসবিহারী দাসের (মৃত্যু ১৯৭৩) উৎসাহ ও সাহায্যে এটা সম্ভবপর হয়েছিল। তাঁরই কথায়, এবার আগে আধুনিক দর্শনের ইতিহাস লিখতে প্রবৃত্ত হই; এবং দেকার্ৎ ও স্পিনোজা লিখিত রচনাবলীর সহজে প্রাপ্য ইংরেজী অনুবাদগুলো, লক্, বার্কলি ও হিউমের বিশেষতঃ বার্কলির রচনাবলী ও কাণ্টের মাইকেল্‌স জন-অনূদিত 'ক্রিটিক্' পড়তে থাকি ও সঙ্গে সঙ্গে লেখার কাজও চলতে থাকে। ১৯৪৫ সালের শেষদিকে, যুক্তিবাদীয় আধুনিক দর্শনের[1] ইতিহাস কাণ্ট পর্যন্ত লিখে, আবার এই কাজে বাধা পড়ল। দর্শনেতিহাসের যে অংশটুকু লেখা হল, তার জন্য ফালকেনবের্গ-প্রণীত ও এ. সি. আর্মস্ট্রং-অনূদিত 'আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে'র ওপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভর করেছিলাম। এখন, আবার পাঁচ-ছয় বছর যাবৎ এই ইতিহাস সম্পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করছি। কাণ্টের দর্শন প্রায় লেখা হয়ে গেছে। তদুপরি, ইংরেজী অনুভববাদী লক, বার্কলি ও হিউমও লেখা হয়ে গেছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সরকার আমার লিখিত দেকার্ৎ, স্পিনোজা ও লাইবনিজ, এই তিনজন যুক্তিবাদী[2] দার্শনিকের মত প্রকাশ করতে সম্মত হওয়ায়, আমি আমার আগের লেখার এই অংশটি কিছু সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের পর, আন্তরিক ধন্যবাদ সহ, তাঁদের হাতে সমর্পণ করছি।

দেকার্ৎ আধুনিক দর্শনের পিতা বলে, তাঁর দর্শনের সামান্য বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে, অপেক্ষাকৃত কিছু বেশি আলোচনাও করেছি। এই কাজে

---

1 Modern *rationalism.*

2 Rationalists.

ও'কনর-সম্পাদিত 'এ ক্রিটিক্যাল হিস্টরি অব ওয়েস্টার্ণ ফিলসফি' নামক গ্রন্থ থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 'দর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত আমার 'দেকার্তের সংশয়বাদ' শীর্ষক প্রবন্ধটির প্রায় সবটুকুই বর্তমান পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করলাম। এর অনুমতির জন্য 'দর্শন' পত্রিকার সম্পাদকদের কাছে আমি ঋণী।

ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব ফিলসফি, কলিকাতা } চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য

বৈশ্লেষণিক সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুক্তিবিচার বা প্রজ্ঞার স্থান। প্রজ্ঞাজনিত জ্ঞান হচ্ছে সাক্ষাৎ আন্তর উপলব্ধি। আধুনিক যুক্তিবাদের ভিত্তি। যুক্তিবাদ বলতে কি বোঝায়? স্পষ্টতা, বিবিক্ততা ও সম্পূর্ণ বোধগম্যতা হচ্ছে সত্যতার নির্ণায়ক। (পৃ: 8—11)। ধারণা শব্দের দেকার্তীয় অর্থ। এর সম্প্রতিকালীন সমালোচনা। (পৃ: 11—12)। সংশয় পদ্ধতি : দেকার্তীয় সংশয় একটি সাদাসিধে স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা নয়। এই সংশয়ের বিষয় হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত সম্ভবপরত্ব। সুতরাং এই সংশয় ও যুক্তিবাদীয় পদ্ধতি পরস্পরের সমর্থনকারী ও পরিপূরক। (পৃ: 13—14)। ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান ও স্বপ্ন। স্বপ্নদৃষ্টান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি ও তার নিরসন। গণিতের বিধান সম্পর্কে সংশয় অযৌক্তিক নয় কি? অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী দুষ্ট দানবের সম্ভাবনা। এই সংশয় চিন্তার মূল নিয়ম-গুলোকে তার আওতায় আনতে পারে না। দেকার্তীয় কৃত্রিম সংশয়ের উদ্দেশ্য। দেকার্ৎ-পরিকল্পিত চতুর প্রতারকও এক জায়গায় প্রতারণা করতে অসমর্থ। "আমি সংশয় করছি, অতএব আমি আছি।" সংশয়কারী নিজের অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য। এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি। আপত্তির উত্তর। (পৃ: 14—18)।

কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ নিঃসন্দিগ্ধতার দ্বারা ধারণার শুধু সম্ভব-পরতাই সিদ্ধ হয়, তার সত্যতা সিদ্ধ হয় না। সাক্ষাৎ অনুভব বা তদাশ্রয়ী অনুমানই ধারণার সত্যতার নির্ণায়ক। "আমি চিন্তা করছি, অতএব আমি আছি", এরাও সত্যতা সাক্ষাৎ অনুভবেই নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হয়। 'চিন্তা' শব্দের দেকার্তীয় অর্থ। এই চিন্তা হচ্ছে স্বপ্রকাশ। চিন্তন-ক্রিয়া ও 'আমি'র সম্বন্ধ। "আমি চিন্তা করছি, অতএব আমি আছি" এই 'অতএব' শব্দের বিশ্লেষণ। দেকার্তীয় সংশয়ের আধুনিক দার্শনিক চিন্তায় স্থান। (পৃ: 20—23)।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব : ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণার অর্থ ও উৎস। নিজৈক-সত্তাবাদ। ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ। সত্তাজ্ঞাপক যুক্তি। ঈশ্বরের সততা বা সত্যবাদিতা দিয়ে, ধারণার স্পষ্টতা ও বিবিক্ততা যে ধারণার সত্যতা-নির্ণায়ক, তার সমর্থন হয়, এই মতটিতে কি অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আছে? এই প্রশ্নের দেকার্ৎ-প্রদত্ত উত্তর। এর্ডমান-এর উত্তর : জ্ঞানের হেতু ও অস্তিতার হেতু। (পৃঃ 24—28)।

দ্রব্য : দ্রব্যের লক্ষণ। দ্রব্য তিনশ্রেণীতে বিভাজ্য : (1) অপরিচ্ছিন্ন ঈশ্বর-রূপ চেতন দ্রব্য, (2) মন বা জীবরূপ পরিচ্ছিন্ন চেতন দ্রব্য এবং (3) জড়-বস্তুরূপ পরিচ্ছিন্ন বিস্তারাত্মক দ্রব্য। অত্যন্ত বিলক্ষণ চেতন ও জড়তত্ত্বের দ্বৈতবাদ। এর সমালোচনা। দার্শনিক বিচারে দেকার্তের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানগুলো কি? (পৃঃ 28—31)।

জড়জগৎ বা প্রকৃতি : জড়জগতের অস্তিত্বে প্রমাণ। জড়বস্তুর স্বরূপ হচ্ছে বিস্তৃতি। এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি ও তার উত্তর। বিস্তৃতি মানে শূন্য দেশ নয়। আসলে শূন্য দেশ বলে কিছু নেই। পরমাণুবাদ ভুল। দেশ = বিস্তৃতি = জড়দ্রব্য। জড়দ্রব্য সংখ্যায় একটিই। তা সর্বদাই গতিশীল। কোনো বিশিষ্ট জড়খণ্ড বা পিণ্ডের গতি, আর সমগ্র জড়বস্তুর গতি এক নয়। এক পিণ্ডের গতি ও বিস্তৃতি অন্যান্য পিণ্ডের গতির অল্পতা ও আধিক্যের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সমগ্র জড়দ্রব্য বা বিস্তৃতির গতি কোন কিছুর ওপর নির্ভর করে না। গতির অন্ত্যকারণ হচ্ছে ঈশ্বর। সর্ব গতি ও বিস্তৃতির মোট পরিমাণ জগৎসৃষ্টির সময়ে ঈশ্বর স্থির করে দিয়েছেন। গতির মূল নিয়মগুলো ঈশ্বরের স্বরূপ থেকেই নির্গত হয়। নিসর্গস্থ ঘটনার ব্যাখ্যা যান্ত্রিক নিয়মেই দিতে হবে। এসব ঘটনার কোনো উদ্দেশ্য নির্দেশ করা নিরর্থক। পৃথিবী তৎসংলগ্ন অন্যান্য

পদার্থের তুলনায় অচল ; সমগ্র ব্যোমমণ্ডল একপ্রকার তরল দ্রব্যে ভরা। আর তা অনবরত ঘূর্ণিঝড়ের মতন আবর্তিত হচ্ছে। (পৃঃ 32—37)।

মানুষ : মানুষের শরীর একপ্রকার যন্ত্র। জীবশরীর ও ঘড়ির মতন যন্ত্র একেবারে ভিন্নজাতীয় পদার্থ নয়। প্রথমটির অঙ্গবিন্যাস অধিক জটিল ও ঐক্য-সম্পাদক। অবশ্য মানুষের শরীর শুধু স্বয়ঞ্চল যন্ত্র নয়। কারণ, স্বয়ঞ্চল যন্ত্রে ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান অসম্ভব ; তাছাড়া, বিচারবুদ্ধিজনিত শারীরিক ক্রিয়াও তাতে থাকতে পারে না। জড়দ্রব্য থেকে আত্মার উৎপত্তি অসম্ভব। ঈশ্বর আত্মাকে জড়ের থেকে ভিন্নজাতীয় দ্রব্যরূপে সৃষ্টি করেছেন। তবু দেহ ও আত্মার বন্ধন শিথিল নয়। আবার দেহ-আত্মার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্যও নয়। পিনিয়েল গ্রন্থিতে দেহের সাথে আত্মার সংযোগ বিশেষভাবে সক্রিয়। (পৃঃ 39—40)। উদ্ভিৎ-চেতনা ও জীব-চেতনা দুটিই চেতনা হলেও, প্রথমটিকে চিন্তন বলা যায় না। চিন্তা বা জ্ঞানক্রিয়া হচ্ছে মানুষের মনের স্বরূপ। ইতরপ্রাণীরা চেতন যন্ত্রমাত্র। তাদের স্বপ্রকাশ অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি নেই। চিন্তন ক্রিয়া দুই-রকমের হয়—স্বাধীন ও পরাধীন। সঙ্কল্প ক্রিয়াটি স্বাধীন। সঙ্কল্পের সাথে জ্ঞানও থাকে। কিন্তু জ্ঞান-ক্রিয়া স্বাধীন নয়। (পৃঃ 40—42)। মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, ক্রিয়া, শক্তি প্রভৃতি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অসংবদ্ধ নয়। বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে একটি সামগ্রিক ঐক্য আছে।

দেকার্তের মতে, মানুষের অন্ততঃ এক ব্যাপারে স্বাধীনতা আছে ; আর তা হচ্ছে বিচার-স্বাধীনতা। (পৃঃ 42—46)।

ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার সাথে তাঁর সর্বব্যাপারে পূর্ববিধায়িত্ব থাকা সম্ভবপর কি ? স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ ও ঈশ্বরের কৃপা এদুটি কি পরস্পরের বিরুদ্ধ ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের বিবরণ। কয়েকটি দেকার্তীয় মতের যৌক্তিক প্রকটীকরণে স্পিনোজীয় মতের প্রতিষ্ঠা। আবেগ ভরা ভক্তি দিয়ে জীবের পক্ষে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার সম্ভবপর। আর এই ভক্তি হচ্ছে বিচারযুক্ত প্রেম। যৌক্তিক বিশ্লেষণ, গাণিতিক অবরোহ-পদ্ধতি এবং দার্শনিক চিন্তা। (পৃ: 78—82)। দেকার্তীয় যুক্তিবাদের সাথে স্পিনোজীয় যুক্তিবাদের তুলনা। তাদের গাণিতিক পদ্ধতির বৈষম্য। স্পিনোজার দার্শনিক বিচার-প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। দর্শনে গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগের অর্থাক্ষেপ। (পৃ: 83—84)। শরীর ও মনের সম্বন্ধবিষয়ক সমস্যায় স্পিনোজীয় সমাধান দেকার্তীয় সমাধানের চেয়ে বেশি সন্তোষজনক। দ্রব্যের একত্ব। (পৃ: 84—85)।

দ্রব্য, গুণ ও প্রকার: একাধিক দ্রব্য নেই। আর এই দ্রব্যই হচ্ছে ঈশ্বর। স্পিনোজার ঈশ্বরবিষয়ক ধারণা বনাম খৃষ্টীয় ধারণা। ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধ— ঈশ্বর হচ্ছেন প্রকৃতির মূল প্রকৃতি বা স্বভাব; তিনি প্রকৃতির প্রকর্তা বা স্রষ্টা নন। স্বাধীনতা মানে অন্তর্নিয়ন্ত্রণ ও তার অনিবার্য কার্যের জনকতা। উদ্দেশ্যমূলক কর্ম ঈশ্বরের পূর্ণতার বিঘাতক। অনন্ত দ্রব্য ও সান্ত পদার্থগুলোর সম্বন্ধ। বিশিষ্ট বা বিশেষণযুক্ত পদার্থ অপূর্ণ হতে বাধ্য। বিশেষণের দ্বারা আসলে অভাবই ব্যক্ত হয়। (পৃ: 87—88)। দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ। গুণের সংখ্যা। গুণগুলি কি দ্রব্যে মানববুদ্ধির দ্বারা আরোপিত ধর্ম? না, দ্রব্যের স্বরূপেরই অন্তর্গত? (পৃ: 89—91)। বিশেষ বিশেষ সান্ত পদার্থ-ব্যক্তিগুলো মূল দ্রব্যের অবস্থা বা প্রকার। আর অবস্থা বা প্রকারগুলো হচ্ছে ঈশ্বরের গুণেরই পরিণাম। বিস্তৃতির দুটি অবস্থা—স্থিতি ও গতি। চিন্তেরও দুটি অবস্থা—বুদ্ধি বা বিচার এবং সঙ্কল্প। অবস্থাগুলো স্বল্পকাল স্থায়ী। কাদাচিৎকত্বের

অর্থ হচ্ছে আছেও বটে, নাইও বটে। আদি কারণ হচ্ছেন ঈশ্বর। অবস্থাগুলো হচ্ছে দ্বৈতীয়িক কারণ। অবস্থা বা প্রকারের রাজ্যে কার্য-কারণীয় শৃঙ্খলে সবকিছু বাঁধা। মানসিক অবস্থাসমূহের পরম্পরা মনেই সীমাবদ্ধ। তেমনি বিস্তৃতির অবস্থা অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ গতির পরম্পরা বিস্তৃতিতেই সীমাবদ্ধ। এরা মানসিক অবস্থার ওপর কোনো পরিণাম ঘটাতে পারে না। তেমনি মানসিক অবস্থাগুলো বিস্তৃতির অবস্থার ওপর কোনো পরিণাম ঘটাতে পারে না। তবু, শারীরিক পরিণাম-পরম্পরা ও মানসিক পরিণাম-পরম্পরা, এদুটি মূলতঃ একই পরম্পরা—মনের বা চিত্তের দিক ও বিস্তৃতির দিক থেকে আলাদা আলাদা ভাবে দৃষ্ট হলেই এরা একেবারে ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়। (পৃ: 92—93)। জড়জগৎ ও মনোজগতের এই ভিন্নতা সত্বেও এদের অনুরূপতা আছে। স্পিনোজার এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি। অনন্ত বা অসীম অবস্থা = সর্বব্যষ্টির সুশৃঙ্খল সাকল্য। (পৃ: 95—96)।

ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের বিষয় হচ্ছে শরীরের পরিণাম বিশেষ। এটা জ্ঞানের প্রাথমিক স্তর। এই স্তরে বাহ্যবস্তুর এবং নিজের শরীর সম্বন্ধে যা জানা যায়, তা অবিবিক্ত ও খণ্ডিত। তথাপি এই জ্ঞান মিথ্যা নয়। অবশ্য ইন্দ্রিয়জ ধারণাকে পূর্ণাঙ্গ বলে ভাবলে, ধারণাটি মিথ্যা হয়ে পড়ে। মিথ্যা ধারণার উদাহরণ হচ্ছে জাতি বা সামান্যের বিধারণা, উদ্দেশ্যের কল্পনা, ঐচ্ছিক স্বাধীনতার কল্পনা প্রভৃতি। সুন্দর ও কুৎসিত প্রভৃতির ধারণা কল্পনার পর্যায়ে পড়ে। সঙ্কল্প নামক কোন পদার্থ নেই। তথাকথিত সঙ্কল্পও কল্পনার অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ বিশেষ কাজ করার ইচ্ছা নিশ্চয়ই সত্য পদার্থ। কিন্তু ইচ্ছার কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকলে, এবং ইচ্ছা জনিত কাজ সম্বন্ধে সচেতন হলে, আমরা ঐ ইচ্ছাকে স্বাধীন বলে কল্পনা করি। (পৃ: 97—98)।

বিচারজনিত জ্ঞানের পূর্ণতা ও সত্যতা থাকলেও, এই পূর্ণতার ও সত্যতার তারতম্য আছে। বিচারজনিত জ্ঞানের নিখুঁত উদাহরণ হচ্ছে দ্রব্য ও তার গুণগুলোর স্পিনোজীয় ধারণা। জ্ঞানের তিন প্রকার : (১) ঐন্দ্রিয়িক অর্থাৎ কল্পনামিশ্রিত ধারণা, (২) বিচারবুদ্ধিজনিত জ্ঞান ও (৩) প্রত্যক্ষানুভূতি। দ্বিতীয় ও তৃতীয়প্রকার জ্ঞান অবশ্যম্ভব ও নিঃসন্দিগ্ধ। পর্যাপ্ত জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে শাশ্বত-তত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বর, এবং তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে সর্ববস্তুকে বিচারবুদ্ধি সাক্ষাৎভাবে জানে (পৃঃ 98—99)।

ঘৃণা, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি হৃদয়াবেগগুলো মনুষ্যস্বভাবের অবশ্যম্ভব অঙ্গ। মানুষের সসীমতাবশতঃ ও তজ্জন্য অন্যান্য বস্তুর ওপর নির্ভরশীলতাবশতঃ এসব হৃদয়াবেগের উৎপত্তি হয়। স্বাস্তিত্ব বজায় রাখার মৌলিক প্রচেষ্টা প্রত্যেক পদার্থের স্বভাবের একটি অঙ্গ। এটা যখন মনের ধর্মরূপে বিবেচিত হয়, তখন তাকে সঙ্কল্প বা এষণা বলে। আর এই প্রচেষ্টা যখন শরীর ও মনের মিলিত ধর্ম বলে ভাবা হয়, তখন তার নাম ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লালসা ইত্যাদি। সঙ্কল্প মানে জ্ঞান-যুক্ত স্পৃহা।

ভালো মানে আমরা যা চাই। ভালো বলে যে আমরা কিছু চাই, তা নয়। সুখ মানে যা আত্মার চিন্তাশক্তি বাড়ায়; আর দুঃখ মানে যা মানুষের ক্রিয়াশক্তি কমিয়ে দেয়। হার্দিক-চেতনার তিনটি প্রধান শ্রেণী আছে : (১) এষণা, (২) সুখ এবং (৩) দুঃখ। প্রেম, বিদ্বেষ প্রভৃতি হৃদয়াবেগগুলো এই তিনটির বিভিন্ন মাত্রায় মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। যথা, সুখের সাথে তার বাহ্য কারণের ধারণা সংযুক্ত হলে, তাকে প্রেম বা ভালোবাসা বলে। হৃদয়াবেগের দুটি প্রকার আছে : পরাধীন ও স্বাধীন। সংযম, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতিকে হৃদয়াবেগ বলা যায় না। বরং এগুলো হচ্ছে স্বাধীন মনোবল। মনোবলের দুই

প্রকার : (১) আত্মিক বীর্য ও (২) ঔদার্য। (পৃঃ 100—103)।

বিধান ও ধারণা পরস্পরের সাথে অবিনাভাবে যুক্ত। জ্ঞানের যেমন কল্পনা ও বুদ্ধি বলে দুটি স্তর, তেমনি সংকল্পেরও দুটি স্তর : সাধারণ ইচ্ছা ও নিজ-নির্বাচিত ইচ্ছা। প্রথমটি কল্পনার দ্বারা এবং দ্বিতীয়টি বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিচারবুদ্ধি জনিত ইচ্ছা বা হৃদয়াবেগের বিষয় হচ্ছে শাশ্বত পদার্থ, অর্থাৎ পরমতত্ত্বের অথবা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আন্তরোপলব্ধি। পরাধীন ভাবাবেগ অবিবিক্ত ও বিমিশ্র ধারণা থেকে উৎপন্ন হয়। ধারণা স্পষ্ট ও বিবিক্ত হলে, পরাধীন ভাবাবেগের ওপর প্রভুত্ব লাভ সম্ভবপর। ধারণা স্পষ্ট করার উপায় হচ্ছে, ধারণার বিষয়টিকে, তা কার্যকারণীয় সম্বন্ধে যে সমগ্রের অন্তর্গত, তার সাথে সম্বদ্ধভাবে অর্থাৎ ঐ সমগ্রের একটি অপরিহার্য অংশ-রূপে উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধিতে একপ্রকার নির্মল আনন্দ আছে। আর এই নির্মল আনন্দ ঈশ্বরের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক প্রেমের সাথে জড়িত। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা ও তাঁকে ভালোবাসা হচ্ছে আসলে প্রজ্ঞাপ্রসূত প্রেম। (পৃঃ 104—105)।

মানবাত্মার শাশ্বত অংশটির নাম প্রজ্ঞা বা বিচার-বুদ্ধি। এরই শক্তিতে মানুষ স্বয়ং-ক্রিয় হয়। খারাপ, অহিত এবং অমঙ্গল মানে যা বিচারবুদ্ধির বিকাশে ও যুক্তি-সঙ্গত জীবনযাপনে বাধা দেয়।

সক্রেটিসের মতন স্পিনোজার দর্শন বিচারবুদ্ধি বা প্রজ্ঞার ওপর অর্থাৎ প্রজ্ঞার অন্তর্দৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বেঁচে থাকার যে সহজাত প্রবৃত্তি মানুষের ভেতর বিদ্যমান, তার স্বাভাবিক গতি হচ্ছে জ্ঞানের পূর্ণতা-সম্পাদনের দিকে ; আর জ্ঞান হচ্ছে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বা অংশ। সব মানুষ নীতিমান হয় না কেন? সব মানুষ জ্ঞানের পূর্ণতা-সম্পাদনে চেষ্টা করে না কেন? অপূর্ণতার ব্যাখ্যা কি? অপূর্ণতা কোন

ভাব-পদার্থ নয়। পূর্ণতার নানা মাত্রা দেখে, অপূর্ণতার কল্পনা করা হয়। (পৃ: 106—108)। মূল্য-বোধক ধারণাগুলো বস্তুশূন্য কল্পনামাত্র। এর অবশ্য সত্য প্রতিষ্ঠান আছে। আর তা হচ্ছে আমাদের চিত্তে যা যা সুখ বা দুখ জন্মায়। তাকেই ভালো বা মন্দ বলা হয়। কিন্তু স্ব-স্বরূপে বিবেচিত হলে, প্রত্যেক পদার্থই পূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে। মূর্খ ও পাপী সবাই আসলে পূর্ণতারই অধিকারী—শুধু জ্ঞানী ও পুণ্যাত্মার পাশে তাকে মূর্খ ও পাপী বলে মনে হয়। বাহ্য কারণের দ্বারা প্রভাবিত হবার সম্ভাবনাই মানুষের পাপাচরণের হেতু। একমাত্র উন্নতচরিত্রের লোকেরাই এই বাহ্য প্রভাব সত্ত্বেও স্বীয় স্ব-নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে। ঈশ্বর যা কিছু স্রষ্টব্য বলে মনে করেন, তাই অস্তিত্ববান বস্তুরূপে পরিণত হয়। সব মানুষ বিচারবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয় না, ভগবান এরকম করলেন কেন? এর কারণ এই যে, পূর্ণতার যতগুলো মাত্রা বা স্তর সম্ভবপর, ঈশ্বর সে সবই সৃষ্টি করেছেন। আর, এগুলোর ভিতর নিম্নতম স্তরে পাপ ও ভ্রান্তি রয়েছে। পূর্ণতার নিম্নতর মাত্রা বাদ দিলে, সমগ্র পূর্ণতাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাপ, পুণ্য প্রভৃতি গুণভেদগুলোকে স্পিনোজা বিভিন্ন মাত্রার ভেদ বলে বুঝতে চেয়েছেন। এই স্পিনোজীয় বিচারপ্রণালীটিকে পরে লাইবনিজ একটি প্রশস্ত রাজমার্গে পরিণত করেছিলেন। (পৃ: 109—110)।

রাজনীতিতে স্পিনোজা অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার বিরোধী গণতন্ত্রের পক্ষপাতী। কিন্তু তাঁর একটি পরবর্তী গ্রন্থে তিনি অভিজাততন্ত্রের দিকে বেশি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করা রাষ্ট্রের একটি বিশেষ কর্তব্য। কিন্তু তদুপরি রাষ্ট্রের আরো উন্নততর উদ্দেশ্য আছে। তা হচ্ছে বিচারবুদ্ধির বিকাশে সহায়তা করা। প্রকৃত নীতিমত্তা ও

প্রকৃত স্বাধীনতা শুধু রাষ্ট্রজীবনেই সম্ভবপর। (পৃ: 110—111)।
দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে স্পিনোজার যে সকল মতের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে তাঁর যুক্তিবাদ বা বুদ্ধিবাদ, জড় ও চেতনের মূলগত অভেদ, এবং পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক নিয়মের অবাধ আধিপত্য। স্পিনোজা ঈশ্বরের বিশ্বাতীত ও বিশ্বানুস্যূত স্বরূপ-দ্বয়ের মধ্যে কোন যোগসূত্র দেখাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর মতে, ঈশ্বর অনন্ত অথচ মানববুদ্ধি তাঁকে সাক্ষাৎ অনুভবে জানতে পারে, স্পিনোজার এই মতটিও বুঝতে পারা কঠিন। (পৃ: 112)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লাইবনিজ পৃঃ 113—141

স্পিনোজার যৌক্তিক সর্বেশ্বরবাদ এবং লকের ইন্দ্রিয়ানুভবীয় ব্যক্তিবাদ, এই দুই পরস্পরবিরুদ্ধ চিন্তাধারার সঙ্গম বা মিলনস্থাপন, এটাই লাইবনিজের দার্শনিক চিন্তার প্রথম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'পর্যাপ্ত-হেতু' নামে একটি নতুন বৌদ্ধিক তত্ত্বের নির্দেশ করেন এবং বলেন যে, যুক্তিবিচার ও ইন্দ্রিয়-সংবেদনের পার্থক্য সত্ত্বেও, দ্বিতীয়টি প্রথমের অপরি-হার্য সোপান। (পৃ: 113)।
লাইবনিজের সংক্ষিপ্ত জীবন। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বিবিধ বিষয়গামী সূক্ষ্ম ও মৌলিক বুদ্ধি-শক্তি। তাঁর লিখিত গ্রন্থতালিকা। (পৃ: 114–115)।
চিদণুর স্বরূপ হচ্ছে প্রাচীন জড়-পরমাণু ও 'আধুনিক দেকার্তীয় ধারণা'র সম্মিলন। তবু চিদণুর কল্পনার অভিনবত্ব স্বীকার করতে হবে। স্বাধীনতার নতুন লক্ষণ ও এই লক্ষণের আবশ্যকতা ; দ্রব্যের দেকার্তীয় লক্ষণের পরিবর্তন। চিদণুর স্বরূপ ও

অস্তিত্বের প্রমাণ। চিদণুদের উচ্চ-নীচ স্তর তাদের সক্রিয়তা ও তাদের ধারণার স্পষ্টতার মাত্রার ওপর নির্ভর করে। অবিভাজ্য পরমাণু পেতে হলে, জড়-জগৎ ছেড়ে, চেতন জগতে আসা দরকার। গাণিতিক বিন্দু অবিভাজ্য হলেও, তা মনের কল্পনা-মাত্র—বস্তুজগতে তার অস্তিত্ব নেই। জ্ঞানে ও ক্রিয়াতে চিদণু স্বয়ং-সম্পূর্ণ। তার অস্তিত্ব শুধু ঈশ্বর দিতে অথবা নিয়ে যেতে পারেন; নইলে, তা অমর। লাইবনিজ দেকার্তীয় দর্শনকে তত্ত্বজ্ঞানের প্রবেশদ্বার ও পরমাণুবাদকে চিদণুবাদের পূর্বাভাস বলে প্রশংসা করেছেন। প্রথম মতের থেকে অর্থাপন্ন হয় যে, দ্রব্য মানে যা স্বয়ং-ক্রিয়, দ্বিতীয়টি থেকে অর্থাপন্ন হয় যে, প্রকৃত দ্রব্য হচ্ছে চেতন, স্ব-লক্ষণ এবং একক। চিদণুর এই দ্বৈত রূপ থেকে বোঝা যায় যে, চিদণু হচ্ছে মূলতঃ ধারণা-উৎপাদক একপ্রকার শক্তি বা বল। বিশ্বে, অসংখ্য চিদণু ও তাদের অসংখ্য ধারণা, এই দুরকম পদার্থই একমাত্র সত্য বস্তু।

সব চিদণুর ধারণা-উৎপাদক শক্তি একরকম নয়। অধিকাংশ চিদণুর শুধু সংবিৎ থাকে, কিন্তু স্ব-সংবিৎ থাকে না। কেবল সংবিৎ ও স্ব-সংবিৎ, এই দুইয়ের পার্থক্য হচ্ছে ধারণার ক্ষীণতা এবং সবলতার অথবা অস্পষ্টতা ও স্পষ্টতার মাত্রা কিংবা স্তরের ভেদ। নিম্নস্তরের চিদণুগুলো প্রায় অচেতন বা সুষুপ্ত অবস্থায় থাকে। প্রত্যেকটি চিদণু অন্য প্রত্যেকটি চিদণুকে প্রতিবিম্বিত করে, অর্থাৎ স্বীয় ধারণা দিয়ে জানে। তাই প্রত্যেক চিদণু হচ্ছে একেকটি ক্ষুদ্র বিশ্ব, অথবা সমগ্র বিশ্বের একেকটি সজীব দর্পণ। ঈশ্বরই সম্পূর্ণ-ভাবে সমগ্র বিশ্বকে স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত করেন। অন্যেরা অল্লাধিক মাত্রায়। মানব-চিদণুর কতক ধারণা স্পষ্ট; কিন্তু অন্য অসংখ্য ধারণা অস্পষ্ট। অস্পষ্টতা অথবা নিষ্ক্রিয়তা হচ্ছে বাধাপ্রাপ্ত সক্রিয়তা। পণ্ডিতীয় দর্শনের ভাষায়, সক্রিয়তা

হচ্ছে ফর্ম্ বা আকার, আর নিষ্ক্রিয়তা হচ্ছে জাড্য বা তমোগুণ। ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত অন্য চিদণুগুলো আকার (অথবা এন্টেলেচি অথবা আত্মা) এবং জড়ের মিশ্রণ। এই জাড্য বা তমোগুণ হচ্ছে চিদণুর স্বাভাবিক সক্রিয়তার প্রতিরোধকারী পদার্থবিশেষ। পিণ্ড বা ভরাট মূর্তিও আসলে জড়তা বা তমোগুণেরই প্রকার; কিন্তু তা দ্বিতীয়স্তরের জড়তা। প্রথমস্তরের জড়তা হচ্ছে ধারণার অবিবিক্তার হেতু; আর দ্বিতীয়-স্তরের জড়তা হচ্ছে প্রথমস্তরের জড়তার কার্য। যা অবিবিক্তভাবে জ্ঞাত, তাই পিণ্ডাকারে অথবা ভরাট মূর্তিরূপে অবভাসিত হয়। (পৃঃ 116—120)।

জীবমাত্রকেই আত্মা বলা চলে না। স্ব-সংবেদনযুক্ত জীব যখন বিচার-বুদ্ধি, অথবা সার্বিক সত্য জানার সামর্থ্য, লাভ করে, তখনই তাকে আত্মা বলা সঙ্গত। অধিকাংশ চিদণু অস্পষ্ট ও নির্জ্ঞান ধারণার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। যে চিদণু প্রত্যক্ষজ্ঞানযুক্ত হার্দিক অনুভবের মালিক, তাকে জীব বলা যায়। জীব হচ্ছে চিদণুর দ্বিতীয় স্তর। আর আত্মা চিদণুর তৃতীয় এবং সর্বোচ্চ স্তর। প্রত্যেক স্তরেই, নিম্নতর স্তরের চিদণুগুলোও সমাবিষ্ট থাকে।

বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ থেকে কামনা বা এষণার জন্ম। সুতরাং এষণা পদার্থটি মূলতঃ প্রত্যক্ষক্রিয়ার থেকে ভিন্ন নয়। প্রত্যেক ধারণার ভেতর, অন্য ধারণায় রূপান্তরিত হওয়ার দিকে ঝোঁক থাকে। এরই নাম কামনা বা এষণা। পরিবর্তন-উন্মুখ ধারণারই অপর নাম হচ্ছে প্রেরণা। প্রত্যক্ষ যখন জ্ঞানযুক্ত এবং যুক্তিবিচারানুগ হয়, তখন এষণা সঙ্কল্পে পরিণত হয়। (পৃঃ 120—121)।

প্রত্যেক চিদণুর ভেতর, বিশ্বের অন্য সববস্তুর ধারণাগুলো বীজরূপে নিহিত থাকে, এবং যোগ্য সময়ে সেখান থেকেই তাদের অভিব্যক্তি হয়।

তাই, যে কোন বস্তু সম্বন্ধেই চিদণুর যে ধারণা হয়, তা ঐ চিদণু নিজের ভেতর থেকেই আহরণ করে। তবু, প্রত্যেক চিদণুর মধ্যস্থ ধারণাগুলো অন্যান্য চিদণুর মধ্যস্থ ধারণাগুলোর সদৃশ। এই সাদৃশ্যের হেতু হচ্ছে ঈশ্বরের পূর্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা। এই পূর্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার জন্যই বিভিন্ন বস্তু পরস্পরের ওপর ক্রিয়া করতে পারে ব'লে আমাদের মনে হয়। আসলে, পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাই এই প্রতিভাসের হেতু। দেহ ও আত্মার ভেতরেও, ঐ একইরকম সম্বন্ধ। দেহ ও আত্মা যেন এমন দুটি ঘড়ি, যাদের একটিতে যে সময় দেখায়, অপরটিতেও তাই। উপলক্ষবাদের তুলনায়, এই পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্যের ধারণাটিতে অনেক লাঘব ও সুবিধে আছে। (পৃ: 121—122)।

একই চিদণু বহু বস্তুর প্রতিবিম্ব ধারণ করে। তাইতে, বলা যায় যে, এখানে একের ভেতর বহু রয়েছে; আর বিভিন্ন চিদণুর ধারণাগুলো যে পরস্পরের সদৃশ, এতে আমরা পাই বহুর ভেতর এক। সাদৃশ্য সত্ত্বেও, চিদণগুলোর ধারণাগত বিবিক্ততার বিভিন্ন তারতম্য নিয়ে, সর্ব চিদণু মিলে, একটি পূর্ণাঙ্গ সুর-সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করে। এই বৈচিত্র্যের সাথে যে শৃঙ্খলা, এতেই সৌন্দর্য ও পূর্ণতার আদর্শটি বাস্তবায়িত হয়। চরম বৈচিত্র্যের সাথে চরম ঐক্য মিলিত হওয়াতে, বিশ্বে কোনো কিছুর অভাব নেই; এবং এমন কিছুও নেই, যা নিষ্প্রয়োজন। অর্থাৎ যতরকম যতগুলো জগৎ হওয়া সম্ভবপর, তাদের ভেতর, আমাদের জগৎ-ই সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণতম। নিম্নস্তরের চিদণুগুলো সমগ্র বিশ্বের পূর্ণতার সম্পাদক। সৃষ্টির আদিতে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও সঙ্কল্পের জোরে, চিদণুদের উৎপত্তি হয়। এর আগে, এসব চিদণু বীজরূপে, অর্থাৎ ধারণার আকারে, ঈশ্বরের মনে বিদ্যমান ছিল। অস্তিত্ব

লাভ করাতে, চিদণুদের স্বরূপ বাড়েও না, কমেও না। সম্ভাবনার ভেতর অস্তিত্ব লাভের দিকে একটি প্রবণতা থাকে। এই সম্ভাবনার স্বরূপটি যত বেশি মাত্রায় পূর্ণ হয়, উক্ত প্রবণতার জোর ও যৌক্তিকতা তত বেশি। যেসব সম্ভাবনার ভেতর, এই প্রবণতা সর্বাধিক, সেগুলোই অস্তিত্বের রাজ্যে প্রবেশ করার হুকুম পায়। চিদণু স্বীয় পূর্ণতার দ্বারা অস্তিত্বের অধিকার অর্জন করে, এরকম নয়; কিন্তু তা যে সমূহের একটি অংশ, ঐ সমূহের দ্বারাই তা পূর্ণতা অর্জন করে। সম্ভাব্য জগৎগুলির ভেতর, যে জগৎটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঈশ্বরের বিবেচনায় নির্ধারিত হয়, সেই সম্ভাব্য জগৎই তাঁর শক্তিতে বাস্তবায়িত হয়। অর্থাৎ সর্বাধিক কল্যাণের বিচারদ্বারাই ঈশ্বরের এই নির্বাচন নির্ধারিত। সর্বাধিক কল্যাণের অমোঘ নিয়মটি একটি ব্যাপকতর নিয়মের প্রকার-বিশেষ। এর নাম হচ্ছে—'পর্যাপ্ত হেতুর তত্ত্ব'। তর্কবিদ্যায় স্বীকৃত 'চিন্তার নিয়মগুলো' যতখানি প্রামাণ্যের অধিকারী, এই তত্ত্বটিও ততখানি। পর্যাপ্ত হেতুর দ্বারা কাদাচিৎক সত্তার, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক সত্তার, জ্ঞানের প্রামাণ্য নির্ধারিত হয়। আর অবশ্যসম্ভব চিরন্তন সত্তার যৌক্তিক জ্ঞান অবিরোধ-তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে। (পৃ: 122—124)।

কোনো ভেদই জাতিগত বা গুণগত নয়, কিন্তু ন্যূনাধিক মাত্রাগত। স্থিতি ও গতি পরস্পরের বিরুদ্ধ নয়। কিন্তু স্থিতি হচ্ছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং মন্থর গতি। যে বৈসাদৃশ্য ক্রমে হ্রাস পেতে পেতে, অদৃশ্য হয়ে যায়, তারই নাম সাদৃশ্য। অমঙ্গল মানে স্বল্পীকৃত মঙ্গল। তবু, জগতের কোথাও এমন দুটি পদার্থ বা ঘটনা নেই, যারা সর্বতোভাবে সমান। যদি তারা সর্বতোভাবে সমান হতো, তাহলে তারা দুই থাকতো না, এক হয়ে যেত। পার্থক্য মাত্রই স্বরূপের অন্তর্গত।

জীব ছাড়া, অন্যকিছুকেই সত্তাবান বলা চলে না। অদ্বৈতের প্রতিভাস তো হয়। এর ব্যাখ্যা কি? বিস্তারযুক্ত জড়পিণ্ডের অবভাসটি অবিবিক্ত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে উৎপন্ন হয়। পিণ্ড হচ্ছে শুধু কতকগুলো চিদণুর সমূহ। এই সমূহটি অবিবিক্তভাবে প্রতিভাত হলে, তা নিরেট বস্তু বলে প্রতিভাত হয়। তথাপি জড়পিণ্ডের ধারণার বিষয়রূপে একটি জ্ঞাতৃবহির্ভূত চিদণু-সমুদায় রয়েছে। সুতরাং জড়পিণ্ডের অবভাসকে তুচ্ছ আকাশকুসুমের মতন অসৎ পদার্থ বলা ঠিক হবে না। দেশ এবং কালও পরমার্থতঃ সৎ নয়। দেশ ও কাল দ্রব্যও নয়, দ্রব্যের ধর্মও নয়। এগুলো শুধু প্রাতিভাসিক পদার্থ মাত্র। প্রথমটি সমকালীন বিদ্যমানতার ক্রমবিশেষ, আর দ্বিতীয়টি পূর্বাপর অস্তিতা অথবা অনুবৃত্তির ক্রম। (পৃঃ 126—129)

নিরাত্ম দেহ নেই। অশরীরী আত্মাও অসম্ভব। আত্মামাত্রেই কতকগুলো নিম্নশ্রেণীর চিদণুর সাথে সংযুক্ত থাকে। এই নিম্নশ্রেণীর চিদণুগুলোই ঐ আত্মার শরীর। আত্মার অথবা চিদণুর মৃত্যু নেই। মানুষ এবং ইতরপ্রাণীর জন্ম-পূর্ব ও মৃত্যুত্তর অস্তিত্ব আছে। তবু, শুধু মানুষের আত্মার এই অনন্ত অস্তিত্বটিকে অমৃতত্ব নাম দেওয়া যায়।

মানুষের মনের ধারণাশূন্য অবস্থা হতে পারে না। সুষুপ্তিতেও চিন্তা বা ধারণার অত্যন্তাভাব নেই; থাকলে, সুষুপ্তির কোনো ধারণাই আমাদের হতে পারতো না। প্রত্যেকটি প্রকট ধারণা তৎপূর্ববর্তী অন্য কোনো ধারণা থেকে উৎপন্ন হয়। ধারণা ইন্দ্রিয়সংবেদন-জাত, না অন্তর্নিহিত, এই প্রশ্নের উত্তরে, লক্ ও দেকার্তের মতের বিরোধ এড়ানো সম্ভবপর। চিদণুর কোন জানালা নেই। (পৃঃ 129—132)।

কৃতির অনিবার্যতা সত্ত্বেও, কর্ম-স্বাধীনতার হানি
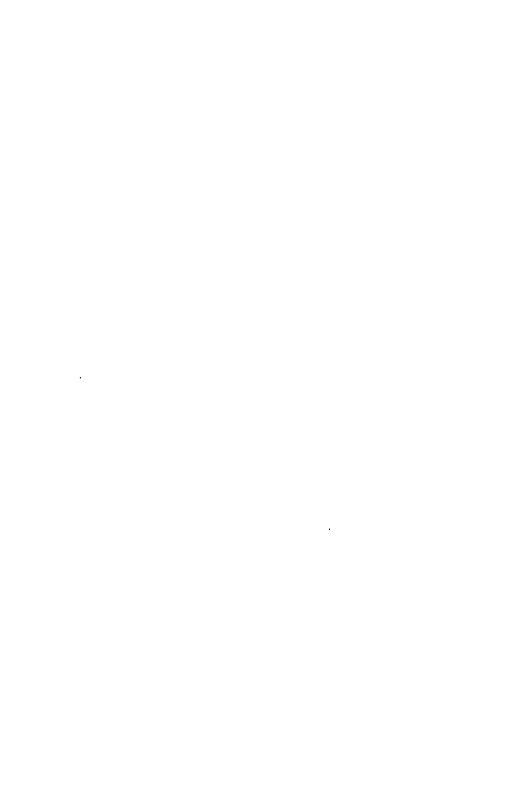
প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রস্তাবনা

আধুনিক দর্শনের বৈশিষ্ট্য

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়: (1) প্রাচীন বা গ্রীক যুগ, (2) মধ্যযুগ এবং (3) আধুনিক যুগ। প্রত্যেক যুগেরই এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্যান্য যুগে তেমন স্পষ্ট নয়। আবার, এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও, প্রত্যেক যুগেই দার্শনিক বিচার ও চিন্তার বহু বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়; আর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে, এইসব বিবিধ চিন্তার ভেতর অনেকগুলিই কিছু ভিন্ন আকারে বার বার প্রত্যেক যুগেই দেখা দেয়।

দর্শনের প্রাচীন বা গ্রীকযুগের আরম্ভ খৃ: পূ: সপ্তম বা ষষ্ঠ শতাব্দী অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ এবং মহাবীরের প্রায় সমকালীন[1]। আদিম গ্রীক দর্শনের বিষয়বস্তু ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান কি তা নির্ধারণ করা। এক অর্থে, এটাই সর্বদর্শনের প্রধান বিষয়বস্তু। গ্রীক দার্শনিকরা প্রথম প্রথম এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, তা খুবই স্থূলদৃষ্টির পরিচায়ক। কেউ বলেছেন, এই মূল উপাদান হচ্ছে জল; কারও কারও মতে, তা হচ্ছে বায়ু, ইত্যাদি; আবার কারও কারও মনে হল যে, বিশ্বের উপাদান হচ্ছে এমন একপ্রকার জড় বস্তু, যাতে না ছিল কোনরকম শৃঙ্খলা, না ছিল কোন বৈচিত্র্য। শেষের মতটি কিছু সূক্ষ্ম ও ব্যাপক বিচারের পরিচায়ক। গ্রীস দেশের দার্শনিক বিচার ক্রমে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে, শেষটায় তা সক্রেটিস, প্লেটো, ও এরিষ্টটল এবং বিশেষত: পরের দুজনের দর্শনে এমন এক সর্বাঙ্গযুক্ত, বিচারপূর্ণ অপূর্ব সুন্দর আকার ধারণ করেছিল, যা আজও শিক্ষিত মানুষের বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক করে। এই তিনজন দার্শনিকের

---

1 ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি-এর থেকে অনেক বেশী প্রাচীন। কারণ, বেদ হচ্ছে গৌতম বুদ্ধ এবং মহাবীরেরও পূর্বকালীন, আর তাতে সুসংবদ্ধ বিবিধ দার্শনিক বিচার রয়েছে। তাছাড়া, প্রাচীন পালি ও অর্ধমাগধী ভাষায় লিখিত বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, বুদ্ধদেব ও মহাবীর বিভিন্নমতাবলম্বী বহু দার্শনিকের সাথে বিচার বিনিময় করেছিলেন।

জীবনকাল খৃঃ পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দী। এঁদের দর্শনচিন্তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার বহির্মুখিতা অর্থাৎ বহির্জগতের তত্ত্বসম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টা ; আর এই তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য তাঁরা যে উপায় অবলম্বন করতেন, তা হচ্ছে প্রধানতঃ তাঁদের নিজ নিজ স্বাধীন চিন্তা, বিচার ও কল্পনা।

এঁদের দর্শনের পঠন-পাঠন ও চর্চা সক্রিয়ভাবে আরও পাঁচশ বছর গ্রীস দেশের নানা অঞ্চলে ও কনস্টেণ্টিনোপল, এলেক্‌জেন্দ্রিয়া প্রভৃতি স্থানে অব্যাহতভাবে চলছিল।

তারপর, কিছুকাল পাশ্চাত্ত্যদের ভেতর মৌলিক দার্শনিক বিচারের প্রায় অন্ধকার যুগ চলেছিল। অবশ্য, যখন গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে খৃষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার হতে থাকল, তখন থেকেই খৃষ্টীয় ধর্মযাজক ও সন্ন্যাসীরা প্লেটোর দর্শনের সাথে তাঁদের ধর্মমতের সামঞ্জস্য দেখাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু খাঁটি খৃষ্টীয় দর্শনের উদ্ভব হয় আরও কয়েক শ বছর পরে একাদশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধে।[1] এই দর্শনকে 'পণ্ডিতীয় দর্শন'[2] নাম দেওয়া হয়েছে। মধ্যযুগীয় পণ্ডিতীয়দের ভেতর বেশ কয়েকজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সূক্ষ্ম বিচারশীল চিন্তকের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে টমাস একুইনাস নামক একজন অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান, বিদ্বান এবং গভীর ও ব্যাপক চিন্তায় পারদর্শী সন্ন্যাসী এমন এক সর্বাঙ্গযুক্ত দর্শনের সূত্রপাত করে গেছেন, যার অধ্যয়ন, অধ্যাপন, অনুশীলন ও পরিবর্ধন আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য দেশের নানাভাগে চলে আসছে।

পণ্ডিতীয় দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টধর্মের মতের সাথে বুদ্ধি বা বিচারের সামঞ্জস্য প্রদর্শন। এই কাজে, পণ্ডিতীয়রা বহু সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ করে গেছেন। কিন্তু এই বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তি ছিল রোম নগরে প্রতিষ্ঠিত সর্বোচ্চ গির্জা থেকে প্রচারিত ধর্মমতে অটল বিশ্বাস। খৃষ্টীয় শাস্ত্র অর্থাৎ বাইবেলে যে-সত্য বা তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে তাকে বোধগম্য করা এটাই পণ্ডিতীয়রা বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন। তথাপি বিচারবুদ্ধির এমনই প্রবল ক্ষমতা যে, তার প্রভাবে, ধর্মমতের সাথে সম্বদ্ধ নয়, এমন অনেক দার্শনিক সমস্যার স্পষ্ট ধারণা পণ্ডিতীয়রা দিতে পেরেছেন এবং এসব সমস্যার যে বিভিন্ন সমাধান এঁরা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, দার্শনিক চিন্তায় সেগুলোর গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

1 ইউরোপীয় মধ্যযুগের কালখণ্ড মোটামুটি ৫০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত বলে ধরা যেতে পারে।

2 Scholasticism.

পণ্ডিতীয় দর্শনের চর্চা ও আদর পরবর্তীকালে ক্রমশঃ কমে গেল। এর প্রধান একটি কারণ এই যে, পণ্ডিতীয়দের ভেতর কেউ কেউ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন যে, আত্মার অমরত্ব প্রভৃতি ধর্মমতকে অকাট্য যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা অসম্ভব। তাই এঁরা বলতে থাকলেন যে, ধর্মমতের ক্ষেত্র ও যুক্তিবিচারের ক্ষেত্র পরস্পর থেকে অত্যন্ত পৃথক। এই মতই ধীরে ধীরে ধর্মবিশ্বাসী লোকের কাছে অধিক গ্রহণীয় বলে মনে হল। তাছাড়া, ধর্মীয় মতের সমর্থনে পণ্ডিতীয়রা যে-যুক্তিবিচারকে উপায়রূপে গ্রহণ করেছিলেন, সেই যুক্তিবিচারই তাঁদের অজ্ঞাতসারে দর্শনের নূতন যুগ প্রবর্তনে সাহায্য করেছিল। কারণ, যুক্তিবিচারের স্বভাবই এমন যে, তা বিনা বিচারে গৃহীত মেনে নেওয়া মতকে বর্জন না করে পারে না—শাস্ত্র, গির্জা বা সাধুসন্তের আপ্তবাক্যের গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। প্রকৃত অর্থে, যুক্তিবিচার হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বাধীন—তার নিজস্ব কষ্টিপাথরে খাঁটি বলে প্রমাণিত না হলে, সে কারও কথা সত্য বলে ধরে নিতে পারে না, তা ঐ কথার বক্তা যতই উচ্চ অধিকারী পুরুষই হোন না কেন; অর্থাৎ সত্যাসত্য নির্ণয়ের কাজে বিচারবুদ্ধি হচ্ছে সম্পূর্ণ স্ব-নির্ভরশীল।

পরম্পরাগত বিশ্বাসের ওপর নির্ভর না করে, নিজস্ব বিচারে যাচাই করে তত্ত্বনির্ধারণের চেষ্টা, এটাই হচ্ছে আধুনিক দর্শনের বৈশিষ্ট্য। ইউরোপীয় দর্শনের আধুনিক যুগের আরম্ভ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে। যে সকল ঐতিহাসিক কারণে এই যুগান্তর ঘটেছিল, তার একটির উল্লেখ ওপরের অনুচ্ছেদে করা হয়েছে। আরও কয়েকটির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হচ্ছে।

(1) মধ্যযুগে গ্রীকভাষায় লিখিত দর্শন ও সাহিত্যের অধ্যয়ন সারা ইউরোপখণ্ডে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য খৃষ্টীয় ধর্মযাজক ও সন্ন্যাসীরা প্লেটো ও এরিস্টটলের দর্শন মোটামুটিভাবে জানতেন; কিন্তু তাঁদের এই জ্ঞান লেটিন অনুবাদ থেকে, অথবা অন্যান্য লেখকের রচনা থেকে আরও পরোক্ষভাবে আহরিত হত, সাক্ষাৎ গ্রীকভাষার মূল গ্রন্থ থেকে নয়। এর ফলে, মূল গ্রীক রচনার অনবদ্য সৌন্দর্য্য, মার্জিত রুচি ও ব্যঞ্জনা থেকে এঁরা বঞ্চিত থাকতেন। এক অভাবিত ঐতিহাসিক ঘটনায়, এই দুরবস্থার অবসান হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুরস্ক দেশের রাজশক্তি কনস্টাণ্টিনোপল অধিকার করে। তখন সেখানকার বহু গ্রীসদেশীয় বিদ্বান লোক তাঁদের গ্রন্থাদি সহ ইটালি দেশে চলে আসেন, এবং

এঁদের প্রভাবে ইউরোপখণ্ডে, আবার গ্রীক সাহিত্যের অধ্যয়ন ও চর্চার পুনরুজ্জীবন হয়। এই সময়েই মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল, আর মুদ্রণালয়ে বহু গ্রীক গ্রন্থ ছাপা হওয়ায় বিদ্যোৎসাহী লোকের কাছে এগুলো তেমন দুর্লভ থাকল না। এতে, ইটালি, ফ্রান্স, জার্মেনী, হলেণ্ড, ইংলেণ্ড প্রভৃতি দেশের শিক্ষিত সমাজে সুসভ্য প্রাচীন গ্রীক জাতির উন্মুক্ত স্বাধীন চিন্তার প্রসার হল।

(2) এর ফলে, শিক্ষিত সমাজ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো রোমের গির্জা এবং পণ্ডিতীয়দের আধিপত্য বর্জনের সাহস পেল। জার্মেনীতে লুথার প্রমুখ ধর্মনেতারা যীশুখৃষ্ট প্রচারিত ধর্মমত জানার জন্য গির্জার পাদ্রী ও সন্ন্যাসী পণ্ডিতীয়দের ওপর আস্থা না রেখে, সাক্ষাৎ বাইবেল পাঠের পরামর্শ দিতে থাকলেন। এই ধর্মসংস্কারের[1] হাওয়া সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। লোকের মন থেকে পাদ্রী ও অবিবাহিত সন্ন্যাসীদের প্রতি বিশেষ সম্মানের ভাব কমে গেল, বিবাহিত জীবন, সাংসারিক ও সামাজিক কর্তব্যপালনকে স্বাভাবিক, পবিত্র ও ঈশ্বরনির্দিষ্ট বলে মনে হল। অন্যের দুর্বোধ্য জটিল কথার জালের ভেতর নয়, কিন্তু নিজের বিচারজনিত উপলব্ধিতে যীশুখৃষ্টের বাণীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে, আন্তরিকতার সাথে তার আচরণ, মানবপ্রীতি, মানুষের সেবা প্রভৃতি হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম—কতকগুলো কৃত্রিম মতের উহাপোহ, গির্জানির্দিষ্ট কতকগুলো বাহ্য আচারের অনুষ্ঠান, এগুলোতে প্রকৃত ধর্মের বিশেষ কিছুই নেই, প্রকৃত ধর্মের সার হচ্ছে হৃদয়মনের পরিশুদ্ধি, আত্মিক উন্নতি, প্রভৃতি ধর্মসংস্কারের এই কথাগুলো দর্শনচিন্তার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। জগৎ সম্বন্ধে পরের দেওয়া কতকগুলো কৃত্রিম কল্পিত মতের সত্যতায় অবিশ্বাস উৎপন্ন করে, লুথার প্রবর্তিত ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন ইউরোপের বিচারশীল মানুষের মনে স্বকীয় চিন্তা ও পর্যবেক্ষণে বিশ্বের অন্ত্য তত্ত্বনির্ধারণে উৎসাহ দিয়েছিল। (৩) আধুনিক প্রাকৃত-বিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশে এবং একই সঙ্গে ইউরোপের কয়েকজন অসাধারণ বুদ্ধিমান ও প্রতিভান্বিত ব্যক্তি তাঁদের স্বাধীন বিচার, নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গণিতের সাহায্যে, নিসর্গে যে-সকল ঘটনা ঘটে, তাদের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়ার কাজে আশ্চর্যজনক সাফল্যলাভ করেন। স্বাধীন চিন্তার এই সাফল্য থেকেও তৎকালীন দর্শনচিন্তকরা ধর্মযাজক ও পণ্ডিতীয়দের আধিপত্যের বিরুদ্ধে স্বাধীন বিচারে উৎসাহিত হয়েছিলেন।

---

1 Reformation.

পৃথিবীকে কেন্দ্র করে, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি তার চারধারে চক্রাকারে আবর্তিত হয়, এই প্রাচীন ধারণা যে ভুল, তা কোপারনিকাস (মৃত্যু ১৫৪৩), কেপলার (মৃত্যু ১৬৩১) এবং গেলিলিও (মৃত্যু ১৬৬৩) প্রভৃতি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর কয়েকজন গণিতজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ও আবিষ্কারে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। বলা বাহুল্য, এসব আবিষ্কার ও গবেষণা পরম্পরাগত প্রচলিত বিশ্বাসগুলোকে অগ্রাহ্য না করে এবং সমাজপতিদের প্রভাব না এড়িয়ে, সম্ভবপর হয়নি। তাই, তৎকালীন সত্যসন্ধিৎসু প্রতিভাধর দার্শনিকরা প্রচলিত বিশ্বাসের সংশয় থেকে তাঁদের তত্ত্ববিচার আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডের ফ্র্যান্সিস্ বেকন (জন্ম ১৫৬১) ও ফরাসী দেশের দেকার্ৎ (জন্ম ১৫৯৬) প্রচলিত কোন ধারণাকেই যুক্তিবিচারে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত না হলে, গ্রহণ করবেন না বলে স্থির করেছিলেন।

বেকন তাঁর সমকালীন ও তৎপূর্ববর্তী প্রাকৃত-বিজ্ঞানের অত্যন্ত অনগ্রসর অবস্থার কারণরূপে ঈশ্বর, অমর আত্মা, পরলোক, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি বিষয়ে লোকের বদ্ধমূল ভ্রান্ত সংস্কার, ধর্মমতে অনমনীয় গোঁড়ামি প্রভৃতি নির্দেশ করেন। বিজ্ঞানের এই দুরবস্থা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, প্রাকৃতিক ঘটনার ফলপ্রদ পর্যবেক্ষণের জন্য, প্রথমেই কয়েকটি মূল নিয়ম উদ্ভাবন করা দরকার। বিজ্ঞানের এই প্রস্তাবিত সংস্কার দুটি পূর্ববর্তী সর্তের পরিপূরণের ওপর নির্ভর করবে: (1) বিষয়-সম্বন্ধী সর্ত ও (2) জ্ঞাতৃ-সম্বন্ধী সর্ত। প্রথম সর্তটি হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে বাহ্য-প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ ও তারই সাক্ষাৎ অনুভবের ওপর দাঁড় করিয়ে তার থেকে আজেবাজে জিনিস ঝেড়ে ফেলতে হবে। দ্বিতীয় সর্তটি এই যে, বিচারের পূর্বে গৃহীত পরম্পরাপ্রাপ্ত ধারণা এবং অতীব নিকৃষ্ট[1] মতবাদগুলোকে মন থেকে সরিয়ে দিয়ে, তার শুদ্ধি-সম্পাদন। এই দুটি সর্ত সম্পাদিত হলে, আমরা যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি পাব, তা হচ্ছে আরোহ-পদ্ধতি[2]; আর এই আরোহ-পদ্ধতিই হচ্ছে প্রাকৃত-বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রশস্ত পথ।

মোটামুটি এইগুলোই হচ্ছে বেকন-প্রচারিত দর্শন-বিষয়ক প্রধান মত। বেকন-কালীন শিক্ষিত সমাজের পক্ষে এসব কথার যথেষ্ট মূল্য ছিল। আর এগুলো পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই দার্শনিকদের নতুন দর্শন-পত্তনের ব্যাপারে খুবই সাহায্য করেছিল। বেকন যে-জিনিসটির ওপর

1 Abstract.
2 Method of Induction.

বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিন্তার সর্বদাই বস্তু-স্থিতির কাছে থেকে, তার সম্বন্ধে আমাদের যা অনুভব হয়, তার ওপর নির্ভর করা। অন্ন পরবর্তীকালীন ইংরাজীভাষী দার্শনিকদের অনুভববাদের[1] এটাই হচ্ছে মূল উৎস। তথাপি উল্লেখ করা যোগ্য হবে যে, বেকন তাঁর এই নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ করে, বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছুই দিতে পারেননি। অবশ্য, তাঁর বহুমুখী রচনায় প্রচুর সারগর্ভ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মন্তব্য ইতস্তত: ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু এগুলো ঠিক কোন বিশিষ্ট দর্শনের আকারে সুসংবদ্ধ হতে পারেনি। ইংরাজী লেখকদের ভেতর কেউ কেউ বেকনকে আ নিক দর্শনের পিতা বলতে চান। কিন্তু এ অভিমত আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। ফরাসীদেশীয় লেখক দেকার্তকেই আধুনিক দর্শনের পিতা বলতে হবে।

1 Empiricism.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রেনে দেকার্ৎ

জন্ম—১৫৯৬ ; মৃত্যু—১৬৫০

রেনে দেকার্ৎকে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের পিতা বলা হয়। ফরাসী দেশ এঁর জন্মভূমি। কলেজে অন্যান্য বিষয়ের সাথে তিনি দর্শন, ঈশ্বর-তত্ত্ব ও গণিত অধ্যয়ন করেন। কুড়ি বছর বয়সে কলেজের উপাধি পেয়ে ছ'-সাত বছর তিনি প্রথমে হল্যাণ্ড ও পরে বেভেরিয়ার সৈন্যদলে সৈনিকের কাজ করেন।

এই সময়ে, তাঁর মনে নানারকম সংশয় দেখা দিয়েছিল। সংশয়ের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, তিনি মেরী মায়ের[1] কাছে প্রার্থনা করেন। এরপরে, তাঁর কাছে এক 'আশ্চর্যকর অভিনব বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব' উদ্ভাসিত হয় ; আর তাঁর মনে কয়েকটি নূতন ধারণার উন্মেষও হয়। এইগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে জ্যামিতিতে বীজগণিতের প্রয়োগের ধারণা। পরবর্তী জীবনে দেকার্ৎ "সম-কোটিক জ্যামিতি"[2] নামক গণিতের যে একটি নূতন শাখার প্রবর্তন করেন, এখানেই তার উৎস। গণিতের নিখুঁত বিচার পদ্ধতিটিকে জ্ঞানের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করার কথাও এই সময়ে তাঁর মনে এসেছিল। তখন প্রায়ই তিনি ভাবতেন যে, সত্যের ভাবটুক অর্থাৎ সত্যতা পদার্থটিকে ঠিক ঠিক ধরতে পারলে, সত্য নির্ধারণের কপাট খুলে যাবে ; আর হয়তো তা গণিতের সত্য বিধানগুলির[3] ভেতর আবিষ্কার করা সহজ হবে। যে 'সার্বত্রিক সংশয়' পদ্ধতির জন্য পাশ্চাত্ত্য দর্শনে দেকার্তের এত খ্যাতি, তৎসম্বন্ধীয় ধারণাটিও এসময়ে এক যুদ্ধক্ষেত্রে দেকার্তের মনে সর্বপ্রথম উদিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের অবসানে, দেকার্ৎ সৈন্যবিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন, এবং ইউরোপের নানা জায়গায় বেড়িয়ে এসে, শেষটায় প্যারি শহরে কিছুকাল বসবাস করেন। কিন্তু সাংসারিক কোলাহল থেকে দূরে শান্তভাবে নিজের চিন্তা

---

1 Mary, Christ's mother.
2 Co-ordinate Geometry.
3 Proposition.

লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে, তিনি ১৬২৮ সালে হল্যাণ্ড দেশে চলে যান, এবং সেখানকার বিভিন্ন জায়গায় প্রায় কুড়ি বছরকাল অবস্থান করেন। সেখানেই তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়। প্রায় হল্যাণ্ডবাসী হয়ে গেলেও, মাঝে মাঝে প্যারিতেও তিনি যাতায়াত করতেন। ১৬৪৯ সালে সুইডেনের রাণীর বিশেষ অনুরোধে তাঁর দর্শনশিক্ষকরূপে তিনি স্টক্‌হোল্‌মে যান। কিন্তু সেখানকার প্রচণ্ড শীতে অল্পকাল মধ্যেই দেকার্তের দুর্বল শরীর ভেঙ্গে পড়ে এবং কয়েক মাসের মধ্যেই ১৬৫০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। দেকার্ৎ সারাজীবন অবিবাহিত ছিলেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির ভেতর, নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(1) **ডিস্‌কোর্স অন্‌ মেথড্‌ :** অর্থাৎ বিচার পদ্ধতি বিষয়ক নিবন্ধ—১৬৩৭ সালে প্রকাশিত। (2) **মেডিটেশান্‌স্‌ অন্‌ ফার্স্ট্‌ ফিলসফি :** অর্থাৎ মূল দশন সম্বন্ধীয় বিচার—১৬৪১ সালে প্রকাশিত। (৩) **প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্‌ অভ্‌ ফিলসফি :** অর্থাৎ দর্শনের মূলতত্ত্ব সমূহ—১৬৪৪ সালে প্রকাশিত।

দেকার্তের সমগ্র গ্রন্থাবলীর ইংরাজী অনুবাদ এলিজাবেথ আন্‌স্কোম্বে এবং পিটার্‌ গীচ কর্তৃক লণ্ডন থেকে ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এর আগেও, আরও অনেকে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন।

1. মূলতত্ত্ব

দেকার্তের দার্শনিক চিন্তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর সমকালীন সমাজে প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসগুলোকে বিনাবিচারে মেনে না নিয়ে, সুনিশ্চিত প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি এমন এক দর্শন নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, যা সর্ববিজ্ঞানের, এমন কি চিকিৎসাশাস্ত্রেরও মূল ভিত্তি হবে। বলা বাহুল্য যে, যে দর্শন সর্ব বিজ্ঞানের ভিত্তি হবে, তা পুরোপুরি সংশয়াতীত হওয়া দরকার। কিন্তু এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ দর্শন বের করার উপায় কি? দেকার্ৎ একজন দক্ষ গণিতজ্ঞ ছিলেন। গণিতের নিখুঁত পদ্ধতি ও সন্দেহাতীত সিদ্ধান্তে তিনি খুব আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, এই নিখুঁত পদ্ধতির মূল কারণ হচ্ছে দুটি। প্রথমতঃ, গণিত যে-সকল মূল ধারণা ও বিধান থেকে ধাপে ধাপে, বিবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, সেগুলোর সংখ্যা অতি অল্প; আর সেগুলো হচ্ছে অত্যন্ত সাদাসিধে, সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও বিবিক্ত, এবং নিঃসন্দিগ্ধভাবে সত্য, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ[1]।

1 Self-evident.

দ্বিতীয়তঃ, এরা যে সাদাসিধে, স্পষ্ট, বিবিক্ত ও স্বতঃসিদ্ধ, তা জানার জন্য ইন্দ্রিয়জ অনুভব, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি আদৌ আবশ্যক নয়। দুই আর দুই-এ মিলে যে চার হয়, চার ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, তা ইন্দ্রিয়জ পর্যবেক্ষণ, ভূয়োদর্শন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা যাচাই করতে যাওয়া একেবারেই পণ্ডশ্রম ও অপ্রাসঙ্গিক।

এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান বিচারবুদ্ধির দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে যখন কোন ধারণা বা বিধানের[1] সত্যতা যাচাই করা হয়, তখনও কিন্তু সত্যতার বোধ ইন্দ্রিয়-প্রদত্ত নয়। বিচার বুদ্ধিই তার জনক। এই বিচার বুদ্ধিকে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে রীজন্ বলা হয়। এই বিচারাত্মক বোধকে বাঙলায় প্রজ্ঞা নাম দেওয়া যেতে পারে। বিচার হচ্ছে প্রজ্ঞার প্রাণ; কিন্তু প্রজ্ঞার কাজ শুধু বিচার করা নয়, অধিকন্তু বিচার দ্বারা কোন নিশ্চিত স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো—এটাই বিচারের গন্তব্য। এই গন্তব্যে উপনীত হওয়া গেল কিনা, তা বুঝতে পারা, এটাতেও প্রজ্ঞারই এক্তিয়ার। প্রজ্ঞার এই বোধশক্তিকে দেকার্ৎ ইনটুইশন বা আন্তরোপলব্ধি নাম দিয়েছেন। আন্তরোপলব্ধি হচ্ছে দেকার্তের মতে সাক্ষাৎ জ্ঞানের সর্বোত্তম প্রকার। সুতরাং তাঁর মতে, গণিতের নিঃসন্দিগ্ধতার হেতু হচ্ছে তার মূল ধারণাগুলোর স্পষ্টতা ও বিবিক্ততা, এবং গণিতে আন্তরোপলব্ধিসম্পন্ন প্রজ্ঞা বা যুক্তি-বিচারের ব্যবহার। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ধারণা বা বিধানের[1] স্পষ্টতা ও বিবিক্ততা হচ্ছে তার সত্যতার নির্ণায়ক; আর তা প্রজ্ঞার সাক্ষাৎ আন্তরোপলব্ধির দ্বারাই জানা যায়।

দেকার্তের এই সকল মতকে আধুনিক যুক্তিবাদের[2] ভিত্তি বলা যায়। এই যুক্তিবাদের 'অব্যর্থতায় আস্থা রেখে', দেকার্ৎ তাঁর দার্শনিক চিন্তার প্রারম্ভে মনে করেছিলেন যে, বস্তুস্থিতি[3] বিষয়ক বিধানের সত্যতাও তিনি গণিতের ন্যায় পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্য ছাড়াই প্রমাণ করতে পারবেন। বস্তুস্থিতি অথবা ভূতার্থ[4]-বিষয়ক বিধানের সত্যতা নির্ধারণের উপায় সম্বন্ধে দেকার্তের মতের একটি স্থূল বিবৃতি নীচে দেওয়া হ'ল।

1 Proposition or judgement.
2 Rationalism.
3 Fact.
4 Real object.

(1) যদি কেউ কোন বিধানের অর্থ সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারে, তা হলে এই বিধান সত্য কিনা, তাও সাক্ষাৎভাবে আন্তর উপলব্ধিতে জানতে পারবে।

(2) যে-সকল বিধান অন্য কোন বিধানের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণভাবে বোঝা সম্ভবপর, সেগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ এই নাম দেওয়া সংগত হবে।

(3) এইগুলোকে অবশ্য-স্বীকার্য মৌলিক তত্ত্ব[1] বলে গ্রহণ করা যায় এবং অন্যান্য ভূতার্থ-বিষয়ক বিধান[2] এদের থেকে অবরোহ[3] পদ্ধতিতে বের করা সম্ভবপর। অবরোহ-অনুমানের প্রত্যেকটি ধাপ সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারলে, অনুমানটি যথার্থ কিনা, তাও আন্তর-উপলব্ধি-গম্য। যে বিধান বিমিশ্র ও অস্পষ্ট, তাকেও যদি অন্যান্য সম্পূর্ণ বোধগম্য বিধান থেকে অবরোহ-পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা যায়, তাহ'লে সেই বিধানটিও স্পষ্ট, সম্পূর্ণ বোধগম্য এবং আন্তর-উপলব্ধিতে সত্য বলে নির্ধারিত হবে।

উপরিবর্ণিত বিবরণ থেকে প্রতিভাত হবে যে, নিগমন পদ্ধতিটিকে দেকার্ৎ আন্তর-উপলব্ধির দ্বারা জ্ঞান-সম্প্রসারণের উপায় বলেই ভেবেছিলেন, তিনি আধুনিক যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের[4] মতন নিগমন-পদ্ধতিকে পূর্বজ্ঞাত বিধানের শুধু বিশ্লেষণ অথবা স্পষ্টীকরণ বলে মনে করেন নি। অর্থাৎ দেকার্তের মতে, বোধগম্যতা এবং প্রমাত্ব (অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানত্ব) যে একই জিনিস, তাও তিনি এই নূতন পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

এই নূতন পদ্ধতির বর্ণনা পরে দেওয়া হবে। তার আগে, যুক্তিবাদের কিছু বিবরণ দেওয়া আবশ্যক বলে মনে হচ্ছে। যুক্তিবাদের প্রধান কথা হচ্ছে এই যে, কোন বিধানকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেই তা যে সত্য, তাও বুঝতে পারা যায়। যুক্তিবাদের এই মূল কথাটি মেনে নিলে, স্বীকার করতে হবে যে, বস্তুস্থিতি[5] হচ্ছে কতকগুলো স্পষ্টভাবে বোধগম্য স্ব-বিরোধ-মুক্ত বিধান বা ধারণামাত্র। লক্ষ্য করতে হবে যে, যুক্তিবাদে বস্তুস্থিতি ও বিধানের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করা

1 Principles.
2 Proposition about facts.
3 Deduction.
4 Logicai Positivists.
5 Fact.

যেতে পারে না। কারণ, তাহ'লে বিধানকে বুঝলে, বস্তুস্থিতিকে যে বোঝা গেল, তা বলা যায় না। অর্থাৎ যুক্তিবাদে ধরে নেওয়া হয় যে, পদার্থ-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সকল এবং যৌক্তিক ও গাণিতিক সিদ্ধান্তগুলোর স্বরূপ মূলত: এক। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, লাইবনিজ যুক্তিবাদের এই ধারণাটিকে স্পষ্টভাবে জেনেশুনে গ্রহণ করেছিলেন। তাই, তিনি এমন এক দর্শন প্রণয়নের চেষ্টা করেছিলেন, যার প্রত্যেকটি বিধানই হবে সম্পূর্ণভাবে যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু দেকার্ৎ যুক্তিবাদের এই দিকটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। তাই, তিনি ভেবেছিলেন যে, দশনশাস্ত্রে যুক্তিবাদের সাথে এমন কিছু বিধানও মানা আবশ্যক, যা শুধু যুক্তির সাহায্যে সত্য বা মিথ্যা বলে নির্ধারণ করা যায় না। এই বিধানগুলো কি?

স্পষ্টতা, বিবিক্ততা ও সম্পূর্ণ বোধগম্যতা এইগুলোকে দেকার্ৎ গাণিতিক বিধানের সত্যতার নির্ণায়ক বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু গাণিতিক বিধান অথবা ধারণাগুলো মূলত: কোথায় পাওয়া গেল? এগুলো নিশ্চয়ই বাহ্য জগতের পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া যায় না। দেকার্তের মতে, ইন্দ্রিয়জ পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির সাহায্য ছাড়াই আমাদের প্রজ্ঞাশক্তি যা নিশ্চিতভাবে জানতে পারে, এবং সত্য বলে জানতে পারে, তা হ'ল আমাদের মানসিক ধারণা অথবা বৃত্তি[1]। ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি গাণিতিক পদার্থগুলো আমাদের ধারণা বা বৃত্তি। প্রজ্ঞাশক্তি তার অন্তর্দৃষ্টিতে এইগুলোকে বুঝতে পেরে, তাদের সম্বন্ধে যে সকল বিধানে উপনীত হয়, সেগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে প্রজ্ঞাশক্তি নিঃসন্দিগ্ধ থাকে। অর্থাৎ গাণিতিক ধারণাগুলো হচ্ছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিবিক্ত; আর মন বা প্রজ্ঞার চোখে এদের স্বরূপটি অভ্রান্তভাবে উপলব্ধি করা সম্ভবপর। আর এটাই হচ্ছে গাণিতিক পদ্ধতির নিঃসন্দিগ্ধতার প্রকৃত হেতু।

দেকার্ৎ এই সকল ধারণা সম্বন্ধে যে জাতীয় বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাদের সম্বন্ধে আরও যে-সকল কথা বলেছেন, তার থেকে মনে হতে পারে যে, ধারণা হচ্ছে যেন এক প্রকার মনশ্চিত্র। লক্‌ও ধারণা শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করেছেন। সাধারণ লোকেও ধারণার এইরূপ বর্ণনা দিয়ে থাকে। এর কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়জ মানসচিত্র অর্থাৎ স্মৃতিচিত্রকে মনের চোখে দেখতে পাওয়া যায়, তার এইরূপ চিত্র

1 Idea. অবশ্য, সর্ব ধারণা সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নয়। কারণ, ভ্রান্তধারণাও-ত থাকতে পারে।

স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট হয়, এইরূপ বলা স্বাভাবিক বলে মনে হয়। তথাপি, মনে রাখা দরকার যে, দেকার্ৎ কদাচিৎই ধারণা বলতে মানসিক ছবি বুঝেছেন। বস্তুতঃ, ধারণা বলতে তিনি সাধারণতঃ বিধারণা[1] অর্থাৎ সার্বিক ধারণা বুঝতেন। এখন, ইন্দ্রিয়-সংবেদনবাদী[2] এবং যুক্তিবাদী উভয়েই বলেছেন যে, শব্দ বা পদ হচ্ছে ধারণার প্রতীক—কিন্তু সংবেদন-বাদীরা ধারণা বলতে মানসিক চিত্রই বুঝেছেন, আর যুক্তিবাদীরা বুঝেছেন বিধারণা। অবশ্য, উভয়প্রকার দার্শনিক তাঁদের স্বপক্ষে যুক্তি দেওয়ার সময়ে, ধারণার সম্বন্ধে এই বিভিন্ন দুটি ধারণারই সাহায্য নিয়েছেন এবং তখন এদের পার্থক্যের ব্যাপারে তাঁরা সচেতন থাকেন নি।

ধারণা সম্বন্ধে দেকার্তীয় মতটি সংক্ষেপে এই যে, বর্ণনাকারী শব্দের অর্থ বুঝতে পারার মানে হচ্ছে, প্রজ্ঞা বা মনের চোখে ধারণাকে দেখতে পাওয়া। কিন্তু এর গর্ভিতার্থ এই যে, বর্ণনাকারী শব্দ হচ্ছে ব্যক্তিবোধক নাম। কারণ, সার্বিক ধারণাকে সাক্ষাৎভাবে জানা সম্ভবপর নয়—শুধু ব্যক্তিকেই সাক্ষাৎভাবে জানা সম্ভবপর।

দেকার্তীয় তথা প্রাচীন ও মধ্যযুগীন এই মতটির বিরুদ্ধে সম্প্রতিকালীন প্রত্যক্ষবাদীদের একটি প্রধান আপত্তি এই যে, শব্দকে ব্যক্তিবোধক বলে গ্রহণ করা হচ্ছে যুক্তিবাদেরই মূলে আঘাত করা। কারণ, বাহ্য অথবা আন্তর পদার্থের সাক্ষাৎ জ্ঞানের জন্য, শুধু যুক্তি বা তর্কবিচার কখনও পর্যাপ্ত নয়। অবশ্য, গাণিতিক অথবা যুক্তিশাস্ত্রীয় বিধানের শব্দগুলোকে বুঝতে পারলেই ঐ বিধানের সত্যাসত্যতা নির্ধারণ করা সম্ভবপর। কিন্তু এইকথা কোন অস্তিত্ববান্ বস্তু-বিষয়ক অর্থাৎ ব্যক্তিবিষয়ক বিধানে আদৌ প্রযোজ্য নয়। কারণ, ব্যক্তিবিষয়ক বিধানকে বুঝতে পারলেও, তার সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ধারণ করা যায় না। ব্যক্তিটি মনোলোকস্থ পদার্থ হ'লেও, তৎসম্পর্কিত বিধানের সত্যতা ঐ বিধানটির বোধগম্যতার ওপর নির্ভর করে না; বরং তা নির্ভর করে উক্ত ধারণা-ব্যক্তিটির সাক্ষাৎ জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির ওপর। তা যাই হোক, দেকার্ৎ মানসিক ধারণার সম্বন্ধে এই যে মত পোষণ করতেন, তার পরিণাম এই হ'ল যে, তিনি ভাবলেন, যদি তিনি অসীম বস্তুর ধারণাটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন, তাহলে এই স্পষ্ট বোধগম্যতার দ্বারা উক্ত অসীম বস্তুর সত্যতাও প্রমাণিত হয়।

1 Concept.
2 Empiricist.

এইসব কথা ধরে নেওয়াতে, দেকার্ৎ এই ভুলটি করলেন যে, ধারণা নামক কোন মানসিক পদার্থকে মনের চোখে স্পষ্ট ও বিবিক্তভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারলেই বোঝা যাবে যে, সেই ধারণার প্রামাণ্য রয়েছে, অর্থাৎ ঐ ধারণার অনুরূপ একটি পদার্থ মনের বাইরেও বিদ্যমান।

2. সংশয় পদ্ধতি

ওপরে বর্ণিত দেকার্তের মতটি পরে তিনি কিছু পরিবর্তিত আকারে তাঁর "মৌলিক দর্শন-বিষয়ক চিন্তা"[1] নামক গ্রন্থে এবং "বিচার পদ্ধতি বিষয়ক কথা"[2] নামক গ্রন্থে উপস্থাপিত করেন। এখানে তাঁর বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার জন্যে স্বল্প সংখ্যক কয়েকটি মূল বিধান বেছে নেওয়া আবশ্যক, আর তার উপায় হচ্ছে আমাদের প্রচলিত বিশ্বাসগুলোকে প্রথমেই সংশয়ের আগুনে ফেলে যাচাই করা, এবং এই অগ্নিপরীক্ষায় যেগুলো অক্ষুন্ন থাকবে সেগুলোকে মূল বিধানরূপে গ্রহণ করা।

দেকার্তীয় সংশয় শুধু একটি মানসিক অবস্থা বা বৃত্তি নয়[3] অর্থাৎ আমি কোন বিধানকে সংশয় না করতে পারলেই যে, তা সত্য বলে গৃহীত হওয়ার যোগ্য হবে, দেকার্ৎ এমন কথা বলতে চান না। দেকার্তীয় সংশয় পদ্ধতিটির জিজ্ঞাস্য এই নয় যে, আমি কি এই বিধানটিকে ক্ষুদ্রতম সংশয়ের যোগ্য বলেও ভাবতে পারি? অর্থাৎ আমার মনে এই সংশয়ের উপস্থিতির কিছুমাত্র সম্ভাবনা আছে কি? দেকার্তীয় সংশয়সূচক প্রশ্নটি হচ্ছে যুক্তিসংগত সম্ভাব্যতার প্রশ্ন। আগুনের সংস্পর্শে যে হাত পুড়ে যায়, এ সম্বন্ধে যদি সন্দেহ করি, অর্থাৎ আগুনের দাহ শক্তি নাও থাকতে পারে, যদি এরকম ভাবি বা চিন্তা করি, তাহলে আমার এই চিন্তায় কোন যুক্তিশাস্ত্রীয় অসম্ভাব্যতা দেখা দেবে কি? যৌক্তিক অসম্ভাব্যতার কথা তোলায়, সংশয়মূলক পদ্ধতিটি পূর্ববর্ণিত যুক্তিবাদীয় পদ্ধতির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলা চলে না। অন্ততঃ, এটা স্বীকার করতে হবে যে, পদ্ধতি দুটির মধ্যে কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই। একটু পরেই বোঝা যাবে যে, সংশয়পদ্ধতি হচ্ছে যুক্তিবাদীয় পদ্ধতির সমর্থনকারী এবং পরিপূরক।

---

1 *Meditations on First Philosophy.*

2 *Discourse on Method.*

3 State or mode of mind.

সংশয় পদ্ধতির প্রয়োগ করতে গিয়ে, দেকার্ৎ এই প্রশ্নও তুললেন, পাটিগণিতের অত্যন্ত সাদাসিধে বিধানগুলোকে সংশয় করলে, কোন স্ব-বিরোধ দেখা দেয় কিনা। যুক্তিবাদীয় পদ্ধতি অনুসারে, বিধানের সত্যতা নির্ভর করে তার স্পষ্টতা ও বিবিক্ততার ওপর—ধারণা বা বিধানটি মনের সামনে স্পষ্টভাবে আনতে পারাই তার সত্যতার নির্ণায়ক। সংশয়-পদ্ধতি প্রয়োগ করার সময়ে, দেকার্ৎ যে এই যুক্তিবাদীয় পদ্ধতিটি পরিত্যাগ করলেন, তা নয়; বরং, বলা যেতে পারে যে, তিনি সংশয়-পদ্ধতির দ্বারা যুক্তিবাদীয় পদ্ধতিটির যাথার্থ্য প্রমাণ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। ২+২=৪, এই বিধানটিকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি, অতএব এটি সত্য—এই যে ধারণার স্পষ্টতা ও বিবিক্ততামূলক সত্য-নির্ধারণের পদ্ধতি, এইটি সম্যক্ কিনা, তার সম্বন্ধেও এখন সন্দেহের অগ্নি পরীক্ষার প্রস্তাব করা হ'ল।

গণিতের এবং তর্ক-বিদ্যার সাদাসিধে বিধানগুলোর সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহের প্রশ্ন তুলেই দেকার্ৎ ক্ষান্ত হননি। আমরা আমাদের নিজ নিজ মনের ভেতর যে সকল বৃত্তি বা অবস্থা মনের চোখে দেখতে পাই, সেগুলো সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ থাকি বটে, তবু এখন তিনি সেগুলোকেও সন্দেহাগ্নিতে ফেলে পরীক্ষা করতে চাইলেন।

ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানে আমাদের সমধিক বিশ্বাস। তথাপি আমরা সবাই জানি যে, ইন্দ্রিয় দ্বারাও বহু স্থলে আমাদের ভ্রান্তি হয়। সুতরাং, কে জানে, হয়ত ইন্দ্রিয়গুলো সর্বদাই আমাদের প্রতারণা করে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়জনিত ভ্রান্তি বুঝতে হলে, একই প্রসঙ্গে ইন্দ্রিয়জনিত খাঁটি জ্ঞান স্বীকার করা দরকার; আর তাহ'লে, ইন্দ্রিয়গুলো হয়তো সর্বদাই আমাদের ভ্রান্তি জন্মাচ্ছে, এই কথাটি বুদ্ধিস্থ হতে পারে না। কিন্তু দেকার্তীয় সংশয়কে এত সহজে হটানো কঠিন। স্বপ্নে, আমাদের কাছে কোন কোন জ্ঞান মিথ্যা বলে মনে হয়, ও ঐ প্রসঙ্গে অন্য জ্ঞান খাঁটি বলে স্বীকৃত হয়; অথচ দুটি জ্ঞানই তো স্বাপ্ন; অতএব এটা অসম্ভব নয় যে, ভ্রান্তিও প্রমার পার্থক্য স্বীকার করার সময়েও, আমরা শুধু স্বপ্নই দেখে যাচ্ছি। এই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে কেউ হয়তো বলবে, স্বপ্নকে স্বপ্ন বলে বুঝতে হলে, জাগৃতি নামক অন্য অবস্থা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু এই কথারও একই জবাব। স্বপ্ন ও জাগৃতির ভেদও তো স্বপ্নের ভেতরই অনুভূত হতে পারে। তাছাড়া, স্বপ্ন ও জাগৃতির ভেদ-দর্শক কোন সুনিশ্চিত চিহ্ন বিচারবুদ্ধি খুঁজে পাবে না। সুতরাং আমি যখন মনে করছি যে, আমি

আগুনের ধারে বসে আছি, তখন কে জানে, আমি হয়তো আমার বিছানায় শুয়ে শুধু এই রকম স্বপ্ন দেখছি।

স্বপ্নের দৃষ্টান্তটির সম্বন্ধে সম্প্রতিকালে কেউ কেউ নিম্নলিখিত রকমের আপত্তি তুলেছেন। স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দেওয়ার সময়ে, দেকার্তের মনে যে-যুক্তিটি কাজ করেছে, তা ন্যায়সঙ্গত নয়। যুক্তিটি এই যে, আমি যেহেতু মাঝে মাঝে স্বপ্নজাতীয় ভ্রমে পতিত হয়েছি, অতএব সর্বদাই ঐরূপ ভ্রমে পতিত হয়েছি, এরকম সন্দেহ করলে তাতে কোন স্ববিরোধ হবে না। কিন্তু সামান্য বিচার করলেই বোঝা যাবে যে, এই যুক্তির হেতু-বাক্যটি সমর্থন-যোগ্য নয়। কারণ, কোন বিধান মাঝে মাঝে সত্য হ'লে, তার থেকে ঐ বিধানটি যে সর্বদাই সত্য, তা যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে বলা যায় না।

স্বপ্ন-দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধে এই আপত্তি আমার কাছে শুধু তর্ককুশলতার প্রদর্শন বলে মনে হয়। একথা ঠিক যে, 'ভ্রান্তি হয়েছে' এই রকম অন্ততঃ একস্থলে বুঝতে না পারলে, অন্যস্থলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা ভাবা যায় না, অথবা জ্ঞানের প্রামাণ্য সন্দেহ করা যায় না; এবং তা বুঝতে পারলে, ঐ সম্ভাবনা ভাবা যায় অথবা ঐরূপ সন্দেহ করা যায়। কিন্তু তর্কবিজ্ঞানের দ্বারা এ কথার সমর্থন অথবা প্রত্যাখ্যান কিছুই হয় না। এইটি হচ্ছে দুটি মানসিক ঘটনার মধ্যে একটি স্বাভাবিক কার্যকারণ সম্বন্ধ মাত্র। বলা বাহুল্য, সংশয়রূপ কার্যের প্রতি তৎপূর্ববর্তী ভ্রান্তির জ্ঞান একমাত্র কারণ নয়। ভ্রান্তির জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, কদাচিৎই আমাদের মনে জ্ঞানের সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় হয়। প্রকৃতপক্ষে, দেকার্তীয় সন্দেহের একটা সাধারণ কারণ হচ্ছে সন্দেহের ইচ্ছা। আর এই ইচ্ছার একটি উদ্দেশ্য বা নিমিত্ত হচ্ছে, সন্দেহাতীত জ্ঞান বা বিধানের আবিষ্কার। এই স্বেচ্ছাকৃত সন্দেহের শুধু একটি প্রতিবন্ধক থাকতে পারে। যে জ্ঞান বা বিধানের সত্যতায় সন্দেহ করলে স্ববিরোধ দেখা দেবে, সেখানেই এই সন্দেহ অযৌক্তিক এবং ঐ জ্ঞান বা বিধানটি তর্কসিদ্ধ প্রামাণ্যের অধিকারী বলে নির্ণীত হবে।

দেকার্ৎ কিন্তু অধুনা-আলোচিত একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। প্রশ্নটি এই। আমি যে আগুনের পাশে বসেছিলাম, এটা ভুল হতে পারে, কিন্তু আমি আগুনের পাশে বসেছিলাম বলে যে ভেবেছিলাম, এটাও কি ভুল হতে পারে? যদিও দেকার্ৎ এই প্রশ্ন তোলেন নি, তবু তিনি যখন বলেন নি যে, এই বিধান নিঃসন্দিগ্ধভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তাঁর মতে এইরূপ বিধানও সংশয়ের গণ্ডীর বাইরে নয়।

আমার মনে হয় যে, দেকার্তীয় সন্দেহ সম্বন্ধেও দেকার্তীয় সন্দেহ সম্ভবপর। অবশ্য, আগে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, এই সংশয়-বিষয়ক সংশয়ে স্ববিরোধ আছে কিনা।

২+২=৪', এই বিধানটিকে সন্দেহ করা অসম্ভব বলেই মনে হয়। এটিকেও সন্দেহের আওতায় আনার জন্য দেকার্ৎ একটি অদ্ভুত সম্ভাবনার কথা ভাবলেন। সম্ভাবনাটি এই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা হয়ত অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ একটি দুষ্ট দানব, আর সে তার অপ্রতিহত ক্ষমতাবশতঃ দেকার্ৎকে প্রত্যেক ব্যাপারেই ভ্রান্তিতে ফেলার ফাঁদ পেতেছে; তাইতে, দেকার্তের সর্বজ্ঞান ও বিশ্বাস ভুল হতে পারে, এইরূপ সংশয় সম্ভবপর। তথাপি, এই অবস্থাতেও, যদি এমন কোন জ্ঞান বা বিধান থাকে, যার সম্বন্ধে সন্দেহ করা একেবারে অসম্ভব (অর্থাৎ যদ্বিষয়ক সন্দেহ পদার্থটি স্ববিরোধাপন্ন), তাহলে, ঐ বিধানটিকে সত্য বলে ধরে নিতে হবে।

সত্য নির্ণয়ের এই সংশয় পদ্ধতি সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেছেন যে, এই পদ্ধতির প্রয়োগে ২+২=৪ গণিতের এইরূপ বিধানগুলো এবং যুক্তি-বিজ্ঞানের মূলীভূত 'চিন্তার নিয়মগুলো'[1] অকাট্য সত্য বলে প্রমাণিত হতে বাধ্য। এগুলোকে সন্দেহ করা অযৌক্তিক না হয়েই পারে না। সর্বশক্তিমান ও প্রতারক দানবের পক্ষেও একই বিধানকে একই অর্থে এবং একই সঙ্গে সত্য ও মিথ্যা বলে আমাদের মনে ভ্রান্তি জন্মানো অসম্ভব। অথচ দেকার্ৎ এই সকল গাণিতিক ও তর্কবৈজ্ঞানিক বিধান-গুলোকেও তাঁর সর্বগ্রাসী সংশয়ের মুখবিবরে এনেছিলেন। দেকার্তের এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয় কি? গাণিতিক ও তর্কবৈজ্ঞানিক বিধানগুলো হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যীয় ধারণার[2] বিশ্লেষণ থেকে সঞ্জাত এবং এই জন্য গাণিতিক বিধান সকল কোন বিশেষ স্থলে প্রযুক্ত অবিরোধ তত্ত্বেরই উদাহরণমাত্র; আর এগুলোকে সংশয় করা মানে অবিরোধ তত্ত্বকেই সংশয় করা।

লক্ষ্য করা দরকার যে, দেকার্ৎ তর্কবিজ্ঞানের মূলীভূত চিন্তার নিয়মগুলোকে সংশয় করেননি। অর্থাৎ অবিরোধ-তত্ত্বকে[3] সংশয়ের আওতায় আনেন নি। অবশ্য, গণিতের বিধানগুলোকেও দেকার্ৎ সংশয়ের গণ্ডীর ভেতরে ফেলেছিলেন। কিন্তু এইরূপ ক'রে, তিনি

1 Laws of Thought.
2 Subject-concept.
3 Principle of Non-contradiction.

অবিরোধ তত্ত্বকেই সংশয় করেছিলেন, এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তাছাড়া, যে-বিশিষ্ট মত মেনে নিয়ে, গণিত-বিষয়ে দেকার্ৎকে সমালোচনা করা হয়, সেই মতটি সম্প্রতি বহুল-প্রচলিত হলেও, মনে রাখা দরকার যে, তা সর্ব বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সমর্থিত নয়। বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ পঁয়কেয়ার্-এর মতে, গাণিতিক বিধান বৈশ্লেষণিক নয়। অবশ্য, গণিতজ্ঞ দেকার্ৎ এটা নিশ্চয়ই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ২+২=৪ এই বিধানের নিষেধে স্ব-বিরোধ থাকতে বাধ্য; আর তা হলে, অবিরোধ তত্ত্বকে অগ্রাহ্য না করে, তিনি এই বিধানের সত্যতা সম্বন্ধে কি করে, সংশয় করবেন? এ সম্বন্ধে, আমার বক্তব্য এই যে, কোন বিধানকে (তা গণিতের হোক অথবা না হোক) সত্য বলে বিশ্বাস করলে, আমরা তার অসত্যতার সম্ভাবনা ভাবি না বটে। কিন্তু দেকার্ৎ বর্তমান প্রসঙ্গে এমন এক সংশয়ের কথা তুলেছেন, যার সামনে আমাদের নরম বা শক্ত সর্ববিশ্বাসকেই সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হচ্ছে। স্বপ্নদৃষ্টান্তের এ-টাই তাৎপর্য। অবশ্য, স্বপ্নদৃষ্টান্তের এমন কোন গাভতার্থ নেই যে, 'চিন্তার-নিয়ম'গুলোও সন্দেহ-যোগ্য। যারা ভাবেন যে, দেকার্ৎ এই গুলোকেও সন্দেহের আওতায় এনেছিলেন, তারা সংশয়-পদ্ধতির সম্বন্ধে প্রচণ্ড অজ্ঞতারই পরিচয় দেন।

তাছাড়া, আমার মনে হয় যে, দেকার্ৎ নিশ্চয়ই 'একই বিধান সত্য ও মিথ্যা হতে পারে না' চিন্তার অধিষ্ঠানীভূত এই বিধানের প্রামাণ্যকে সংশয় করেন নি। করলে, তাঁর যুক্তিবিচারই অচল হয়ে যেত। কিন্তু তর্ক-বিজ্ঞানের অবিরোধ তত্ত্বদ্বারা দেকার্তের মূল সমস্যার সমাধান হয় না। আমি যখন আগুনের পাশে বসে আছি বলে দৃঢ় বিশ্বাস করি, তখন হয়তো আমি স্বপ্ন দেখছি, এইরূপ সংশয়ের ভেতর কিছু স্ববিরোধ আছে কি?

কয়েকবার বলে এসেছি যে, এই কৃত্রিম সংশয় হচ্ছে একটি উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত, আর এই উদ্দেশ্যটি হচ্ছে প্রস্তাবিত এই সংশয় কোথাও অবিরোধ তত্ত্বেরও ধাক্কা খেয়ে প্রতিনিবৃত্ত হয় কিনা, তা আবিষ্কার করা। এখন দেকার্তের বক্তব্য এই যে, অন্ততঃ একটি স্থলে এই সর্বগ্রাসী সংশয়কেও দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন হতে হয়; আর এই স্থলটি হচ্ছে সংশয় কর্তার নিজের অস্তিত্ব, অর্থাৎ অবিরোধতত্ত্বকে অগ্রাহ্য না করে, "আমি আছি" এই বিধানকে সংশয় করা অসম্ভব। দেকার্তের পরিকল্পিত সুচতুর প্রতারক আমাকে অনবরত প্রতারণা করছেন, একথা মেনে

নিলেও, প্রমাণিত হবে যে, "আমি আছি' এই বিধানটির ব্যাপারে তিনি আমাকে ঠকাতে পারেন না। 'আমি আছি' এই কথার সত্যতা না মেনে গত্যন্তর নেই।। যে-কোন ধারণা বা বিধানকে সন্দেহ করার সময়ে, দেকার্ৎ উপলব্ধি করলেন যে, সন্দেহ করা মানে নিশ্চয়ই একটা কিছু ভাবা বা চিন্তা করা ; সুতরাং সন্দেহ করার সময়ে, আমি ভাবছি অথবা চিন্তা করছি, এই বিধানটিকে সন্দেহ করা অযৌক্তিক হতে বাধ্য। আমি অস্তিত্ববান না হ'লে, আমাকে প্রতারণা করা অসম্ভব। আমাকে দিয়ে ভুল চিন্তা করাতে হ'লে, আমাকে দিয়ে নিশ্চয়ই চিন্তা করাতে হবে। ভুল চিন্তাও তো একরকম চিন্তা, প্রতারিত হওয়া মানে ভুল ভাবা ; কিন্তু ভাবার বিষয় যাই হোক না কেন, ভুল ভাবার সময়ে যে নিশ্চয়ই একটা কিছু ভাবা হয়, এটা কখনও ভুল হতে পারে না। সর্ব বিষয়ের সন্দেহের সময়েও, সন্দেহ-কর্তার অস্তিত্ব অসন্দিগ্ধই থেকে যায়।

আজকাল, দেকার্তের এই সকল কথার বিরুদ্ধে নানারকম আপত্তি তোলা হয়ে থাকে। আপত্তিগুলোর মূল কথাটি কিন্তু আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক বলে মনে হয়। সংক্ষেপে, আপত্তির মূল বক্তব্য এই। যদি আমি চিন্তা করি, তাহলেও আমি চিন্তা করছি কিনা, এ সম্বন্ধে ভ্রান্তি ও অতএব সন্দেহ হওয়া অযৌক্তিক নয়। কারণ, কোন কোন বিশ্বাসের ভ্রান্তিত্ব প্রমাণসিদ্ধ। তাছাড়া, আমি যখন কোন বিষয়ে সন্দেহ করি, তখন সেই সন্দেহ সম্বন্ধে সন্দেহ করতে যৌক্তিক বাধা কোথায়?

এই আপত্তির সোজা জবাব এই যে, বিশ্বাস ভ্রান্ত হ'লেও, বিশ্বাস বা সংশয় করাও এক প্রকার চিন্তা বা মানস ক্রিয়া। ক্লোরোফর্ম নিলে, অথবা গাঢ় সুষুপ্তিতে, যে অবস্থা হয়, তাতে নিশ্চয়ই এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস বা সংশয় হ'তে পারে না। এই অসম্ভাব্যতাকে সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত বলে স্বীকার করতে হবে। সে সম্বন্ধে কোন অতি বুদ্ধিমান ও অতি পণ্ডিতের সংশয় থাকলে, তার সামনে নিম্নলিখিত যুক্তিটি (তা ছেলে-মানুষি বলে মনে হলেও) রাখা যেতে পারে। "যদি আমি কোন বিষয়ে বিশ্বাস বা সংশয় করি, তাহলে আমি তখন সচেতন; এখন আমি আমার সংশয় সম্বন্ধে বিশ্বাস বা সংশয় করছি ; অতএব এখন আমি সচেতন।" সচেতন অবস্থাকে হয়ত তা অচেতন, এইরূপ ভাবা অর্থাৎ সচেতন অবস্থার সচেতনতা সম্বন্ধে সংশয় করা হচ্ছে স্ববিরোধী ধারণার জলন্ত উদাহরণ। আর স্ববিরোধ-যুক্ত ধারণা নিঃসন্দিগ্ধভাবে অযৌক্তিক, অতএব ভ্রান্ত ও পরিত্যাজ্য।

আমার মনে হয় যে, যুক্তিসিদ্ধ নিঃসন্দিগ্ধতার এটাই একমাত্র মাপকাঠি বা পরিচায়ক। অবশ্য, এই যুক্তিসিদ্ধ নিঃসন্দিগ্ধতার দ্বারা শুধু কোন কোন ধারণার সম্ভাব্য সত্যতাই নির্ধারিত হতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা কোন ধারণারই বাস্তব সত্যতা নির্ধারিত হ'তে পারে না। বস্তুতঃ, বাস্তব সত্যতা নির্ধারণের কোন যৌক্তিক মাপকাঠিই নেই। বিরোধ-হীনতা ধারণার বাস্তব সত্যতার পরিচায়ক নয়। বন্ধ্যাপুত্র এই ধারণাটি তার স্ব-বিরোধবশতঃ যুক্তিতঃ অসত্য। কিন্তু স্ববিরোধ নেই বলে, 'বন্ধ্যা' বা 'পুত্রের' ধারণা যে সত্য, তা বলা যায় না। সত্য ধারণায় স্ববিরোধ নেই বটে, কিন্তু স্ববিরোধ না থাকলেই যে ধারণা সত্য হয়, এমন নয়। ধারণা বা বিধানের সত্যতা নির্ধারণের জন্য শেষ পর্যন্ত সাক্ষাৎ অনুভব এবং তদাশ্রয়ী অনুমান বা শাব্দপ্রমাণের ওপর নির্ভর না করে উপায় নেই। অর্থাৎ সত্যতা প্রমাণ-গম্য, তা তর্ক-বিচারগম্য নয়।

সুতরাং, আমি চিন্তা করছি অথবা ভাবছি, এই বিধানের সত্যতার উৎস হচ্ছে সাক্ষাৎ অনুভব। চিন্তা শব্দের দ্বারা দেকার্ৎ সুখ-দুঃখ-রূপ সংবেদন, ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রভৃতি প্রেরণা এবং সংশয় ও নিশ্চয়রূপ জ্ঞানক্রিয়া প্রভৃতি অন্তঃকরণের সর্বপ্রকার বৃত্তি বা অবস্থাই বুঝতেন ; আর এইসকল আন্তর বা মানসিক অবস্থা বা ক্রিয়া যখন উৎপন্ন হয়, তখন, এবং যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ, তাদের সম্বন্ধে আমরা অল্পবিস্তর সচেতন, এটাও দেকার্ৎ স্বীকার করবেন। এই চেতনা হচ্ছে একরকম আন্তর বা মানস প্রত্যক্ষ এবং এটি চিন্তনের স্বরূপগত ধর্ম। চিন্তনের এই নিজের সম্বন্ধে চেতনা হচ্ছে বহুলাংশে যোগাচারীয় বিজ্ঞানের স্ব-প্রকাশত্বের মতন।

তাই, সংশয়-বিষয়ক দেকার্তের যুক্তিটির সংক্ষিপ্ত আকার এই। সংশয় হচ্ছে একরকম চিন্তন ; সুতরাং সংশয় মানে সংশয়-ক্রিয়া, মানে এক প্রকার চিন্তনক্রিয়া ; চিন্তনক্রিয়া হচ্ছে স্ব-প্রকাশ ; অতএব সংশয় ক্রিয়াটিও স্ব-প্রকাশ চিন্তনক্রিয়া। তাই, সংশয় করার সময়ে, আমি সাক্ষাৎ অনুভবে জানি যে, আমি সচেতন, অথবা চিন্তা করছি।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে কেউ কেউ বলেন : দেকার্তের যুক্তিতে শুধু একটি চিন্তন-ক্রিয়ার অস্তিত্বকালে তার স্বল্পকালীন অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়, কিন্তু 'আমি'র অস্তিত্ব আদৌ প্রমাণিত হয় না।[1]

এই আপত্তির সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই। আত্মা বা 'আমি'-কে দেকার্ৎ

1 রাসেল প্রণীত *An Outline of Philosophy*, পৃঃ 171 দেখ।

এমন একটি স্থায়ী কিন্তু পরিচ্ছিন্ন দ্রব্য বলে ভাবতেন, যা আমাদের আগমাপায়ী চিন্তন-ক্রিয়াগুলোর ধর্মী। "আমি চিন্তা করছি অতএব আমি আছি", এই বাক্যের অর্থ যদি এমন হয় যে, আমার স্বল্পস্থায়ী স্ব-প্রকাশ চিন্তনক্রিয়ার ভেতর তার ধর্মী যে স্থায়ী আত্মা বা আমি, তা-ও অন্তর্ভুক্ত, তাহলে বাক্যটিকে কোন স্ব-প্রকাশ চিন্তনক্রিয়ার বর্ণনা বলে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু -প্রকাশ চিন্তন যদি নিজের স্বরূপ-সম্বন্ধে উক্তি করে, তাহলে, তা নিশ্চয়ই বলবে, "আমি হচ্ছি চিন্তনক্রিয়া।" আর এই উক্তির প্রামাণ্য উক্ত চিন্তন-ক্রিয়ার স্ব-প্রকাশত্ববশতঃ অবশ্যস্বীকার্য; সুতরাং বলতে হ'বে যে চিন্তন-ক্রিয়ারূপ যে 'আমি', তার অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য।[1] আমি বলতে চাই যে, চিন্তন-ক্রিয়ার সম্বন্ধে দেকার্তীয় যুক্তিটি অন্ততঃ স্বল্পস্থায়ী "আমি" বা আত্মার সাধক—এইকথা যুক্তিশাস্ত্রীয় নিঃসন্দিগ্ধতারই[2] উদাহরণ। একে নিষেধ করলে স্ববিরোধ অবশ্যম্ভাবী।[3]

"আমি চিন্তা করছি, অতএব আমি আছি" এই যুক্তির বিরুদ্ধে বিশ্লেষণবাদী দার্শনিক হয়ত বলবে, "দুটি বস্তুর (বা তাদের অবস্থা অথবা দুটি বাস্তবিক ঘটনার) মধ্যে এমন কোন সম্বন্ধ আমরা ভ্রান্তির সম্ভাবনা এড়িয়ে কখনও জানতে পারি না, যে-সম্বন্ধের ওপর নির্ভর করে, যুক্তিসিদ্ধ নিঃসন্দিগ্ধতার সাথে বলা যাবে যে, ঐ ুটির একটি সত্য হলে, অপরটি সত্য হতে বাধ্য। অবশ্য, বস্তু দুটি একই বস্তুর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলে, ঐরূপ নিঃসন্দিগ্ধ বিধান সম্ভবপর। কিন্তু এইরূপ হেতু-সিদ্ধান্তজ্ঞাপক যুক্তির একটি অনিবার্য অর্থাক্ষেপ[4] এই যে, এর দ্বারা কোন কিছুর বাস্তবিক সত্তা প্রমাণিত হয় না। এইরূপ যুক্তিতে ভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই বটে; কিন্তু এই ভ্রান্তির অসম্ভাবনা কোন কিছুর সত্তা নির্ণয়ে অসমর্থ।

---

1 চিন্তন ক্রিয়াই চিন্তনকারী (Thought is the thinker). উইলিয়ম জেমস-এর এই মত বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

2 Logical certainty.

3 এই প্রসঙ্গে ওয়াট্লিং-এর এই মন্তব্যটি বিবেচ্য:—দেকার্তীয় যুক্তিটির নির্দোষতা "আমি আছি" এবং "আমি চিন্তা করছি" এই দুটি বিধানকে বিনা বিচারে গ্রহণ করার ওপর নির্ভর করে। আমার ব্যাখ্যায়, এ দুটি বিধানের সত্যতা (বিনা বিচারে নয়, কিন্তু) তাদের স্বপ্রকাশত্বের দ্বারাই সমর্থিত হয়।

A Critical History of Western Philosophy নামক গ্রন্থে *Watling* কৃত দেকার্ৎ-প্রবন্ধ দেখ।

4 Unavoidable implication.

উপরিবর্ণিত আপত্তির আলোচনায় প্রথমেই আমাদের মনে রাখা দরকার যে, দেকার্ৎ নিজেই বলেছেন যে, এখানকার 'অতএব' শব্দটি ঠিক ঠিক হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তবাক্যের তর্কবিজ্ঞানীয় সংযোজক নয়। প্রকৃতপক্ষে, "আমি চিন্তা করছি" এরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে 'আমি আছি'। বিশ্লেষণবাদী দার্শনিকের এই মতটুকু অবশ্য গ্রহণযোগ্য যে, অত্রত্য 'অতএব' শব্দ এমন কোন অনুমানের সূচনা করে না, যার দ্বারা 'আমি আছি' এই বিধানের সত্যতা নির্ধারিত হচ্ছে। "আমি আছি" এই বিধানটি "আমি চিন্তা করছি" এই বিধানেরই অন্তর্ভুক্ত; আর "আমি চিন্তা করছি" এই বিধানটি যে সত্য, তা নিঃসন্দিগ্ধতার অধিকারী হলেও, তর্কবিজ্ঞানের কোন অনুমানের দ্বারা তার সত্যতা নির্ধারিত হয় না; কিন্তু তা চিন্তার সন্দেহাতীত স্ব-প্রকাশত্ব দ্বারা সিদ্ধ। চিন্তার স্ব-বিষয়ক সন্দেহাতীত জ্ঞান মানে অস্তিত্ববান্ চিন্তার সন্দেহাতীত জ্ঞান। অর্থাৎ এই সন্দেহাতীত জ্ঞানের বিষয় যে চিন্তা, তার বিশেষণ যে অস্তিত্ব, তাও উক্ত সন্দেহাতীত জ্ঞানেরই বিষয়।

প্রকৃতপক্ষে, "আমি চিন্তা করছি, অতএব আমি আছি" এটিকে অনুমান বলে ধরে নিলেও, পূর্ণাঙ্গ অনুমান বলা যায় না। এর পূর্ণতার জন্য, "যা যা চিন্তা করছে, তা'তা আছে," এইরূপ একটি সঠিক সার্বিক বিধানও আবশ্যক। কিন্তু চিন্তা ও সত্তার এই সার্বিক সামানাধিকরণ্যকে মৎস্থ চিন্তা ও সত্তার সামানাধিকরণ্যের ওপরই দাঁড় করাতে হবে। শেষ পর্যন্ত, চিন্তা ও সত্তার ব্যতিক্রমহীন সহচার নিজ নিজ মনের ভেতর সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করা, এর থেকে অধিক নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান আর হতে পারে না। কাজে কাজেই, 'আমি চিন্তা করছি, অতএব আমি আছি', সর্বপ্রামাণ্যের ভিত্তিস্থানীয় এই বিধানটি অনুমান নয়, কোন অনুমানের অবয়বও নয়। কিন্তু এটি হচ্ছে চিন্তনক্রিয়ার স্বপ্রকাশতারূপ সাক্ষাৎ-অপরোক্ষতার মালিক। এটি হচ্ছে জ্ঞানান্তর-নিরপেক্ষ সর্বোত্তম প্রত্যক্ষানুভূতি। সংশয়রূপ তলোয়ারের ধার এখানে কুণ্ঠিত। আর যে উদ্দেশ্যে সংশয়াস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছিল, ঐ উদ্দেশ্যটি সর্বাগ্রে এখানেই চরিতার্থ হয়। সন্দেহ হচ্ছে সত্যনির্ধারণের জন্য স্বেচ্ছায় গৃহীত একটি উপায়মাত্র। সন্দেহ হচ্ছে দার্শনিক বিচারের প্রারম্ভ; কিন্তু তা তার অন্ত্য ফল নয়। সত্যলাভের অদম্য সবল আকাঙ্ক্ষার পূর্তির জন্যেই সন্দেহের প্রয়োগ। সংশয় দ্বারা যে জ্ঞানের সম্ভাবনাই নষ্ট করে দেওয়া হয়, তা নয়। নিজের চেষ্টায়, অথবা পরের কথায়, বিনা বিচারে, আমরা যে সকল জ্ঞানলাভ

করি বলে বিশ্বাস করি, দেকার্তের সংশয়রূপ অস্ত্রের দ্বারা এই বিশ্বাসটিকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে কেবল কিছুকালের জন্য তাকে একপাশে সরিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু তাকে বাতিল করে দেওয়া হয়না। শুধু নিজের দ্বারা পরীক্ষিত জ্ঞানই প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের গ্রহণীয়। এইরূপ জ্ঞান পরের কাছ থেকে পাওয়াও যায় না, পরকে দেওয়াও যায় না। তা শুধু প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও পরীক্ষা দ্বারাই আহরণ করা সম্ভবপর। ভিত্তিহীন বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে না থাকা, স্বাধীনভাবে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় নিজেই তা বিচার করে দেখা—এটাই সত্য নির্ধারণের খাঁটি প্রণালী। আত্ম-প্রবঞ্চনা ও পুরণো কথার পুনরাবৃত্তি না করে, চিরাভ্যস্ত মানসিক আলস্যকে দূরে রেখে, যে-সব মত বিনাবিচারে এতদিন সত্য বলে মেনে চলেছি, সেগুলোকেও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। শুধু বিনাবিচারে গৃহীত জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্বন্ধেই দেকার্ৎ সন্দেহ উত্থাপন করেছেন। সুনিশ্চিত জ্ঞানের সম্ভাব্যতা তাঁর সন্দেহের বিষয় নয়। আগেই বলেছি যে, দেকার্ৎ সন্দেহবাদী নন। আসলে, তিনি হচ্ছেন বুদ্ধিবাদী বা যুক্তিবাদী। তাঁর মতে, যদি বুদ্ধি কোনরকম বাহ্য অন্তরায় দ্বারা প্রতিবদ্ধ না হ'য়ে স্বীয় স্বভাব অনুসারে সহজাত প্রেরণার দ্বারা চালিত হয়, অর্থাৎ যা স্পষ্ট ও বিবিক্ত নয় এরূপ কোন ধারণাকে নিশ্চিত সত্য বলে মেনে না নেয়, তাহলে, তা কখনও প্রমাদে পতিত হবে না। দেকার্তের অল্প পরে, রুশো নামক বিখ্যাত ফরাসী চিন্তক মানুষের হৃদয় সম্বন্ধেও অনুরূপ মত প্রচার করেছিলেন। অকৃত্রিমতা, স্বাভাবিকতা, মৌলিক অনবদ্যতার ওপর বলিষ্ঠ বিশ্বাস, এটাই হচ্ছে সংশয়পদ্ধতির গোড়ার কথা। মন থেকে মধ্যযুগীন পাণ্ডিত্যের জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে, চিরাচরিত প্রথার দাসত্ব থেকে, এবং পরের কথা নির্বিচারে মেনে নেওয়ার জড়ধর্ম থেকে মনকে মুক্তি দেওয়া, শুধু এইটুকু করতে পারলেই, প্রকৃত জ্ঞানের দ্বার খুলে যাবে। মন-যে সত্য অর্জন করার ক্ষমতা রাখে, দেকার্ৎ গণিতশাস্ত্রে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন। গণিতের প্রামাণ্যে দেকার্তের কোন সন্দেহ ছিল না। অবশ্য, চিন্তাকারীর সত্তা যে তার থেকেও অধিক নিশ্চিত, তা দেখাবার জন্যে তিনি কল্পনায় গণিত শাস্ত্রকেও সন্দেহের গণ্ডীতে টেনে এনেছিলেন।

সন্দেহাস্ত্র প্রয়োগ করার একটি উদ্দেশ্য ছিল দর্শনশাস্ত্রকেও গণিতের মতন অপ্রত্যাখ্যেয় বিধান সমূহের বিজ্ঞানে পরিণত করা। গণিতে উপাত্ত[1]

1 স্বীকৃত বিধান বা বর্তম। Probans.

থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য, যে যৌক্তিক প্রণালী অবলম্বিত হয়, দর্শনেও তদনুরূপ প্রণালী প্রয়োগ করে গণিতের মতনই দর্শনের সিদ্ধান্ত-গুলিকেও কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ মূল সত্য থেকে যৌক্তিক নিয়ম অনুসারে নিগমন পদ্ধতিতে তিনি নিষ্কাশন করতে চেয়েছিলেন। আর দেকার্ৎই দর্শনে জ্যামিতীয় অর্থাৎ যুক্তিশাস্ত্রীয় পদ্ধতির প্রবর্তক। পরবর্তীকালে, স্পিনোজা, ফিক্‌টে এবং হেগেল তাঁদের নিজ নিজ দর্শনে যে যৌক্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, দেকার্ৎই তার দিগ্‌-দর্শক। সে যাই হোক, দাশনিক বিচার-পদ্ধতিকে গণিতের মতন পুরোপুরি নিখুঁত করার উদ্দেশ্যেই, তিনি সংশয়ের সাহায্য নিয়েছিলেন ; আর এর ফলে "আমি চিন্তা করছি" এই বিধানটির সত্যতা যে অপ্রত্যাখ্যেয়, তা বুঝেছিলেন। অবশ্য দেকার্ৎ 'আমি'র এই নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানকে ভিত্তি করে ঈশ্বর এবং বহু চেতন ও অচেতন বস্তুর সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞানের একটি স্থায়ী প্রাসাদ নির্মাণেও প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই প্রয়াস তেমন সফল হয়নি। তথাপি তত্ত্ব-নির্ধারণের জন্য, সংশয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে, দেকার্ৎ আধুনিক চিন্তার জগতে একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। প্রাচীন গ্রীক দর্শনের দিন থেকে সত্যকে সুনিশ্চিতভাবে জানার ব্যাপারে, তর্ক-বিচারাত্মক প্রজ্ঞার অন্য-জ্ঞান-নিরপেক্ষ ক্ষমতায় পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকরা সাধারণতঃ যে-আস্থা রাখতেন, দেকার্ৎ ঐ আস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। দেকার্তের সংশয় পদ্ধতি এই অসন্তোষেরই সূচক। নানাদিক থেকে দেকার্ৎকে আধুনিক দর্শনের পিতা বলা হয়। দেকার্তের দিন থেকে আজ পর্যন্ত দর্শনের বিকাশ যেভাবে ঘটেছে, তাতে মনে হয় যে, তত্ত্ব-জ্ঞানের ক্ষেত্রে সংশয় ও অবিশ্বাসের প্রভাব ক্রমশঃ বেড়েই চলছে। স্পিনোজা, বার্ক্‌লি, লাইব্‌নিজ ও হেগেল্‌ প্রমুখ জ্ঞানবাদীদের কথা বাদ দিলে, আমরা বলতে পারি যে, তর্কবিচারমূলক আধুনিক দর্শনে, সংশয়ের অসামান্য প্রভাব রয়েছে। তাই, সংশয় পদ্ধতির জন্যেই দেকার্ৎকে আধুনিক দর্শনের পিতা বলা বিশেষভাবে সংগত হবে।

3. ঈশ্বরের অস্তিত্ব

সংশয় পদ্ধতির প্রয়োগে প্রমা-জ্ঞানের নির্ণায়ক[1] চিহ্ন যে স্পষ্টতা ও বিবিক্ততা, তার যৌক্তিক ও আনুভবিক সমর্থন পাওয়ার পর, দেকার্ৎ আমাদের কয়েকটি অকৃত্রিম ধারণাকে এই প্রামাণ্যের নির্ণায়ক চিহ্নের সাহায্যে যাচাই করে দেখলেন।

---

1 Criterion.

আমাদের মনে যে সকল ধারণা নিহিত রয়েছে, তাদের ভেতর ঈশ্বরের ধারণাটিকে সর্বোচ্চ আসন দিতে হ'বে। এই ধারণার উৎপাদক বা উৎস কি? অর্থাৎ ধারণাটি কোথা থেকে এলো? ধারণামাত্রেরই যে একটা কিছু হেতু বা কারণ আছে, বিচারবুদ্ধি তা না মেনে পারে না। কারণ, 'অসৎ থেকে কিছুই উৎপন্ন হয় না', এই স্পষ্ট ও বিবিক্ত (সুতরাং অভ্রান্ত) ধারণার ওপর তা প্রতিষ্ঠিত। এই অভ্রান্ত তত্ত্বটির অর্থ এই যে, কার্যের তুলনায় কারণ সমসত্তাক অথবা অধিকসত্তাক হ'তে বাধ্য। কার্যে যদি এমন কিছু থাকতে পারত, যা কারণে নেই, তা হ'লে, কার্যের এই উদ্রিক্ত সত্তা অসৎ থেকে এসেছে, এইরূপ অসম্ভব কথা মানতে হয়। কোন ধারণা যত বেশী পরিমাণ সত্তাসূচক অর্থাৎ ঐ ধারণার মাধ্যমে আমরা যতবেশী সত্তাযুক্ত বিষয়ের কথা ভাবি, ঐ ধারণার হেতুটিতে ততবেশী সত্তা থাকা অনিবার্য। এখন, ঈশ্বরের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে, উনি হচ্ছেন অনন্ত, স্বাধীন, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, জগতের স্রষ্টা, সর্বকল্যাণ-গুণান্বিত, সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্রব্য, ইত্যাদি। ঈশ্বরের এই ধারণা বাহ্য জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা পাই না, অথবা স্বেচ্ছায় নির্মাণ করি না, করিতেও পারি না। আমাদের থেকে অধিক সত্তাবান ব্যক্তিই এইরূপ ধারণা নির্মাণ করতে সমর্থ। আর অসীম বস্তু যে সীমিত বস্তু থেকে অধিক সত্তাবান, এটা সুনিশ্চিত। সুতরাং সীমিত বস্তুর ধারণাকে কল্পনায় বাড়িয়ে, অথবা সীমিতের নিষেধ কিংবা অভাবরূপে, আমরা অনন্তের ধারণায় পৌঁছতে পারি না। অনন্তের ধারণাকে সান্তের পূর্ববর্তী বলতে হবে। কারণ, অনন্তের ধারণা মনের সামনে না রাখলে, আমি নিজের অপূর্ণতা, দোষ-ত্রুটি, পরিচ্ছিন্নতা[1] প্রভৃতি উপলব্ধি করতে পারতাম না। সুতরাং, ঈশ্বরের ধারণা স্বয়ং ঈশ্বরই আমার মনে রোপণ করেছেন। এটাই বিচারবুদ্ধির সিদ্ধান্ত। ঈশ্বরের ধারণা প্রথম থেকেই আমার মনে নিহিত রয়েছে। তা আমার 'আমি'-বিষয়ক ধারণার মতনই স্বভাবসিদ্ধ বা ঈশ্বর-প্রদত্ত। অবশ্য, আমাদের ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণা অনেকাংশে অপূর্ণ—এর দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। তবু, ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট।

আমার থেকে ভিন্ন আমার বাইরে কোন পদার্থ নেই, এই মতটিকে নিজৈকসত্তাবাদ[2] বলা হয়। পাশ্চাত্য দর্শন-পণ্ডিতরা সাধারণতঃ এই

1 Finitude.
2 Solipsism.

মতটিকে বিশেষ অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন। দেকার্ৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, এই কেবল-নিজাস্তিত্ববাদ এড়াবার চেষ্টা করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত অহং-বিষয়ক জ্ঞান একমাত্র নিশ্চিত জ্ঞান বলে প্রতিভাত হয়, ততক্ষণ এই অহং থেকে ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্ব সন্দেহাতীত প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। আমরা অবশ্য সাধারণতঃ, আমাদের ঘটপটাদি-বিষয়ক ধারণাগুলো বাহ্য বস্তুর দ্বারা জনিত বলে মনে করি। কিন্তু এইগুলো যে বাস্তবিকই সেরকমভাবে জনিত এবং এগুলো যে মনের ভেতর থেকেই উৎপন্ন হয় না, এর সমর্থনে যুক্তি কি? এইসব ধারণা বাহ্যবস্তুর দ্যোতক বলে ধরে নেওয়ার দিকে আমাদের যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তা যে যুক্তিযুক্ত, তার প্রমাণ কি? ঈশ্বরের ধারণার দ্বারা, এবং কারণ যে কার্যের তুলনায় সম-সত্তাক, এই তত্ত্বের দ্বারা, আমি আমার বহিঃস্থ অন্ততঃ একটি পদার্থের অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে জানতে পারি, এবং বুঝতে পারি যে, এই বিশাল বিশ্বে আমি একাকী বিচরণ করছি, এমন নয়। কারণ, ঈশ্বরও-ত রয়েছেন।

ঈশ্বরাস্তিত্বের উপরিবর্ণিত এই প্রমাণটিকে প্রত্যক্ষানুভবজ বলা যেতে পারে। কারণ, ঈশ্বরের যে ধারণার কারণরূপে তাঁর অস্তিত্ব নির্ধারণ করা হ'ল, সেই ধারণাটি আমাদের নিজস্ব অনুভবেই বিদ্যমান। এই আনুভবিক প্রমাণ ছাড়া, দেকার্ৎ ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য, আরও দুটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। তন্মধ্যে, একটি যুক্তি কিছু ভিন্ন রকমে এন্‌সেল্‌ম্[1] নামক মধ্যযুগীয় দার্শনিকের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছে। এই যুক্তিটি ইউরোপীয় দর্শনে সাধারণতঃ সত্তাজ্ঞাপক যুক্তি নামে প্রসিদ্ধ[2]। যুক্তিটির সারমর্ম এই যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব তদ্বিষয়ক ধারণা থেকেই উপপাদন করা যায়। ঈশ্বর ছাড়া অন্যান্য পদার্থের ধারণায় ঐ সকল পদার্থের অস্তিত্ব অন্তর্ভুক্ত নয়। ঘট বললে, তার মোটামুটি গঠন, তরল পদার্থ ধারণ করার ক্ষমতা প্রভৃতি অনেক কিছুই স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে বোঝায়; কিন্তু ঘট বল্‌লে, তার অস্তিত্বের সম্ভাবনা বোঝালেও, ঠিক্ ঠিক্ অস্তিত্বের বাস্তবতা বোঝায় না। অর্থাৎ ঘটের ধারণা থেকে, ঘটের অস্তিত্ব নির্ধারণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণার বিশেষত্ব এই যে, তার অর্থের ভিতর ঈশ্বরের অস্তিত্বও নিহিত থাকে। সুতরাং ঈশ্বর বিষয়ক ধারণা থেকেই ঈশ্বরের

---

1 **Anselm.**
2 **Ontological argument.**

অস্তিত্ব তর্কশাস্ত্রীয় রীতিতে নিগমিত হ'তে পারে। ঈশ্বরের ধারণা মানে পূর্ণ বস্তুর ধারণা। অস্তিত্বহীন ঈশ্বরকে পূর্ণ বলা যায় না—সত্তার অভাবে পূর্ণতার হানি না হ'য়ে পারে না—সুতরাং ঈশ্বরের ধারণায় যদি সত্তা নিবিষ্ট না হয়, তাহলে, তা পূর্ণবস্তু বা ঈশ্বরের ধারণাই হবে না। ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণা থেকে অস্তিত্বের ধারণাকে বাদ দিলে. তাকে আর ঈশ্বরের ধারণা বলা যাবে না। অর্থাৎ তাঁর সত্তার প্রতিপাদক হেতুটি তৎ-সম্বন্ধীয় ধারণাতেই বর্তমান। কারণ, তিনি হচ্ছেন পরম-সৎ অথবা পরমকারণ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য, দেকার্ৎ অন্য একটি যুক্তিও প্রয়োগ করেছেন। যে যে অসীম ক্ষমতা আমাতে নেই, অথচ যাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা আছে, সেগুলোর ধারণা আমা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আমাকে দিয়েছেন—তিনি আমার এবং আমার সর্বশক্তির স্রষ্টা। আমি যদি নিজেই আমার স্রষ্টা হ'তাম, তা হ'লে, এইসব অসীম ক্ষমতাও আমি নিজেকে দিতাম। স্বেচ্ছায়, কেউ নিজেকে সদোষ বা অপূর্ণ করবে না। পূর্ণতা থেকে কেউ বঞ্চিত হ'তে চায় না। প্রশ্ন হ'তে পারে, আমার স্রষ্টা এক না বহু? কিন্তু স্রষ্টার বহুত্ব দ্বারা তাঁর পূর্ণতা বা ঈশ্বরত্বের নাশ অনিবার্য। ঈশ্বরের ধারণায় যে পরমপূর্ণতার ধারণা রয়েছে, তাই তাঁর বহুত্বের নিবারক। ঈশ্বর শব্দের অর্থই হ'ল পূর্ণশক্তি বা গুণরাজীর সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরম বা একমাত্র অধিকারী।

ভগবানের এইসব শ্রেষ্ঠগুণের ভেতর তাঁর সততা বা সত্যবাদিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পক্ষে, আমাদের প্রবঞ্চনা করা অসম্ভব। তিনি আমাদের ভ্রান্তির কারণ হ'তে পারেন না। যা স্পষ্ট ও বিবিক্ত ব'লে প্রতীয়মান হয় না, তা সত্য বলে গ্রহণ করব না—এই নিয়ম কড়াকড়িভাবে গ্রহণ করার পরও, যদি বিচার-বুদ্ধির নিকট মিথ্যাবস্তুই সত্য বলে প্রতিভাত হয়, তা হ'লে, এইরূপ ভ্রান্তিজনক বিচারবুদ্ধি দিয়েছেন বলে, ঈশ্বরকে প্রতারক না বলে গত্যন্তর নেই। কিন্তু ভগবান প্রতারক নন—প্রতারণা ও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা একসাথে থাকতে পারে না। সুতরাং, আমাদের ভুল ভ্রান্তির জন্য, ভগবান দায়ী নন, আমরা নিজেরাই দায়ী। আমাদের জ্ঞানশক্তি, ঈশ্বর-প্রদত্ত; আর তার ভেতর জ্ঞানের যাথার্থ্য-নির্ণায়ক উপায়টিও দেওয়া আছে। মানুষ নিজের এই ঈশ্বর-দত্ত জ্ঞান-শক্তির অপব্যবহার না করলে, কখনও ভ্রমে পতিত হবে না।

যে বস্তুর ধারণা স্পষ্ট ও বিবিক্ত, তা যে যথার্থ, তা এইভাবে

ঈশ্বরের সত্তা বা সত্যবাদিতার দ্বারা সমর্থিত হ'ল। কোন কোন সমালোচক বলেছেন যে, দেকার্তের এই যুক্তি-প্রণালী অন্যোন্যাশ্রয় দোষে[1] দুষ্ট। কারণ, এখানে প্রথমে ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণার স্পষ্টতা ও বিবিক্ততা-রূপ সত্যতা-নির্ণায়ক চিহ্নের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপণ করা হয়েছে; আবার, তারপর, ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাহায্যে এই চিহ্নের যাথার্থ্য প্রমাণ করা হয়েছে।

এই অন্যোন্যাশ্রয় দোষ যে নেই, তা দেখাবার জন্যে, দেকার্ৎ বলেন যে, প্রজ্ঞার আন্তর উপলব্ধির[2] প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। স্পষ্ট ও বিবিক্ত ধারণা এই আন্তর উপলব্ধির সাক্ষাৎ-বিষয় হওয়াতে, স্পষ্ট ও বিবিক্ত ধারণার প্রামাণ্যও স্বতঃসিদ্ধ। তাই, স্পষ্টতা বিবিক্ততারূপ প্রামাণ্য-নির্ণায়ক চিহ্নের যথার্থতা ঈশ্বরাস্তিত্বের ওপর নির্ভর করে না। প্রশ্ন হচ্ছে, যদি তাই হয়, তা হলে, দেকার্ৎ ঈশ্বরের সত্তার দ্বারা এই চিহ্নের যাথার্থ্য প্রমাণ করতে গেলেন কেন? এর উত্তরে, দেকার্তের বক্তব্য এই :—আমরা যখন একটির পর একটি, এইভাবে, অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন যুক্তির প্রয়োগে, একটি শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তখন পূর্ববর্তী যুক্তিগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে মনের সামনে ধরে রাখতে পারি না; তখন শুধু এইটুকু আমাদের মনে থাকে যে, যুক্তিধারার পূর্ব ধাপগুলি আমরা স্পষ্ট ও বিবিক্তভাবেই বুঝেছিলাম; কিন্তু ঐ সময়ে যুক্তিধারার অতীত ধাপ-গুলোর স্পষ্টতা ও বিবিক্ততা প্রজ্ঞার সাক্ষাৎ দৃষ্টির বিষয় নয়; তখন তা শুধু স্মরণের বিষয় হওয়াতে পরোক্ষ হয়ে যায়; এবং এইপ্রকার পরোক্ষ স্পষ্টতা ও বিবিক্ততাও যে সত্যত্বের খাঁটি নির্ণায়ক, এইটুকু ঈশ্বরাস্তিত্ব ও তাঁর সত্তার ওপর নির্ভর করে।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের বিখ্যাত ঐতিহাসিক এর্ড্‌মান্[3] অন্যভাবে এই অন্যোন্যাশ্রয় দোষ পরিহারের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন যে, জ্ঞানের হেতু[4] এবং অস্তিত্বের হেতু[5] এক নয়। স্পষ্টতা ও বিবিক্ততা-রূপ সত্যতা-নির্ণয়ের চিহ্নটি ঈশ্বরের অস্তিত্বের হেতু নয়। তা হচ্ছে ঈশ্বরাস্তিত্বের যথার্থ জ্ঞানের হেতু। অন্যদিকে, ঈশ্বর হচ্ছেন

---

1 Circularity.
2 Intuition.
3 Erdmann.
4 *Ratio cognoscendi.*
5 *Ratio essendi.*

সর্বপদার্থের অস্তিত্বের হেতু, অতএব তিনি সত্যতা-নির্ণায়ক চিহ্নের এবং তার প্রামাণ্যের অস্তিত্বেরও হেতু। অস্তিত্বের দিক থেকে দেখলে, ঈশ্বর আগে, তারপর আমাদের বুদ্ধি ও সত্যতা-নির্ণায়ক চিহ্ন। ঈশ্বরই এদের স্রষ্টা। কিন্তু আমাদের ঈশ্বরাস্তিত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের দিক থেকে দেখতে গেলে, সত্যতা-নির্ণায়ক চিহ্নটি আগে, তারপর, ঈশ্বরাস্তিত্বের সুনিশ্চিত জ্ঞান। সোজা কথায়, ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণার স্পষ্টতা ও বিবিক্ততা দিয়ে তাঁর অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ও অপ্রবঞ্চক ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানি, কিন্তু কোন ধারণার স্পষ্টতা ও বিবিক্ততা যে উক্ত ধারণার সত্যতার নির্ণায়ক, তা ঐ সর্বশক্তিমান ও অপ্রবঞ্চক ঈশ্বর থেকেই নিঃসৃত হয়েছে ; অর্থাৎ ঈশ্বর ছাড়া তা হ'তে পারত না।

4. দেকার্তের দ্রব্যবিষয়ক মত

যে-সব ধারণার সাহায্যে, আমরা বিবিধ পদার্থবিষয়ক-জ্ঞান আহরণ করি, তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—দ্রব্যের ধারণা ও গুণের ধারণা। দেকার্তের মতে, যা স্ব-সত্তার জন্য অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে না, তা দ্রব্য। দ্রব্যের এই স্বাধীন সত্তাঘটিত লক্ষণ পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল।[1] এই লক্ষণ অনুসারে, ঈশ্বরই অপরাধীন সত্তান্বিত একমাত্র যথার্থ দ্রব্য বলে স্বীকার করতে হবে—স্পিনোজার এই বিখ্যাত মতটি আসলে দেকার্তের কাছ থেকেই নেওয়া। স্বাধীন সত্তা-সম্পন্ন পদার্থই যদি দ্রব্য শব্দের বাচ্যার্থ হয়, তা হ'লে, দ্রব্যের আদি ও অন্ত থাকা অসম্ভব ; এবং এই অর্থে, কোন সৃষ্ট পদার্থকে দ্রব্য বলা চলে না। সৃষ্ট দ্রব্যের বেলা, দ্রব্যের নির্বচন এইভাবে করতে হবে—যা একমাত্র ঈশ্বরের সাহায্যেই সত্তাবান, অর্থাৎ স্ব-সত্তার জন্য ঈশ্বরাতিরিক্ত অন্য পদার্থের ওপর অবলম্বন করে না, তা দ্রব্য। সৃষ্ট দ্রব্য দুই রকমের : আত্মা ও জড়।[2] প্রত্যেক দ্রব্যেরই কতিপয় ধর্ম রয়েছে। এই ধর্মগুলোর ভেতর, একটিকে তাদের ধর্মী দ্রব্যের স্বরূপ বা স্বধর্ম বলা চলে। এই স্বরূপীয় ধর্মের ধারণার জন্য, অন্য ধর্ম-

---

1 দেকার্তের পরবর্তীকালে হিউম্ ও কাণ্টের দিনে, দ্রব্যের অপর একটি লক্ষণে স্বাধীন সত্তার সাথে কারণতাও সমাবিষ্ট হয়। লক্ষণটি এই:—যা স্বকীয় সত্তার জোরে কোন কার্যের উৎপাদক বা কারণ, তা দ্রব্য (substance)।

2 Spirit and Matter.

গুলোর প্রয়োজন হয়না, কিন্তু অন্য ধর্মগুলোর ধারণা স্বরূপীয় ধারণা ছাড়া হ'তে পারে না। এই অর্থে, স্বরূপীয় ধর্মটিকে প্রধান ধর্ম বলা হয়। দেকার্ৎ সৃষ্ট দ্রব্যের এই প্রধান ও মৌলিক ধর্মটিকে 'গুণ'[1] আখ্যা দিয়েছেন। তদধীন অন্যান্য ধর্মগুলো এই গুণেরই আগমাপায়ী প্রকার।[2] উদাহরণস্বরূপ, অবস্থান, আকৃতি, গতি—এইগুলো জড় বস্তুর অনিত্য ধর্ম। এদের ধারণায় দৈশিক বিস্তার আগে থেকেই গৃহীত থাকে; তাই, এরা 'বিস্তার[3]-রূপ গুণেরই বিভিন্ন প্রকার। আবার বিভিন্ন হার্দিকভাব,[4] ইচ্ছা, প্রযত্ন, ধারণা, অবধারণ বা বিধান[5]—এইগুলো শুধু চেতন দ্রব্যেই সম্ভবপর; তাই, এইগুলোকে চিত্বের বা চৈতন্যের প্রকার বলতে হবে। জড়পিণ্ডের স্বরূপধর্ম হচ্ছে বিস্তার; এবং চিত্ব, চেতনা বা চিন্তা[6] হচ্ছে মনের বা আত্মার স্বরূপধর্ম। বিস্তার ছাড়া জড়পিণ্ড থাকতে পারে না। অসৎএর কোনও ধর্ম নেই—এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়মটির সাহায্যে আমরা কোন ধর্মের অস্তিত্ব দেখে, ঐ ধর্মযুক্ত দ্রব্যের অস্তিত্ব অনুমান করতে পারি। যদি এমন দুটি দ্রব্য থাকে যে, তাদের একটিকে অপরটির সাহায্য ছাড়াই স্পষ্ট ও বিবিক্তভাবে জানা যায়, তা হ'লে, তারা নিশ্চয়ই পরস্পর থেকে ভিন্ন। কোন জড় ধর্মের সাহায্য না নিয়ে, মনের পূর্ণ ধারণা হ'তে পারে; তেমনি কোন মনোধর্মের আশ্রয় বিনাই জড়ের সম্পূর্ণ ধারণা সম্ভবপর—প্রথমটিতে বিস্তারের এবং দ্বিতীয়টিতে চিত্বের লেশ মাত্র নেই। সুতরাং, চেতন দ্রব্য ও বিস্তারযুক্ত দ্রব্য, এই দুইটি পরস্পর থেকে অত্যন্ত ভিন্ন; এবং এদের ভেতর, কোন সাধারণ বা সামান্য ধর্ম নেই। জড় দ্রব্য ও চেতন দ্রব্যের ভেদ হচ্ছে বস্তুগত অর্থাৎ বাস্তব; কিন্তু একদিকে জড় ও বিস্তারের ভেদ এবং অপর-দিকে চেতন দ্রব্য ও চৈতন্যের ভেদ, এই দুটি ভেদ বোধ-সাপেক্ষ, বস্তুগত নয়।

এইভাবে আমরা তিনটি পরস্পর থেকে ভিন্ন দ্রব্যের স্পষ্ট ও বিবিক্ত ধারণা অর্থাৎ তিনটি নিত্য সত্যের সন্ধান পেলাম। এরা হচ্ছে—

---

1 Attribute.
2 Mode.
3 Extension.
4 Feeling.
5 Proposition or judgment.
6 Thought.

(১) অনাদ্যন্ত ঈশ্বররূপ অপরিচ্ছিন্ন[1] দ্রব্য, (২) মনরূপ চৈতন্যাত্মক পরিচ্ছিন্ন[2] দ্রব্য এবং (৩) জড়বস্তুরূপ বিস্তারাত্মক পরিচ্ছিন্ন দ্রব্য।

জড় ও মন, এই দুই প্রকার দ্রব্য পরস্পর থেকে এত ভিন্ন যে, এদের কোন সমান ধর্ম নেই, এই সিদ্ধান্ত দ্বারা দেকার্ৎ পাশ্চাত্ত্য চিন্তায় দ্বৈত-সত্তাবাদের[3] প্রতিষ্ঠা করলেন। আজও ইউরোপীয় দার্শনিকরা দেকার্ৎকে আদর্শ দ্বৈতবাদী বলে সম্মান অথবা সমালোচনা করেন। দেকার্তের পরবর্তী দার্শনিকরা বলেছেন যে, জড় ও চেতনের এই অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য যে-দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়, দার্শনিক চিন্তার বিকাশে, তার স্থান বেশ উঁচুতে; এর তুলনায় জড়বাদীয় দৃষ্টি অনেক নীচে; কারণ, জড়বাদের[4] দৃষ্টিতে, চৈতন্য হচ্ছে জড়েরই একরকম বিকার; দেকার্তীয় দৃষ্টিভূমি এর ওপরে। এখান থেকে, চেতন মন ও অচেতন জড়-দ্রব্য, চিন্তা ও বিস্তার, এবং চৈতন্য ও গতির যে স্বরূপগত বৈলক্ষণ্য আছে, তা অবশ্য-স্বীকার্য। তবু পরমসত্যের অন্বেষণ এই দ্বৈতবাদীয় ভূমিতেই সমাপ্ত করা ঠিক হবে না। এমন কোন দৃষ্টিভূমি আছে, যেখানে জড় ও চেতনের এই দ্বৈতবাদীয় পার্থক্য বজায় রেখেও, তাদের ভেতর একটি গভীর ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়; আর তখন দেকার্তীয় দ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ সমীচীন বলে মনে হয়না। স্পিনোজা ও শেলিং-এর তাদাত্ম্যবাদ[5] আর লাইবনিজ ও ফিকটের জ্ঞানবাদে[6] জড় ও চেতনের উক্ত আত্যন্তিক ভেদ স্বীকৃত হয়নি; বরং তাদের মৌলিক ঐক্যই স্বীকার করা হয়েছে। অবশ্য জড় ও চেতনের এই স্পষ্ট সাধাসিধে পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেকার্ৎ দার্শনিকচিন্তায় আত্মা ও অনাত্মার সাংকর্যও বা অধ্যাস দূর করার ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। তাই দেকার্তের অব্যবহিত পরবর্তীকালে ইউরোপীয় দর্শনের বিকাশ অদ্বৈতপ্রবণ হ'লেও, তা দ্বৈতবাদকে উপেক্ষা করতে পারে নি।

দেকার্তীয় দর্শনের যেক'টি মূল তত্ত্বের বর্ণনা ওপরে দেওয়া হল, দেকার্ৎ নিজে সেগুলোকে তাঁর ব্রহ্মাণ্ডশাস্ত্রের[7] শুধু প্রারম্ভ বলে ভেবে-

1 Infinite.
2 Finite.
3 Dualism.
4 Materialism.
5 Identity.
6 Idealism.
7 Cosmology.

ছিলেন। কিন্তু দর্শনের ঐতিহাসিকরা এইগুলোকেই দর্শনের ইতিহাসে দেকার্তের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলে গণনা করেন। দার্শনিক বিচারের আরম্ভে সংশয় পদ্ধতির ব্যবহার, চিন্তাকারী "অহম্"-এর নিশ্চয়াত্মক স্বপ্রকাশ জ্ঞান, প্রমাজ্ঞানের নির্ণায়ক চিহ্ন, ঘটপটাদি পদার্থের ধারণার উৎপত্তি-প্রণালী, দ্রব্যের লক্ষণ, চেতন ও জড়ের অত্যন্ত-বৈলক্ষণ্য, এবং জড়জগতে যান্ত্রিক নিয়মের একাধিপত্য—দেকার্তের এইসকল মতই তাঁকে দর্শনের ইতিহাসে অমর করে রেখেছে।

বাহ্যবস্তুর ধারণার উৎপত্তি-প্রণালী এবং জড় জগতের যান্ত্রিক নিয়ম, এই দুটি বিষয়ের বিবরণ সামনের পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে।

5. জড় জগৎ বা 'প্রকৃতি'[1]

সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, ঘটাদি বাহ্য বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের ওপর ক্রিয়া করার পর, আমাদের মনে ঘটাদিবিষয়ক জ্ঞান বা ধারণা উৎপন্ন হয়। কিন্তু এইসব বাহ্যবস্তু যে বাস্তবিকই আছে, তার নিশ্চিত প্রমাণ কী? অবশ্য, আমি নিজে আমার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বা ধারণার জনক নই। কারণ, এইরূপ ধারণা আর তার বিষয় কিরকম হ'বে, তা আমি আমার খেয়ালমত নির্ধারণ করতে পারিনা। কল্পনা করা যেতে পারে যে, ঈশ্বরই সাক্ষাৎ-ভাবে আমাদের মনে এইসব প্রত্যক্ষাত্মক ধারণা জন্মান এবং আসলে এমন কোন বাহ্য বস্তু নেই, যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিনরকম দৈশিক বিস্তার এবং গতি ও স্থিতি আছে। কিন্তু এই কল্পনা সত্য হ'লে, ঈশ্বরকে প্রতারক বলতে হবে। কিন্তু আমরা জানি যে, ঈশ্বর প্রতারক নন। ঈশ্বরের সততা ও সত্যবাদিতার ওপর নির্ভর করলে, এটাই মানা সঙ্গত হ'বে যে, বাহ্য বা জড়বস্তু সম্বন্ধে আমাদের বিচার-বুদ্ধি যা বলে, সে সবই সত্য। অবশ্য, ইন্দ্রিয়প্রদত্ত সবকিছু গ্রহণীয় নয়। কারণ, ইন্দ্রিয়গুলো বহুসময়েই আমাদের ভুল খবর দেয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা স্পষ্ট ও বিবিক্তভাবে এইটুকু যথার্থ খবর নিশ্চয়ই পাই যে, জড়বস্তু বলে এমনকিছু রয়েছে, যা আমাদের মন ও ঈশ্বর থেকে পৃথক, যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিন প্রকার দৈশিক পরিমাণ আছে, যার নানারকম আকৃতি-যুক্ত ও নানাভাবে গতিমান বহু অংশ আছে, এবং যা আমাদের মনে বিভিন্নরকম ইন্দ্রিয়-সংবেদন[2] জন্মায়। কিন্তু যদিও আমরা সাধারণতঃ

---

1 Nature.
2 Sensation.

ধরে নিই যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপই জানা যায়, তবু একটু বিচার করলেই এই ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হবে। কারণ, মানুষের ভেতর জড়শরীর ও চেতন আত্মা, এই দুইএর নিবিড় মিশ্রণ রয়েছে; ফলে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন বাহ্যবস্তু আত্মার হিতকর অথবা অহিতকর কিনা, এই খবরটুকু পাওয়া গেলেও, ঐ বাহ্যবস্তুর স্বরূপ আত্মার কাছে অজ্ঞাতই থেকে যায়। অবশ্য, শরীর হচ্ছে এমন এক জড়বস্তু, যা কোন মনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত—এই শরীরই আমাদের মনে সুখ দুঃখাদি উৎপন্ন করে, আর শরীরের সম্বন্ধ ছাড়া, শুধু চিন্তাকারী মন সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা হ'তে পারেনা। আবার, ইন্দ্রিয়লব্ধ রূপ-রসাদি গুণ বাদ দিলেও, জড়বস্তু যে অসৎ হয়ে যায়, এমন নয়। রূপরসাদি-গুণ আসলে জ্ঞাতার মানসিক অবস্থা-মাত্র; যে-সব গতি বা ক্রিয়ার দ্বারা এগুলো উৎপন্ন হয়, তাদের সাথে এই রূপরসাদির কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই। অবশ্য, ইন্দ্রিয়জনিত গুণ এবং তৎ-কারণ বাহ্য ক্রিয়া—এই দুয়ের ভেতর একপ্রকার সারূপ্য অথবা অনুগামিতা[1] রয়েছে। কারণ, এক জড়বস্তুর জায়গায়, অন্য জড়বস্তু রাখলে, অথবা জ্ঞেয় বস্তুটিতে পরিবর্তন ঘটলে, ইন্দ্রিয়-সংবেদনেরও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। একটু বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, জড়বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে বিস্তৃতি। বিস্তৃতিকে বাদ দিলে, জড়বস্তুই নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং, যুক্তিবিচারে বোঝা যায় যে, জড়ের স্বরূপ হচ্ছে বিস্তার। এই বিস্তারই জ্যামিতির বিষয়বস্তু। এটা এমন একরকম পরিমাণ, যা ভাগ করা চলে, যার নানারকম আকৃতি হ'তে পারে, এবং যা স্থানান্তরিত করা সম্ভবপর।

জড়বস্তু মানে বিস্তারান্বিত দেশ—দেকার্ৎ তাঁর এই মতের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি তুলে, সেগুলো খণ্ডন করেছেন। প্রথম আপত্তিটি এই যে, জড়বস্তু মানেই যদি বিস্তৃতি হ'ত, তা হ'লে তাকে ঘন কিংবা বিরল[2], কঠিন কিংবা তরল করা চলতো না। অথচ বস্তুর ঘনীকরণ ও বিরলীকরণ অথবা তরলীকরণ প্রভৃতি আমাদের পরিচিত ব্যাপার। দেকার্ৎ এই আপত্তির উত্তরে বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে, বিস্তারের হ্রাস ও বৃদ্ধি নেই; পদার্থের বিরলীকরণ মানে তার অংশগুলোর ভেতরে যে সব ফাঁক রয়েছে, তাদের বৃদ্ধি, আর সেসব বর্ধিত ফাঁকে অন্যবস্তুর প্রবেশ, এ ছাড়া আর কিছু

---

1 Agreement or correspondence.
2 Thick or thin.

নয়। উদাহরণ স্বরূপ, স্পঞ্জের ছিদ্রগুলি জলে ভরে গেলে, তা পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, আমরা "কেবল বিস্তৃতি বা প্রসারকে" জড়বস্তু বলে ভাবি না, বরং একে আমরা "দেশ" বলে মনে করি। এর উত্তরে, দেকার্তের বক্তব্য এই। জড়দ্রব্য ও প্রসারের এই ভেদ বাস্তবিক নয়, কিন্তু আমাদের কল্পনা মাত্র। দ্রব্য ও দ্রব্যের স্বরূপধর্ম, এই দুটির ভেতর আসলে কোন পার্থক্য নেই। সোজা কথায়, গণিতশাস্ত্রের বিষয়-বস্তু আর পদার্থ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, একই। অবশ্য, সাধারণ দৃষ্টিতে, এরা পৃথক বলে প্রতিভাত হয়; আর তখন আমরা প্রসার বা বিস্তার এই অর্থে দেশ শব্দটি ব্যবহার করি এবং বিশিষ্ট কোন এক সীমাবদ্ধ দেশখণ্ডকে জড়পিণ্ড নামে অভিহিত করি। প্রকৃতপক্ষে, এমন দেশ কোথাও নেই, যেখানে কোন দ্রব্য নেই। কারণ, অসৎ-এর বিস্তার থাকতে পারে না। অর্থাৎ একেবারে শূন্য দেশ বলে কিছু নেই। আমরা যখন বলি যে, এই পাত্রটি শূন্য, তখন পাত্রে যে কিছুই থাকে না, এমন নয়; কিন্তু তার ভেতরকার দ্রব্যগুলো সূক্ষ্ম বলে, তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। পাত্রটি যদি একেবারেই খালি হতো, তা হ'লে তার বিরুদ্ধ পিঠগুলো পরস্পরের সাথে সংলগ্ন হয়ে যেত।

এইভাবে বোঝা গেল যে, অচেতন বা জড় পদার্থটি হচ্ছে একরকমের দ্রব্য। আর এই দ্রব্যের স্বরূপগত ধর্ম হচ্ছে বিস্তৃতি বা বিস্তার। এই বিস্তারের কোথাও সম্পূর্ণ ফাঁকা জায়গা নেই, এবং তা ভেতরের দিক দিয়ে ও বাইরের দিক দিয়ে, অসংখ্য ভাগে বিভাগ করার যোগ্য; আর এই ভাগগুলো বিভিন্ন বেগে সর্বদা গতিযুক্ত। মনে হয় যে, দেকার্তের মতে, স্থিতি মানে অন্যের তুলনায় অল্প বেগান্বিত গতি। এই বিরাট অচেতন পদার্থের কতকগুলো ধর্ম বাদ দিয়ে, সর্বাধার দেশের কল্পনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ, বিস্তার যার গুণ বা স্বরূপধর্ম, এরকম অচেতন বা জড় দ্রব্যের কোন আধার বা আশ্রয় থাকতে পারে না; কারণ, ফাঁকা দেশ বলে কিছু নেই; তাই ফাঁকা দেশ তার আধার নয়; বরং এই নিরাধার অচেতন দ্রব্যই তার অসংখ্য অংশের আধার।

জড় দ্রব্যের স্বরূপ নির্ধারণ করার প্রসঙ্গে, দেকার্ৎ পরমাণুবাদ ও জড় জগতের সান্ততা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর মতে, দেশের অর্থাৎ জড়দ্রব্যের এমন কোন অংশ নেই, যাকে অবিভাজ্য বলা যেতে পারে; আর এর অসংখ্য অংশের কোনটিকেই ক্ষুদ্রতম বলা যায় না। তা ছাড়া, এই অংশগুলোর কোনটাকেই দেশের সীমা অথবা অন্ত্য অবধি বলা

সংগত নয়। সুতরাং, জড়দ্রব্যের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশ অর্থাৎ পরমাণু বলে কিছু থাকতে পারে না।

দেকাৎ বলেছেন যে, দেশ ও জড়দ্রব্যের একীকরণের দ্বারা, প্রথমটি পূর্ণাঙ্গ এবং দ্বিতীয়টি ভেতরে বাইয়ে দুদিকেই সীমাহীন হ'তে পারল, অর্থাৎ তার বিভাজ্যতা ও বিস্তৃতির কোন অন্ত থাকল না।

জড়বস্তুর সংখ্যা বহু নয়, কিন্তু এক। তার স্বরূপও বহু-রসাত্মক নয়, কিন্তু একরসাত্মক ; আর এই অচেতন বিশ্ব অসীম ও মূলতঃ এক।

জড় হচ্ছে এমন একরকম পরিমাণ, যাকে অনবরত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায়, যাকে নানাপ্রকার আকৃতি দেওয়া চলে এবং যাতে নানাবেগান্বিত গতি উৎপন্ন হতে পারে। অফুরন্ত বিভাজ্যতা, বিভিন্ন আকৃতি ধারণের যোগ্যতা এবং নানাবেগান্বিত গতির ক্ষমতা, জড়ের এই ক'টি ধর্ম মানলেই, জড়বিজ্ঞানের কাজের পক্ষে যথেষ্ট। প্রকৃতির সর্ব প্রকার ঘটনা এই তিনটি জড়ীয় ধর্মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর। জড়-বিজ্ঞানের জন্য, অন্য কোন জড়ধর্ম মেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। জড় বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, এই তিনটি ধর্মের ভেতর, "গতি" হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এর ওপরই বস্তুর আকৃতি ও আকারগত বৈচিত্র্য নির্ভর করে। জড়পিণ্ডের স্বরূপ হচ্ছে তার বিস্তার ; এবং নতুন কিছু হওয়া বা ঘটার মানে হচ্ছে তার গতির বেগ ও দিকের পরিবর্তন। দেকার্ৎ গতি সম্বন্ধেও কিছু নতুন কথা বলেছিলেন। তার মতে, সমগ্র জড় দ্রব্য নিয়ত গতিমান। তবু কোন জড়-পিণ্ডবিশেষের গতি বলতে, এই সামগ্রিক গতি বুঝলে চলবে না। জড়পিণ্ডের গতি বলতে আমরা বুঝবো যে, ঐ পিণ্ডের সাথে যেসব অন্যান্য পিণ্ড সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত রয়েছে, তাদের থেকে কিছুদূরে, অথবা তথাকথিত সবপিণ্ডগুলোর কাছ থেকে কিছুদূরে, পিণ্ডান্তরের নৈকট্য-প্রাপ্তি। পিণ্ড সকলের এইরূপ পরস্পর থেকে বিভাগ বা স্থানান্তরপ্রাপ্তি হচ্ছে পরস্পরসাপেক্ষ। সুতরাং, পিণ্ড-গুলোর ভেতর কোন্‌টিকে গতিমান এবং কোন্‌টিকে স্থির বলা হ'বে, তা আমাদের নির্বাচনের ওপর নির্ভর করে। সাক্ষাৎ-সংযুক্ত পিণ্ডান্তরের অপেক্ষায়, কোন পিণ্ড-বিশেষের নিজস্ব একটি গতি থাকতে পারে ; তাছাড়া, ঐ পিণ্ডের পক্ষে, অন্য একাধিক গতির ভাগী হওয়াও সম্ভবপর। উদাহরণ স্বরূপ, চলন্ত জাহাজে যখন কোন যাত্রী পাটাতনের ওপর এদিক সেদিক হেঁটে বেড়ায়, তখন ঐ যাত্রীতে তার নিজস্ব গতি ছাড়া, জাহাজের, জলের স্রোতের, এবং পৃথিবীর গতিগুলোও বর্তায়। সাধারণতঃ, লোকের

ধারণা এই যে, গতি হচ্ছে একপ্রকার প্রযত্নমূলক ক্রিয়া। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে, এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ, এই ধারণা-অনুসারে প্রযত্ন যে শুধু স্থির বস্তুতে গতি উৎপন্ন করার জন্যই আবশ্যক, তা নয়; অধিকন্তু, গতি-যুক্ত বস্তুকে স্থির করার জন্যও তা আবশ্যক। তার মানে এই যে, স্থিতিতে যেমন প্রযত্নের সম্বন্ধ নেই, গতিতেও তেমনি প্রযত্নের সম্বন্ধ নেই। আসলে, গতি ও স্থিতি উভয়েই জড়বস্তুর স্বকীয় অবস্থামাত্র—তা কারো প্রযত্নজনিত নয়। যেহেতু শূন্যদেশ বলে কিছু নেই, অতএব বুঝতে হবে যে, কোন গতিই শুধু একটি জড়পিণ্ডের ধর্ম হ'তে পারে না—গতিমাত্রই কতকগুলো জড়পিণ্ডের একটি সমগ্র পরিধিতে পরিব্যাপ্ত থাকে: গতিশীল-ক খ-কে স্থানচ্যুত করে, খ গ-কে, গ ঘ-কে, এইভাবে শেষটায় হ ক-এর পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করে।

দেকার্ৎ অবশ্য এমন কথা বলছেন না যে, গতির কোন কারণ নেই। তাঁর মতে, গতির অন্ত্য কারণ হচ্ছেন ঈশ্বর। তিনি জড়-দ্রব্য সৃষ্টি করার সময়, তার গতি ও স্থিতির একটি মূল পরিমাণও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন; আর তাঁর নিত্য-অবিকৃত স্বভাব-অনুসারে, তিনি সর্বদাই এই নির্দিষ্ট পরিমাণটি অপরিবর্তিত অবস্থায় রক্ষণ করেন। এইজন্যে, সমগ্র বিশ্বে গতি ও স্থিতির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। অবশ্য, পৃথক পৃথক পিণ্ডব্যক্তিগুলিতে গতি ও স্থিতির পরিমাণ বদলায়। কিন্তু এই পরিবর্তনের ক্ষমতা কোন বিশিষ্ট বিস্তার বা পিণ্ডব্যক্তির স্বকীয় ধর্ম নয়। তা হচ্ছে সমগ্র বিস্তার বা জড়ের ধর্ম।

গতির আদি কারণ হচ্ছেন ঈশ্বর, আর গতির মূল নিয়মগুলো[1] তাঁর থেকেই নিঃসৃত হয়। তবু এইগুলোকে বিশেষ বিশেষ গতির দ্বৈতীয়িক কারণ বলা যায়। গতি-নিয়মগুলোর প্রথমটি জাড্য বা নিশ্চেষ্টতার নিয়ম[2] বলে প্রসিদ্ধ। নিয়মটি এই। কোন জড়পিণ্ড গতি বা স্থিতি, যে অবস্থাতেই থাকুক, তা নিজে সর্বদা সেই অবস্থাতেই থাকে। ঐ অবস্থার যদি কখনও পরিবর্তন হয়, তা হ'লে বুঝতে হবে যে, তা অবশ্য এক বা একাধিক পিণ্ডের ধাক্কা অথবা প্রতিবন্ধকতা-বশতঃ ঘটেছে। গতি-শাস্ত্রের[3] অপর একটি নিয়ম দেকার্ৎ এইভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেক জড়পিণ্ডের এমন একটি প্রবণতা আছে যে, যদি তা একবার কোন

1 Laws of motion.
2 Law of inertia.
3 Dynamics.

একদিকে গতিযুক্ত হয়, তাহলে তা অনবরত সেইদিকেই চলতে থাকবে। অর্থাৎ গতির স্বাভাবিক রাস্তা হচ্ছে সরলরেখা। গতির দিক বদলালে, বুঝতে হবে যে, তা অন্য কিছুর প্রভাবেই ঘটেছে।

এই নিয়ম দুটি ঈশ্বরের স্বভাব থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। কারণ. ঈশ্বরের স্বরূপ সর্বদা একই থাকে, তাঁর স্বরূপ-ধর্মগুলোতে কখনও কোন পরিবর্তন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরের জগৎ-পালনরূপ ক্রিয়াটি অতি অনায়াসে ও সহজভাবে নিরন্তর সংসাধিত হয়; তিনি প্রতি মুহূর্তে পুনঃ-সৃষ্টির দ্বারা জগৎকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেন। ঈশ্বরের কূটস্থতা এবং তাঁর জগৎ-পালনরূপ ক্রিয়ার এই সহজতা হচ্ছে উক্ত দুই গতি-নিয়মের মূল হেতু।

দেকার্ৎ জড়পিণ্ডের গতিবিষয়ে আরও দু-তিনটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এগুলোর বিশেষ দাশনিক মূল্য নেই; তাই এখানে তাদের বিবরণ দেওয়া হ'ল না।

এর পরে, আমরা দেকার্ৎ-সম্মত পদার্থ বিজ্ঞানের[1] দু-একটি মোদ্দাকথা পাঠকের সামনে রাখছি। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বর্ণনা দিতে গিয়ে, দেকার্ৎ প্রথমেই একটি মূলসূত্রের অবতারণা করেছেন। সূত্রটি এই। যেমন একদিকে, ঈশ্বরের শক্তি ও কল্যাণময়ত্বের কোন ইয়ত্তা নেই, তেমনি অপরদিকে, মানুষের শক্তি ও কল্যাণময়ত্বও একেবারে নগণ্য নয়। জগৎ-সৃষ্টি করায়, ভগবানের উদ্দেশ্য কি, তা খুঁজতে যাওয়া ধৃষ্টতা। তেমনি, তাঁর এই উদ্দেশ্যসাধনে আমরাও তাঁকে সাহায্য করতে পারি, এইরূপ ভাবা, অথবা বিশ্বের সব বস্তুই আমাদের উপভোগের জন্য সৃষ্ট হয়েছে, এইরূপ মনে করা, এগুলোও ধৃষ্টতামাত্র—বিশ্বে এমন বহু পদার্থ রয়েছে, যা কখনও মানুষের দৃষ্টিপথে আসেনা, এবং যা কারো কাজেও লাগে না। সুতরাং প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে, তার উদ্দেশ্য নির্দেশ করা একেবারে নিরর্থক। বস্তুর ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা দিতে হ'লে, তৎস্থ স্পষ্টভাবে-জ্ঞাত গুণ বা ধর্মের সাহায্যেই দিতে হবে। অর্থাৎ জড়বস্তুর গতি প্রভৃতি ধর্মের ব্যাখ্যা যান্ত্রিক[2] হবে। কোন যান্ত্রিক ক্রিয়া কিভাবে ঘটে, তা বুঝতে হ'লে, ঐ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলো পরস্পরের সাথে কিভাবে বিন্যস্ত হয়েছে এবং তাদের গতিনিয়মগুলো

1 Physics.
2 Mechanical explanation.

কী, শুধু এইটুকু জানলেই যথেষ্ট—ঐ যান্ত্রিক ক্রিয়ার দ্বারা যন্ত্রের বা যন্ত্রীর কোন উদ্দেশ্য সাধিত হ'ল কিনা, তা জানা অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা যান্ত্রিক, উদ্দেশ্য-সাধকতা[1] নয়।

দেকার্ৎ গতির যে ব্যাখ্যা ও লক্ষণ দিয়েছেন, তদনুসারে তিনি বলেন যে, পৃথিবী তৎসংলগ্ন পারিপার্শ্বিক পদার্থগুলোর তুলনায় অচল বলে মানতে হবে, আর সমগ্র ব্যোমমণ্ডল একপ্রকার তরল দ্রব্যে ভরা; এই তরল পদার্থ অনবরত ঘূর্ণিজলের ন্যায় আবর্তিত হচ্ছে, আর সূর্যের চারিদিকে এর যে অংশগুলো ঘুরছে, সেগুলো তৎ-সংবদ্ধ পৃথিব্যাদি গ্রহসমূহকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যায়; তাতে, গ্রহগণ সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হ'লেও নিজ নিজ পারিপার্শ্বিক পদার্থগুলোর তুলনায় স্থির থাকে বলে মানতে হবে।

ব্যোমমণ্ডলস্থ তরল দ্রব্য ও তার ঘূর্ণিবিষয়ক দেকার্ৎকৃত কল্পনা কতদূর সত্য, তা বলা কঠিন। তবু পৃথিবী কোন এক অর্থে স্থির থাকে, দেকার্তের এই মত তৎ-কালীন খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদের মতের সাথে মিলে যাওয়ায়, দেকার্তের ভাল লেগেছিল। তিনি সহজে ধর্মযাজকদের অসন্তুষ্ট করতে চাইতেন না। কারণ, তৎকালীন ধর্মযাজকদের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। তথাপি কোন কোন বিষয়ে তাঁর মত ঠিক ধর্মযাজকের মতন ছিল না। উদাহারণ স্বরূপ, এসব ধর্মযাজকের মতে, ঈশ্বর তাঁর অপ্রতিহত সত্য সঙ্কল্পের জোরে সমগ্র বিশ্ব ও তার ভেতর যা কিছু আছে, এসবই এক মুহূর্তে একদম সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে দেকার্তের মত একটু ভিন্ন রকমের ছিল। মতটি এই। জগৎ ও তন্মধ্যস্থ বিভিন্ন বস্তু এক মূল বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে গতির নিয়ম অনুসারে ক্রমশঃ সুশৃঙ্খল হ'য়ে কোটি কোটি বছরে, বর্তমান অবস্থায় এসেছে। তাঁর এই মত যাজক-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত হবেনা ভেবেই, বোধহয়, এই প্রসঙ্গে দেকার্ৎ মন্তব্য করেছেন যে, তাঁর এই মত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বুঝবার জন্যে শুধু একটি প্রকল্প[2] ছাড়া আর কিছু নয়।

আমরা এখন দেকার্ৎ-সম্মত নৃ-বিজ্ঞানের[3] একটি সংক্ষিপ্ত দিগ্‌দর্শন দিচ্ছি। তৎকৃত নৃ-বিজ্ঞানে তিনটি প্রধান বিষয়ের আলোচনা আছে:—(১) শরীর, (২) আত্মা ও (৩) এই দুইএর মিলন।

1 Teleological.
2 Hypothesis.
3 Anthropology.

৬. মানুষ

মানুষের শরীর অন্যান্য অঙ্গীদের[1] মতনই এক প্রকার যন্ত্র। ঘড়ির মতন স্বয়ঞ্চল যন্ত্র,[2] আর স্বাভাবিক জীব-শরীর, এই দুইএর পার্থক্য জাতিগত নয়, অর্থাৎ তা একেবারে ভিন্ন জাতীয় পদার্থের পার্থক্যের মতন নয়; কিন্তু এটি হচ্ছে কমবেশী মাত্রার পার্থক্য; অর্থাৎ স্বয়ঞ্চল যন্ত্র ও জীবশরীর একই শ্রেণীর জিনিষ: শুধু একটির অঙ্গ-বিন্যাস অপরটির থেকে বেশী মাত্রায় জটিল এবং অধিকতর ঐক্য-সম্পাদক। মানব-নির্মিত যন্ত্র যে-সব কলকব্জার সাহায্যে চলে, সে সবই প্রত্যক্ষ-যোগ্য স্থূলদ্রব্য; কিন্তু স্বাভাবিক জীব-শরীরের ক্রিয়া যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে চলে, সেগুলোর অধিকাংশই এত সূক্ষ্ম যে, তারা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নয়। ঘড়ি-নির্মাতা কতকগুলো চাকা ও ওজন দিয়ে, এমনভাবে ঘড়ি তৈরি করে যে, তা আপনা-আপনি চলতে পারে। তেমনি ঈশ্বর-ও মানুষের দেহযন্ত্রটি শুধু মাটি দিয়েই তৈরি করেছেন বটে; কিন্তু তিনি এমনই অদ্ভুতকর্মা শিল্পী যে, তাঁর রচিত মানব দেহের-গঠন-নৈপুণ্যের তুলনা হয়না। যখন দেহযন্ত্রের কোন গুরুত্বপূর্ণ অবয়ব নষ্ট হয়, তখন তা নিশ্চল হয়ে পড়ে; অর্থাৎ বিকল ঘড়ির মতন বন্ধ হয়ে যায়। এটাই দৈহিক মৃত্যু। শব আর ভাঙ্গা ঘড়ি একই রকমের জিনিষ। মৃত্যুর ফলে, দেহ থেকে আত্মা নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। আত্মা শরীরে প্রাণ সঞ্চার করে বলে যে সাধারণ লোকের ধারণা, তা ভুল। এটা অবশ্য ঠিক যে, দেহে যখন আত্মা ঢোকে, তখন তাতে প্রাণ থাকা দরকার; আবার দেহ প্রাণহীন হওয়ার আগে, দেহ ও আত্মার মিলন কখনও নষ্ট হয় না।

শরীর-বিজ্ঞানের[3] মূলতত্ত্ব হচ্ছে গতি ও উত্তাপ। এই উত্তাপ প্রাণের উত্তাপ। এটা একপ্রকার প্রকাশহীন তেজ বা আগুন। ঈশ্বর এই উত্তাপ আমাদের মুখ্য প্রাণাবয়ব যে-হৃদয়, তাতে স্থাপন করেছেন। এর কাজ হচ্ছে রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া চালিয়ে রাখা। রক্ত-সঞ্চালনের বর্ণনা দেওয়ার সময়ে, দেকার্ৎ প্রশংসার সাথে হার্ভি-কৃত[4] আবিষ্কারগুলোর উল্লেখ করেছেন। দেকার্তের মতে, রক্তের সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, উত্তপ্ত ও গতিশীল অংশ থেকে রক্তের সার উৎপন্ন হয়ে পৃথকভাবে থাকে। তিনি রক্তের এই সারাংশ বা

---

1 Organism.
2 Automaton.
3 Physiology.
4 Harvey, an English scientist.

নির্যাসকে প্রাণীয় তেজ[1] এই নাম দিয়ে, "অতি সূক্ষ্ম বায়ু" "বিশুদ্ধ উজ্জ্বল অগ্নিশিখা" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা তার বর্ণনা দিয়েছেন। এই উজ্জ্বল অগ্নিশিখা-তুল্য প্রাণীয় তেজ ওপরের দিকে উঠে মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত হয় এবং শেষে মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থলে "পিনিয়াল" নামক গ্রন্থিতে[2] প্রবেশ করে। সেখান থেকে এই প্রাণীয় তেজ নার্ভ বা মজ্জা-তন্তুতে[3] প্রবাহিত হয়, আর মজ্জা-তন্তুর সাথে সংলগ্ন পেশীগুলোর ওপর ক্রিয়া ক'রে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে সঞ্চালিত করে। ইতর জন্তু হোক, বা মানুষ হোক, প্রাণীমাত্রেরই শরীরে এই প্রক্রিয়া একইভাবে ঘটে। যদি মানুষের তৈরি এমন স্বয়ংচল যন্ত্র থাকত, যা ভেতরে বাইরে সর্বাংশে ইতর প্রাণীদের মতন, তা হ'লে ইতর প্রাণী ও এইসব যন্ত্রের পার্থক্য নির্ধারণ করা অসম্ভব হ'ত। কিন্তু যদিও এরকম স্বয়ংচল যন্ত্র সর্বাংশে মানুষের শরীরের মতন হ'ত, তাহলেও তা যে প্রকৃত মানুষ নয়, তা দুটি জিনিষের অভাবে সহজেই ধরা পড়ত—এই স্বয়ংচল যন্ত্রে (১) ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান থাকত না, আর (২) শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়া ছাড়া বিচার-বুদ্ধি জনিত কোন শারীরিক ক্রিয়াও তাতে সম্ভবপর হ'ত না। বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন আত্মার জন্যই মানুষ পশু থেকে পৃথক ও শ্রেষ্ঠ হয়ে আছে।

জড় থেকে আত্মার উৎপত্তি একেবারে অসম্ভব। ভগবান নিজেই জড়াতিরিক্ত একেবারে ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যরূপে আত্মা সৃষ্টি করেছেন।

তবু, দেহ ও আত্মার বন্ধন শিথিল নয়। আত্মাকে দেহ-তরণীর কর্ণধার মাত্র বলে ভাবলে, ভুল করা হবে। আবার, আত্মা ও দেহের সম্বন্ধ যে একেবারে অবিচ্ছেদ্য, তাও নয়। শরীর ও মন (বা আত্মা) এই দুই দ্রব্যের স্বরূপ এত ভিন্ন যে, তাদের সম্বন্ধ দুধ ও জলের মিশ্রণের চেয়ে অধিক নিবিড় হতে পারে না। শরীরের সর্ব অংশের সাথেই আত্মার সংযোগ থাকলেও, শরীরের একটি স্থানে, আত্মার এই সম্বন্ধ বিশেষভাবে সক্রিয়। এই জায়গাটি হচ্ছে পিনিয়েল গ্রন্থি। মস্তিষ্কের মধ্যভাগে এই গ্রন্থিটি সুরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান। মস্তিষ্কের অন্যসব অঙ্গই দুটি দুটি করে রয়েছে; কিন্তু পিনিয়েল গ্রন্থি মাত্র একটিই—এসব তথ্য থেকে আমরা এই গ্রন্থির অনন্যসাধারণ গুরুত্ব অনুমান করতে পারি। শরীর ও মনের সম্বন্ধ ঘটানোর কাজে পিনিয়েল গ্রন্থি মধ্যস্থের মতন আচরণ করে। এই

---

1 Animal sp rits.
2 Pineal gland.
3 Nerve.

গ্রন্থির ভেতর যে জৈব তেজ প্রবাহিত, তার সাহায্যে আত্মা নিজের ও শরীরের মধ্যে বিশেষ-বিশেষ সংযোগ-সূত্র উৎপন্ন করতে ও তাদের যথাযোগ্যভাবে পরিচালিত করতে সমর্থ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, আমাদের ডান ও বাম চোখে এবং ডান ও বাম কানে রূপ ও শব্দের যে পৃথক পৃথক দুটি দুটি করে ছাপ পড়ে, তা এই পিনিয়েল গ্রন্থিতে সম্মিলিত হ'য়ে এক হ'য়ে যায়—তা না হ'লে, আমাদের কাছে, একই বস্তু দুটি বলে প্রতিভাত হ'ত। তাই, বাহ্যবস্তুর ঠিক ঠিক জ্ঞানের জন্য সমগ্র শরীরের ভেতর, পিনিয়েল গ্রন্থিকেই আত্মা নিজের প্রধান স্থানরূপে গ্রহণ করেছে। এইখানে শরীর ও আত্মা পরস্পরের ওপর সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়া করতে পারে। পিনিয়েল গ্রন্থিতে অধিষ্ঠিত হয়ে, আত্মা তার ইচ্ছামত সেখানকার জৈবতেজে সামান্য আলোড়ন তুলে, তেজের গতি-দিক নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, এবং এইভাবেই সে বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়ার কর্তা হয়ে থাকে। দেকার্তের মতে, যেহেতু শরীর হচ্ছে একটি জড় দ্রব্য, তাই শরীরস্থ জৈব তেজের গতি শরীরের নিজস্ব স্বাভাবিক ধর্ম। আত্মা এই গতির জনক নয়। আত্মা শুধু তার দিক-পরিবর্তনে সক্ষম ; কিন্তু আত্মা গতির নির্মাতা নয়। অন্য একভাবেও পিনিয়েল গ্রন্থিস্থ জৈব তেজের দিক্ পরিবর্তিত হয়। বিবিধ বাহ্যবস্তুর প্রভাবে, তাদের দ্বারা জনিত রূপরসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ অনুসারে এই পরিবর্তন সংঘটিত হয় ; আর তাতে পিনিয়েল গ্রন্থিস্থ জৈব-তেজে কিছু সূক্ষ্ম আলোড়ন দেখা দেয়। এখন আত্মা এই আলোড়নের মাধ্যমে, এই পরিবর্তন সাক্ষাৎভাবে বুঝতে পারে, এবং ঐ সকল বাহ্যবস্তুর দ্বারা জনিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ[1] অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ইন্দ্রিয়-সংবেদন[2] দ্বারা বাহ্যবস্তুর ব্যাপারে সক্রিয় হয়। সুতরাং, দেকার্তের মতে, শরীর ও আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পিনিয়েল গ্রন্থিতেই সীমাবদ্ধ। তবু, তিনি মনে করেন যে, স্মরণের ব্যাপারে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম রয়েছে। স্মরণ-ক্রিয়া যতটুকু শারীরিক, ততটুকু মানসিক নয় ; আর এই ক্রিয়া সমগ্র মস্তিষ্কে প্রসৃত, শুধু পিনিয়েল গ্রন্থিতে সীমাবদ্ধ নয়।

দেকার্ৎ "চিন্তন" শব্দটি বেশ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন বটে ; তথাপি উদ্ভিৎ-চেতনা ও জীবচেতনা এ দুটিকে চিন্তন শব্দের অর্থে সমাবিষ্ট করেন নি। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ভেতর, যারা মন ও আত্মাকে অভিন্ন

1 Sensible qualities.
2 Sensation.

বলে ভাবেন তাদের মতে, এ দুটিরই স্বরূপ হচ্ছে চিন্তন বা জ্ঞান-ক্রিয়া, আর ইন্দ্রিয়-সংবেদন হচ্ছে চিন্তনেরই নিম্নস্তরীয় একটি প্রকার। এইজন্য এসব দার্শনিক ইতর-প্রাণীদের নিরাত্মক বলে মনে করেন। দেকার্ৎও এই মতই পোষণ করতেন। ইতর-প্রাণীরা যন্ত্রমাত্র—তাদের প্রাণ বা চেতনা আছে বটে, কিন্তু তাদের -প্রকাশ অথবা জ্ঞানযুক্ত অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি নেই। অবশ্য, সাধারণ লোকেরা মনে করে, ইতর-প্রাণীদেরও এসব জ্ঞানযুক্ত মানসিক বৃত্তি রয়েছে। আর দার্শনিকও এটা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে পারে না। কারণ, এদের চালচলনে জ্ঞান আছে বলে মনে হয়। আসলে কিন্তু ঘড়িতে যখন বারোটা বাজে, ঘড়ি কি তার বিন্দুবিসর্গ খবরও রাখে? এত দেরী হয়ে গেছে বলে, ঘড়ির কোন রকম অনুতাপ, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি হয় বলে কেও মনে করে না। পশুদের কথাও ঠিক এইরকম। দেখা, শোনা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আনন্দ, ভীতি প্রভৃতি শব্দ যদি শারীরিক ক্রিয়াতিরিক্ত কোন ব্যাপার বোঝায়, তাহলে বলতে হবে যে, পশুদের এসব কিছুই নেই। অবশ্য, এসব হওয়ার জন্য যে জ্ঞানশূন্য জড়ীয় আশ্রয় অত্যাবশ্যক, সেই শরীররূপ আশ্রয় পশুদের নিশ্চয়ই রয়েছে। আর তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলাফেরাও করতে পারে, কিন্তু এর বেশী কিছু নয়।

দেকার্তের মনোবিজ্ঞান ইউরোপীয় চিন্তা-জগতে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। তিনি "চিন্তন"-ক্রিয়াকে স্বাধীন ও পরাধীন এই দুই মুখ্য ভাগে বিভক্ত করেছেন। যে-সব চিন্তন আত্মা থেকে নিঃসৃত হয়, এবং আত্মার আয়ত্তে থাকে, সেগুলো হচ্ছে স্বাধীন; আর যেগুলো বাইরের কিছুদ্বারা আত্মায় জনিত হয় এবং আত্মা যেগুলো পরিবর্তন করতে সমর্থ নয়, সেগুলো হচ্ছে পরাধীন চিন্তন।

স্বাধীন মানসিক ক্রিয়া মানে মূলতঃ প্রযত্নপ্রবণ ইচ্ছা অথবা সংকল্প[1]। এই সংকল্প শব্দটি আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে সাংখ্যদর্শনসম্মত "নিশ্চয়" নামক বৃত্তির মতন অর্থে ব্যবহার করছি। কিছু করবার আগে, আমরা মনে মনে এরূপ নিশ্চয় করি যে, এটা আমি করবো। সাংখ্য দর্শনে এই নিশ্চয়কে বুদ্ধি বা মহৎ-তত্ত্বের একটি অবস্থা. বিকার বা বৃত্তি বলে গণনা করা হয়। দেকার্তের মতে, সংকল্প ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে আত্মার দ্বারা জনিত; আর কোন কিছু করবার সংকল্পরূপ ক্রিয়াতে পরাধীন অথবা নিশ্চেষ্ট চিন্তন

1 Willing.

বলতে কোন বাহ্যবস্তুর ধারণা বা জ্ঞান বুঝতে হবে; কারণ, এ সব ধারণা আত্মা নিজে নির্মাণ করে না, কিন্তু গ্রহণ করে মাত্র। স্বাধীন চিন্তন মানে কার্যোন্মুখী প্রযত্নাত্মক বৃত্তি, আর পরাধীন চিন্তন মানে জ্ঞানীয় বৃত্তি। কিন্তু দেকার্ৎ এই বিভাগটি সর্বত্র মেনে চলেন নি। উদাহরণ স্বরূপ, সহজাত লালসা ও হৃদয়াবেগকে তিনি ইচ্ছাবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করেছেন, অথচ এগুলোকে আত্মার স্বাধীন ক্রিয়া বলে স্বীকার করেন নি। এর কারণ এই যে, তাঁর মতে এগুলো শুধু আত্মা থেকে উৎপন্ন হয় না কিন্তু আত্মা ও শরীরের সম্বন্ধ থেকে উৎপন্ন হয়। তা ছাড়া, সর্বপ্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞানই যে ইন্দ্রিয়-সংবেদন থেকে আসে, তা নয়। তাই, সব প্রত্যক্ষজ্ঞান পরাধীন নয়। আত্মা যখন কল্পনায় মনের বিভিন্ন ধারণাগুলোকে যথেচ্ছভাবে মিলিয়ে মনের সামনে রাখে, বিশেষতঃ যখন শুদ্ধ বিচার-বুদ্ধির দ্বারা স্ব-স্বরূপের বিবেচনা করে ও কল্পনা-বিমুক্ত দৃষ্টিতে স্বীয় নির্মল বিচারাত্মক প্রজ্ঞার দিকে তাকায়, তখন আত্মার এই জ্ঞানীয় ক্রিয়াকে একেবারে পরাধীন বা পরতন্ত্র বলা চলে না। আবার প্রত্যেক সংকল্প ক্রিয়ার সাথে ঐ ক্রিয়ার চেতনা বা ভানও[1] থাকে। এসব স্থলে, সংকল্পরূপ বৃত্তিটি স্বাধীন, কিন্তু সংকল্পের ভান বৃত্তিটি পরাধীন। অর্থাৎ এখানে আত্মা নিজের ওপর ক্রিয়া করে এবং এই স্ব-ক্রিয়ার দ্বারা নিজে প্রভাবিত হয়—বলা যেতে পারে যে, যখন কোন সংকল্প-ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তখন তাতে আত্মার স্বাধীনতা ও পরাধীনতা দুই-ই থাকে। সুতরাং প্রবণতা মাত্রকেই (যথা ইন্দ্রিয়-সংবদ্ধ বাসনাকে), প্রযত্নাত্মক অথবা স্বাধীন বলা সংগত হবে না; তেমনি সর্ব প্রত্যক্ষজ্ঞানকে (যথা শুদ্ধ বিচারাত্মক প্রজ্ঞাকে) পরাধীন অথবা নিশ্চেষ্ট বলা ঠিক নয়। তা ছাড়া, এমন কতক মানসিক বৃত্তি আছে, যেগুলোকে একান্তভাবে স্বাধীন অথবা পরাধীন ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হবে না। যথা, দুঃখবেদন[2] এক-দিকে যেমন কোন কিছু দ্রব্যের অধীন, অপরদিকে তা ঐ দ্রব্য থেকে দূরে থাকার স্বাধীন প্রেরণাও বটে। স্বাধীন ও পরাধীন এই দুটি মুখ্য বিভাগ ছাড়া, দেকার্ৎ মনের বিভিন্ন অবস্থা বা বৃত্তিগুলোকে আরও কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন :—যথা, (১) সহজাত বাসনা (২) বিচারানুগ হৃদয়াবেগ, (৩) স্মরণ বা নিষ্ক্রিয় কল্পনা, (৪) সক্রিয় কল্পনা, (৫) বিচারাত্মক

---

1 Consciousness.
2 Feeling of pain.

প্রজ্ঞা, (৬) সংকল্প বা প্রযত্নাত্মক নিশ্চয়, ইত্যাদি। কিন্তু এই শ্রেণী-বিভাজনের কাজটি তিনি সব সময় একইভাবে করেন নি। এই অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও, দেকার্ৎ মনোলোকের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা আধুনিক মনো-বিজ্ঞানের বিকাশে নানাভাবে সাহায্য করেছে। বিশেষতঃ, আত্মা বা মনের সম্বন্ধে তাঁর একটি মত আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা প্রায় সবাই সমর্থন করেন। মতটি এই যে, আত্মা বা মনের ভিন্ন ভিন্ন রকমের অবস্থা, ক্রিয়া, শক্তি এবং তার উচ্চ, নীচ স্তর প্রভৃতি থাকলেও এগুলোকে পরস্পর থেকে অত্যন্ত ভিন্ন ও অসংবদ্ধ বলে ভাবলে বিরাট ভুল করা হবে। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানের এই ভ্রান্ত মত খণ্ডন করে দেকার্ৎ বিশেষ জোরের সাথে আত্মার নির্বিভাগবাদ সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, একই অবিভক্ত মন বিচারাত্মক বা ইন্দ্রিয়-সংবেদনাত্মক, প্রযত্নাত্মক বা জ্ঞানাত্মক মানসিক ক্রিয়া সম্পাদন করে; তাইতে, এসব বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়া বা শক্তির ভেতর একটি সামগ্রিক আন্তর ঐক্য রয়েছে।

বাহ্যবস্তু-বিষয়ক স্মরণ বৃত্তি, প্রত্যক্ষ বৃত্তি অথবা সংকল্পবৃত্তি, যে রকম মানসিক বৃত্তিই হোক না কেন, এদের কতকগুলো আমরা শরীরের, এমনকি বাহ্যবস্তুর ধর্ম বলে নির্দেশ করে থাকি; সুতরাং এইগুলোর জনক নিশ্চয়ই আত্মা নয়, কিন্তু শরীর (অর্থাৎ জৈব তেজ ও মজ্জা-তন্তু)[1]। অন্যান্য মানসিক বৃত্তিগুলোকে আত্মার দ্বারা জনিত আত্মার ধর্ম বলা অসঙ্গত হবে না। একদিকে শরীর-জনিত শরীরের ধর্ম, আরেক দিকে আত্মার দ্বারা জনিত আত্মার ধর্ম, এই দুই প্রধান শ্রেণীর মাঝামাঝি আরেক শ্রেণীর মানসিক বৃত্তি আছে; যথা, যে সব সংকল্প ক্রিয়া আত্মার দ্বারা জনিত, কিন্তু যার বিষয় হচ্ছে কোন শারীরিক ক্রিয়া (উদাহরণ স্বরূপ, হাঁটা বা লাফ দেওয়ার সংকল্প); আর এগুলো এই অন্তর্বর্তী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

তা ছাড়া, স্বাভাবিক হার্দিক সংবেদন[2] এবং হৃদয়াবেগ[3]-ও এই শ্রেণীতেই পড়ে। কারণ, এগুলো আত্মার ধর্ম হ'লেও জৈবতন্ত্রের বিশিষ্ট গতির দ্বারা উৎপাদিত, পালিত ও সংবর্ধিত হয়। যে-সব প্রাণীর আত্মা এবং শরীর দুই-ই আছে, শুধু তাদেরই এসব হার্দিক সংবেদন ও

---

1 Nerve.
2 Feeling.
3 Emotion.

হৃদয়াবেগ থাকতে পারে—অন্যের নয়। সুতরাং এগুলো বিশেষভাবে মানবীয় মনের অবস্থা বা বৃত্তি। এসব অবস্থার সংখ্যা কিছু কম নয়। তথাপি এগুলোকে কয়েকটি অমিশ্র বা মৌলিক প্রকারে বিভক্ত করা যেতে পারে—অন্যান্য অবস্থাগুলো এদেরই নানাভাবে মিলনের ফলে উৎপন্ন হয় বলে মনে করা যায়। দেকার্ৎ ছ'টি মূল অবস্থার নাম নির্দেশ করেছেন: (১) বিস্ময়, (২) ভালবাসা, (৩) ঘৃণা, (৪) আকাঙ্ক্ষা, (৫) আনন্দ ও (৬) বিষাদ। প্রথম ও চতুর্থটির বিপরীত কোন অবস্থা নেই; প্রথমটি ভাবও নয় অভাবও নয়[1]; আর চতুর্থটি ভাব ও অভাব দুই-ই। যা আত্মার হিতকর, ভালবাসা তাকে আত্মসাৎ করতে চায়; যা অনিষ্টকর, ঘৃণা তা দূর বা নাশ করতে চায়। আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যতের পানে আশা ও ভয়ের দৃষ্টিতে তাকায়। ভীতি ও আশার বিষয় যখন বাস্তবে পরিণত হয়, তখন বিষাদ ও আনন্দের উদয় হয়। আশা ও ভীতির সম্বন্ধ হচ্ছে ভাবী কল্যাণ ও অকল্যাণের সাথে; আর আনন্দ ও বিষাদের সম্বন্ধ বর্তমান কল্যাণ ও অকল্যাণের সাথে।

হার্দিক সংবেদন ও হৃদয়াবেগের আলোচনার পর, দেকার্ৎ তাঁর নীতি-শাস্ত্রীয় মত ব্যক্ত করেছেন। হার্দিক সংবেদনগুলোকে সম্পূর্ণ বশে এনে ও যথাযোগ্যভাবে চালিত করে এমন এক সুখকর শান্ত মানসিক অবস্থা লাভ করা যায়, যা বিচার-বুদ্ধি অর্থাৎ প্রজ্ঞার একান্ত অনুগামী। কোন আত্মাই এত দুর্বল নয় যে, এই মানসিক অবস্থার অধিকারী হতে অসমর্থ। সচেষ্ট ইচ্ছা অর্থাৎ সংকল্প-শক্তির স্বাধীনতা অপরিসীম। সংকল্প-শক্তির দ্বারা হার্দিক সংবেদন ও হৃদয়াবেগকে বশে আনা সম্ভবপর; তবু মনে রাখতে হবে যে, এই কাজটি বেশ কঠিন—সংকল্পের হুকুম পাওয়া মাত্র যে হার্দিক সংবেদন ও হৃদয়াবেগগুলো শূন্যায়িত অথবা নীরব হয়ে যায়, তা নয়; অন্ততঃ, উগ্র হৃদয়াবেগগুলোর সম্বন্ধে এই কথা অনস্বীকার্য। তথাপি ক্রমশঃ[2] এগুলোকে অধিকাধিক বশে আনার ক্ষমতা সংকল্প-শক্তির রয়েছে। এই নিয়ন্ত্রণ দুভাবে সম্ভবপর: (১) হৃদয়াবেগের (যথা ভয়ের) কিছু শারীরিক ক্রিয়া বা গতি (যথা পলায়ন) উৎপন্ন করার দিকে ঝোঁক থাকে; আর হৃদয়াবেগের স্থিতিকালেও এসব শারীরিক ক্রিয়া থামিয়ে দেওয়া সংকল্প শক্তির আয়ত্তাধীনে; অবশ্য, গোটা হৃদয়াবেগটিকে সম্পূর্ণ-

1 Neither positive nor negative.
2 Gradually.

ভাবে উড়িয়ে দেওয়া সংকল্প-শক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয় ; (২) তা ছাড়া মনের শান্ত অবস্থায়, সংকল্প-শক্তি এমন উপায় অবলম্বন করতে পারে, যার দ্বারা হৃদয়াবেগের ভবিষ্যৎ আক্রমণ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে যায়। হৃদয়াবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, কেও কেও এক হৃদয়াবেগের বিরুদ্ধে অন্য হৃদয়াবেগ ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এতে সংকল্প-শক্তির স্বাধীনতা আছে বলে, মনে হতে পারে ; কিন্তু আসলে এটাও আত্মার পরাধীন অবস্থার পূর্বানুবৃত্তি[1] মাত্র। হৃদয়াবেগের ওপর প্রকৃত প্রভুত্ব লাভ করতে হলে, আত্মাকে নিজস্ব আধ্যাত্মিক শস্ত্রের দ্বারা, অর্থাৎ ভালমন্দের সুনিশ্চিত জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নৈতিক নিয়মের পরিচালনা দ্বারা, হৃদয়াবেগের সাথে যুদ্ধ করা দরকার। অনেকসময়, হৃদয়াবেগের উত্তেজনাবশতঃ জিনিষের যা প্রকৃত মূল্য, তা ঢাকা পড়ে যায়, আর তাতে মিথ্যা মূল্য আরোপিত হয়। কিন্তু স্পষ্ট ও বিবিক্ত জ্ঞান ও নৈতিক নিয়মের সাহায্যে, আত্মা হৃদয়াবেগের ওপর প্রকৃত বিজয়লাভ করতে সমর্থ হয়।

হৃদয়াবেগের এই সংযমনরূপ নিষেধাত্মক তত্বটি ছাড়া, দেকার্ৎ নীতি-শাস্ত্রে আর বিশেষকিছু বলেননি।

তাঁর চিঠিপত্রে এবং তৎকালীন কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের সাথে আলোচনায়, তিনি আরো কয়েকটি নৈতিক মত সমর্থন করেছেন। এগুলোতে প্রাচীন গ্রীক ও মধ্যযুগীন দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। এখানে এরূপ কয়েকটি মতের সামান্য বর্ণনা দেওয়া হলো। বিজ্ঞতা বা বিবেচকপনা[2] হচ্ছে, যা সর্বোত্তম বলে স্পষ্ট ও বিবিক্তভাবে জানা গেছে, তার সতত আচরণ। সাধুতা বা ধার্মিকতা[3] মানে ঐরূপ আচরণে অবিচলিত থাকা। আর অধর্ম[4] বা পাপ মানে তার থেকে বিচ্যুতি। মানবীয় প্রযত্নের চরম লক্ষ্য হচ্ছে হৃদয়াবেগের ওপর বিচার-বুদ্ধির প্রভুত্ব সম্পাদন ও এই প্রভুত্বজনিত মনের শান্তি লাভ। এই চরম লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য, চাই সৎ বা ধার্মিক হওয়ার দৃঢ় সংকল্প। সাধুত্ব বা ধার্মিকতা যে পরম শান্তিলাভের অব্যর্থ উপায়, তা এই কয়েকটি কথার থেকে বোঝা যাবে। (১) পরম শান্তি হচ্ছে মনের স্বাভাবিক অবস্থা ; (২) এই স্বাভাবিক

---

1 Continuation.
2 Wisdom.
3 Virtue.
4 Vice.

অবস্থা তখনই অক্ষুণ্ণ থাকবে, যখন আমরা মনের প্রকৃত স্বরূপের সাথে অবিসংবাদে জীবন যাপন করতে পারব; (৩) মনের প্রকৃত স্বরূপটি হচ্ছে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি বা প্রজ্ঞা; এবং (৪) ধার্মিকতা হচ্ছে প্রজ্ঞানির্দিষ্ট আচরণে অবিচল থাকা।

পরম শান্তির দেকার্তীয় আদর্শ আর সেণ্ট্-টমাস্-সম্মত পরমানন্দের[1] ধারণা, এদুটি বহুলাংশে একই রকম। তবু এদের ভেতর একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করার মত। টমাসীয় ধারণটিতে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার-ও সমাবিষ্ট; তাই, দেহপাতের আগে, পরমানন্দ পুরোপুরিভাবে লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু দেকার্তীয় শান্তির আদর্শে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকাব সমাবিষ্ট নয়। এই পার্থক্যটি হয়তো দেকার্তের আধুনিক মনোভাবেরই পরিচায়ক।

মনের স্বাভাবিক শান্তিটিকে পাকাপাকিভাবে অর্জন করার ব্যাপারে, মানুষ কি স্বাধীন? আরো মূলগামী প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের কি আদৌ কোন কাজে কিছুমাত্র স্বাধীনতা আছে? দেকার্তের মতে, মানুষের অন্তত: একটি স্বাধীনতা রয়েছে, আর তা হচ্ছে বিচার-স্বাধীনতা। কারণ, আমি যা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করি, তার সম্বন্ধেও আমি সন্দেহ করতে পারি। দেকার্ৎ এখানে যে সংশয়ের কথা বলছেন তা হচ্ছে তাঁর সর্ববিষয়ক বিচার-পদ্ধতীয় সংশয়।[2] এই সংশয় করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই একপ্রকার বিচার-স্বাধীনতা। মানুষের স্বাধীনতা শুধু তার বিচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; অধিকন্তু বিচারানুযায়ী কাজ করার ব্যাপারেও তার যথেষ্ট স্বাধীনতা রয়েছে। এ কথার সত্যতা আমরা সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করতে পারি। দেকার্ৎ সম্ভবত: স্বাধীনতার বোধটিকে একটি সহজাত অন্তর্নিহিত ধারণা[3] বলবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন যে মানুষের পক্ষে যতখানি পূর্ণতা সম্ভবপর, এই স্বাধীন কর্মক্ষমতা হচ্ছে তার সর্বোত্তম অঙ্গ; এই শক্তি থাকার দরুণই, মানুষ তার কৃতকার্যের জন্য দায়িত্ব বহন করে, এবং নিন্দা বা প্রশংসার পাত্র হয়।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়, দেকার্তের মনে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ সমস্যা দেখা দিয়েছিল। মানুষের কর্ম-স্বাধীনতা আর ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা ও সর্বব্যাপারে পূর্ব-বিধায়িত্ব,[4] এই দুটির সামঞ্জস্য কিভাবে সংসাধিত

1 Beatitude.
2 Methodic doubt.
3 Innate idea.
4 Pre-determination.

হয়? "দর্শনের মূলতত্ত্বসমূহ"[1] নামক গ্রন্থে দেকার্ৎ বলেছেন যে, মানুষের কর্ম-স্বাধীনতা ও ঈশ্বরের পূর্ববিধায়িত্ব, এ দুটির কোনটিকেই আমরা পরিত্যাগ করতে পারিনা। কিন্তু এ দুয়ের সামঞ্জস্য কিভাবে হতে পারে, এর উত্তরে দেকার্ৎ শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন যে, অসীম শক্তির অধিকারী ঈশ্বর কিভাবে এই দুই তত্ত্বের সামঞ্জস্য সম্পাদন করেছেন, তা যে আমাদের সীমিত বুদ্ধির নিকট অজ্ঞেয় থাকবে, সেটা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

অবশ্য, কোন সমস্যার সমাধানকে অজ্ঞেয় বলার অর্থ এমন নয় যে, তার কোন সমাধান নেই। তবু যে সমাধান প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধির নিকট অজ্ঞেয়, তা আছে বলে স্বীকার করা প্রজ্ঞার স্বভাবের সাথে খাপ খাওয়ানো কঠিন নয় কি?

সে যাই হোক, এই প্রসঙ্গে দেকার্তের আরও কিছু মূল্যবান বক্তব্য রয়েছে। একটি বক্তব্য এই যে, প্রকৃত স্বাধীনতা মানে বিচার-বুদ্ধির অপেক্ষা না রেখে, যা-তা করার ক্ষমতা নয়। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বিচার-নিরপেক্ষ স্বাধীনতার এই ধারণাটিকে 'বেপরোয়া স্বাধীনতা'[2] এই নাম দেওয়া হয়। দেকার্তের মতে, যে-কর্ম শুধু আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের উপায় নয়, কিন্তু যা বস্তুগতভাবেই[3] আমার করণীয়, সেই কর্ম সম্পাদনের দিকে যত বেশী পরিমাণে আমার ইচ্ছা বা সংকল্প-শক্তি প্রেরিত হ'বে, ততবেশী পরিমাণে আমার অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক স্বাধীনতা চরিতার্থ হবে। এই প্রেরণা ঈশ্বরের কৃপা থেকে এলেও, স্বাধীনতার হানি হয় না। কিন্তু স্বাধীনতার ধারণায়, কর্তব্য কর্ম না করার, অথবা তার জায়গায় অন্য কিছু করার ক্ষমতা গর্ভিত বলে, যারা মনে করে, অর্থাৎ যারা স্বাধীনতা শব্দ দ্বারা খামখেয়ালীপনা বোঝে, তারা স্ব-শব্দের অর্থ কি তাই জানে না। স্বাধীন মানে স্ব-এর অধীন; খামখেয়ালী মানুষ নিশ্চয়ই স্ব-এর অধীন নয়, কিন্তু পরের অধীন। কারণ, আমার স্ব হচ্ছে আমার প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধি, আর তদনুসারে কাজ করাতেই আমার স্বাধীনতা।

1 *Principles of Philosophy*.

2 Liberty of indifference.

3 Objectively.

স্বাধীনতার এই দেকার্তীয় ধারণাটিকে কাণ্ট-সম্মত 'কৃত্যাত্মক প্রজ্ঞা'[1] ও 'সর্তহীন আদেশের'[2] পূর্বাভাস বলা যেতে পারে।

মনের স্বাভাবিক শান্তিকে বাস্তবায়িত করার নৈতিক কর্তব্য ছাড়া, অপর একটি কাজও স্বাধীন সংকল্প-শক্তির ওপর ন্যস্ত রয়েছে। এই কাজটি হচ্ছে, সর্ববিষয়ে যতদূর সম্ভব যথার্থ জ্ঞান আহরণ। জ্ঞান বলতে এখানে উদ্দেশ্য-বিধেয়-যুক্ত, অথবা বিশেষ্য-বিশেষণ-যুক্ত জ্ঞান বুঝতে হবে। ইংরেজীতে একে বলা হয় জাজ্‌মেণ্ট্[3]। কেউ কেউ জাজ্‌মেণ্টের বাংলা করেছেন বিচার। ভারতীয় দর্শনে সাধারণতঃ এরকম জ্ঞানকে সবিকল্পক বা সপ্রকারক অথবা বিশিষ্ট জ্ঞান বলে। একে হয়ত বিধান, অবধারণ, প্রভৃতি নাম দেওয়া যেতে পারে। সে যাই হোক, দেকার্তের মতে, অবধারণ অথবা বিশিষ্ট জ্ঞানের উৎস হচ্ছে স্বাধীন সংকল্প শক্তি; আর সংকল্পশক্তির এই স্বাধীনতার জন্যই বিশিষ্ট জ্ঞান মাঝে মাঝে ভ্রান্ত হয়—ভ্রান্তির সম্ভাবনার হেতু হচ্ছে সংকল্পশক্তির স্বাধীনতা।

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে। ঈশ্বর একাধারে সত্যপরায়ণ ও কল্যাণ-কারী; আর তিনিই মানুষকে যথার্থ জ্ঞান আহরণের কর্তব্য ও ক্ষমতা দিয়েছেন। তাহলে, এই কর্তব্য ঠিকভাবে সম্পাদিত হয় না কেন, আর এই ক্ষমতার অপব্যবহার, ও তজ্জনিত ভ্রান্তি কিভাবে সম্ভবপর হয়? এ সম্বন্ধে দেকার্তের অভিমত এই যে, বাহ্যবস্তু বিষয়ক মানবীয় ধারণা ইন্দ্রিয়-সংবেদন-জনিত হোক অথবা অন্তর্নিহিত সহজাত[4] হোক, তার নিজস্ব-রূপে তা কখনও ভ্রান্ত নয়; কিন্তু আমাদের কোন ধারণার ভিত্তিতে আমরা যখন বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে কোন অবধারণকে গ্রহণ করি, অর্থাৎ মনে মনে ভাবি যে, বস্তুটি এরকম, অথবা এরকম নয়, তখনই ভ্রান্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়।[5] বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণের মধ্যে, অর্থাৎ তার সম্বন্ধে কোন বিধান বা অবধারণ গ্রহণের ভেতর, মনের একপ্রকার সম্মতি বা সমর্থন থাকে। মনের এই সম্মতি বা সায় দেওয়া হচ্ছে সচেষ্ট ইচ্ছা বা সংকল্পশক্তির কাজ। আমরা এর আগে বলে এসেছি যে, দেকার্তের মতে, সংকল্প হচ্ছে মনের স্বাধীনশক্তি এবং তা যুক্তিবিচারের ন্যায়, অথবা ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ন্যায়

---

1 Practical Reason.
2 Categorical Imperative.
3 Judgement.
4 Innate idea.
5 এখানে আমরা ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদের সূচনা দেখতে পাই।

পরতন্ত্র নয়। যুক্তিবিচারসিদ্ধ বিধান, যুক্তিবিচারের ওপর নির্ভর করে না; কিন্তু তা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এইজন্য, সত্য নির্ণয়ের ব্যাপারে, যুক্তিবিচারকে বিষয়-তন্ত্র, সুতরাং, পরতন্ত্র বলা হয়। যুক্তিবিচারের সিদ্ধান্ত বিষয়তন্ত্র হ'লেও, ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কাজটি হচ্ছে সচেষ্ট ইচ্ছাশক্তির। যুক্তিবিচারসিদ্ধ বিধানটিকে গ্রহণ করা, অথবা গ্রহণ না করা, অথবা ঐ বিধানটির পরিবর্তে কোন ভ্রান্ত বিধান গ্রহণ করা, এসবগুলোতেই সংকল্পশক্তি হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বাধীন। যুক্তিবিচারের এই নির্বাচনীয় স্বাধীনতা নেই। এদিক থেকে বলা যায় যে, সংকল্পের ক্ষমতা অপরিসীম, সর্বত্র তার অবাধ গতি। কোন বস্তুবিষয়ক বিধানের উপাদানীভূত ধারণাগুলো সম্পূর্ণ স্পষ্ট হওয়ার আগেই, আমাদের সচেষ্ট ইচ্ছাশক্তি ঐ বিধানটিকে (১) গ্রহণ বা (২) পরিত্যাগ করতে পারে, অথবা (৩) তার প্রতি মধ্যস্থতা অবলম্বন করতে পারে। ইচ্ছাশক্তির সদ্যোবর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রিয়াতে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। তাই, ভ্রান্ত জ্ঞানকে অবিচার-সিদ্ধ বলতে হবে। এরজন্য, ঈশ্বরের স্বভাবকে অথবা মানবীয় বিচারবুদ্ধির স্বভাবকে দায়ী করা যায় না। বিচারবুদ্ধির সমর্থন ছাড়া, যদি ইচ্ছাশক্তি সত্যবিধানকেও গ্রহণ করে, তা হ'লেও কিন্তু যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা হয় না। যথার্থ জ্ঞান অর্জন করার জন্য, ইচ্ছাশক্তিকে বিচারবুদ্ধির বশ্যতা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এই বশ্যতা স্বীকার করার সময়েও, ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন বা স্ব-তন্ত্রই থাকে; ইচ্ছাশক্তি বিচারবুদ্ধির বশ্যতা স্বীকার করবে, কি করবে না, তা সম্পূর্ণভাবে ইচ্ছাশক্তির ওপরই নির্ভর করে। বস্তু-বিষয়ক কোন সম্ভবপর বিধানে সম্মতি বা অসম্মতি দেওয়া বা এগুলো স্থগিত রাখা, অর্থাৎ বিধানের অংশীভূত ধারণাগুলো স্পষ্ট ও বিবিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, তার যাথার্থ্য স ম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে না আসা, এসবই সংকল্পশক্তির করায়ত্ত।

মানুষের পক্ষে, যতরকমের যতখানি পূর্ণতালাভ সম্ভবপর, তাকে "মানবীয়পূর্ণতা" এই নাম দিয়ে, দেকার্ৎ বলেন যে, মানবীয় পূর্ণতার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ হচ্ছে ভুল না করার ও যথাসম্ভব সত্যজ্ঞান আহরণের ক্ষমতা। মানবীয়পূর্ণতা লাভ ও (সুতরাং) সত্যজ্ঞান আহরণ হচ্ছে মানুষের একটি নৈতিক কর্তব্য। অন্যান্য নৈতিক কর্তব্য পালনের মতন এটিও ইচ্ছাশক্তির ওপর ন্যস্ত, এবং অন্যান্য নৈতিক কর্তব্য পালনের জন্য, যেমন ইচ্ছাশক্তি স্বাধীনভাবে বিচারবুদ্ধির বশ্যতা স্বীকার করে, সত্য জ্ঞান আহরণের বেলাতেও তাই।

যথার্থ জ্ঞান আহরণ করাকে একটি নৈতিক কর্তব্য বলে নির্দেশ করার, কেউ কেউ বলেছেন যে, দেকার্তের মতে সত্য ও কল্যাণ[1] শেষ পর্য্যন্ত পরস্পর থেকে অভিন্ন বলে প্রতিপন্ন হয়। সম্ভবতঃ, দেকার্ৎ এতদূর যেতে চান নি। খুব সম্ভব, এখানে তাঁর বক্তব্য শুধু এইটুকুই যে, ভ্রান্ত বিধান থেকে নিবৃত্ত থাকা, এটা হচ্ছে সংকল্পশক্তির একটি নৈতিক দায়িত্ব; আর এর জন্য, সংকল্প-শক্তিকে বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে হবে। বিচারবুদ্ধি আমাদের বলে যে, ধারণা স্পষ্ট ও বিবিক্ত না হ'লে তাকে ভিত্তি করে বস্তুস্থিতিসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ বিধান হ'তে পারে না; আর, সংকল্প-শক্তির নৈতিক কর্তব্য হচ্ছে বিচারবুদ্ধির এই কথা মেনে নেওয়া।

বিচারশক্তি বিষয়তন্ত্র ও সংকল্পশক্তি স্বতন্ত্র। কিন্তু, এই শক্তি দুটি পরস্পর থেকে ভিন্ন হ'লেও, উভয়ে একই আত্মার শক্তি। তাই বিচারশক্তির দ্বারা সংকল্পশক্তি যে প্রভাবিত হ'তে পারে, তা আশ্চর্যজনক নয়। স্ব-তন্ত্রতা বা স্বাধীনতা বশতঃ, সংকল্পশক্তি এই প্রভাবকে এড়াবার ক্ষমতা রাখে। আর এটাই হচ্ছে অনৈতিক কর্ম ও ভ্রান্ত জ্ঞানের মূল কারণ। তথাপি, সংকল্পশক্তির স্বাধীনতা বশতঃ, আত্মা অনৈতিক কর্ম ও ভ্রান্তি এড়িয়ে, নীতিমান ও যথার্থ জ্ঞানবান হ'তে পারে। এই কথাগুলোর সাথে দেকার্ৎ বার বার আরো একটি কথা বলেছেন যে, বিচার বুদ্ধিই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ, এবং বিচারবুদ্ধির নির্দেশ অনুসারে কাজ করাতেই আত্মার প্রকৃত স্বাধীনতা।

প্রশ্ন হচ্ছে, সংকল্পশক্তি কি আত্মার প্রকৃত স্বরূপের অন্তর্গত নয়? দেকার্তের লেখাতে এর স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, দেকার্ৎ এখানে দু-রকম স্বাধীনতার কথা বলেছেন। প্রথমটি হচ্ছে সংকল্পশক্তির স্বাধীনতা—এতে একদিকে নীতিমত্তা ও অনৈতিকতা এবং অপরদিকে যথার্থ জ্ঞান ও ভ্রান্তি, এসবই সম্ভবপর। কিন্তু, স্বাধীনতার অপর অর্থে, তার দ্বারা শুধু নীতিমত্তা ও যথার্থ জ্ঞানই সম্ভবপর। এই স্বাধীনতাটি কার? নিশ্চয়ই সংকল্পশক্তির নয়; কারণ, সংকল্পশক্তি অনৈতিক ও ভ্রান্ত হ'তে পারে; তাই, মনে হয় যে, দেকার্ৎ-সম্মত এই দ্বিতীয় প্রকার স্বাধীনতাটি হচ্ছে আত্মার। কারণ, আত্মার আসল স্বরূপ যে বিচারবুদ্ধি, তা আগেই বলা হয়েছে; আর বিচার-নির্দিষ্ট

1 Truth and Good.

আচরণই নীতিমত্তা এবং বিচার-সিদ্ধ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। প্রজ্ঞা বা বিচারকে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বলে মেনে নিয়ে, আমরা বলতে পারি যে, প্রজ্ঞার দুটি শাখা : কর্মীয় ও জ্ঞানীয়—কর্মীয় প্রজ্ঞা হচ্ছে কর্ম বা কৃতিপ্রবণ বিচার, আর জ্ঞানীয় প্রজ্ঞা হচ্ছে জ্ঞানপ্রবণ বিচার। প্রথমটিকে সংকল্পাত্মক বিচার আর দ্বিতীয়টিকে জ্ঞানাত্মক বিচারও বলা যেতে পারে। দেকার্তের প্রায় এক শতাব্দী পরে গভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তায় পারদর্শী কাণ্ট্ প্রজ্ঞার এই দুটি শাখা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিলেন।[1] সত্য জানার ব্যাপারে, আত্মা বিষয়তন্ত্র, অতএব, অ-স্বাধীন ; কিন্তু নৈতিককর্মের ব্যাপারে স্ব-তন্ত্র ; অথচ দ্বিবিধরূপেই আত্মার স্বরূপটি হচ্ছে ন্যায়ানুগ সার্বিক[2] বিচার। তবু একটু খটকা থেকে যায়। সার্বিক বিচার জ্ঞানীয় হোক অথবা কৃতীয় হোক, তার পক্ষে ভ্রান্ত জ্ঞান ও অনৈতিক সংকল্প সম্ভবপর নয় ; অথচ আত্মায় ভ্রান্তি এবং অনৈতিক সংকল্প, দুই-ই দেখা যায়। এর হেতু কি ? বিশেষতঃ, ভাল ও মন্দ দ্বিবিধ কর্মেই যে আত্মার দায়িত্ব ও স্ব-তন্ত্রতা আছে, দেকার্ৎ এবং কাণ্ট উভয়েই তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু মন্দ কর্মে আত্মার যে স্ব-তন্ত্রতা বা স্ব-অধীনতা, এই স্ব-এর মানে কি ? এই 'স্ব' নিশ্চয়ই সার্বিক বিচার বুদ্ধি নয়। বিচার বলতে যদি সার্বিক বিচারই বুঝি, তা হ'লে আমাদের আলোচ্য স্ব-পদার্থটিকে বিচারবুদ্ধি না বলে, অ-বিচারবুদ্ধিই বলতে হয়। অবশ্য, এই অ-বিচারবুদ্ধিও সচেতন। কারণ, খারাপ কাজের সংকল্পেও কর্তা সচেতন, অচেতন নয়। তা না হ'লে, খারাপ কাজের জন্য কর্তার দায়িত্ব থাকত না।

এই আলোচনার নিষ্কর্ষ এই যে, যথার্থ ও ভ্রান্ত জ্ঞানের মালিক এবং ভাল মন্দ কাজের কর্তা যে আত্মা, তাঁতে বিচারের সাথে অ-বিচারও বিদ্যমান। তথাপি, একটু বিচার করলে বোঝা যাবে যে, অবিচারের চেয়ে বিচারই আত্মার অন্তরঙ্গ বা প্রকৃত স্বরূপ। কারণ, অবিচার-সিদ্ধ জ্ঞান অথবা ভ্রান্তি বলে জানলে, ভ্রান্তি আর থাকতে পারে না ; তেমনি খারাপ সংকল্প যে অবিচার-সিদ্ধ অর্থাৎ খারাপ, তা বুঝলে, এইরূপ সংকল্প ছেড়ে দিতে হয়—যখন আমরা কোন কাজ করার সংকল্প করি, তখন তাকে বিচারানুগ বলেই ভাবি ; নইলে, ঐরূপ সংকল্প করা সম্ভবপর নয়। এর অর্থ এই যে, আত্মা তার সর্ব জ্ঞানে ও সংকল্পে নিজেকে বিচার-বান বলেই মনে

---

1 Theoretical Reason and Practical Reason.
2 Universal.

করে। বিচার যদি আত্মার অন্তরঙ্গ না হ'ত, তা হ'লে এর কোন উপপত্তি হয় না। তাছাড়া, যে-আত্মা কোন জ্ঞান বা সংকল্পকে অবিচার-সিদ্ধ বলে বুঝতে পারে, তার প্রকৃত স্বরূপ বিচারবুদ্ধি হ'তে বাধ্য। বিচার যে আত্মার অন্তরঙ্গ ও অবিচার যে তার বহিরঙ্গ, তার সমর্থনে অন্য একটি যুক্তি এই: ভ্রান্তি বা খারাপ সংকল্পের জনক যে অবিচার, তা ঐ ভ্রান্তি বা খারাপ সংকল্প-বিষয়ক বিচারে বিনষ্ট হয়। কিন্তু অবিচার থাকাকালে, তা বিচারকে নষ্ট করে দিয়েছিল এরকম না বলে, বিচারকে শুধু দুর্বল করে দিয়েছিল, এরকম বলাই সঙ্গত বলে মনে হয়। কারণ, বিনষ্ট বিচারের পক্ষে, কোন জ্ঞান বা সংকল্পের অবিচার-সিদ্ধতা বোঝা অসম্ভব ; কিন্তু দুর্বলীকৃত বিচার সবল হ'লে, তারপক্ষে এটা বোঝা সম্ভবপর। তাই, বিচারকে আত্মার স্থায়ীধর্ম অর্থাৎ স্বরূপ বলে গণনা করা উচিত। অবশ্য, আত্মার এই স্থায়ী ধর্ম কখন কখন দুর্বল ও কখন কখন সবল অবস্থায় থাকে।

দেকার্ৎ নিজে এসব কথা বলেন নি। তবু নীতি, ভ্রান্তি, স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে মত পোষণ করতেন, তা হয়তো উপরিবর্ণিত প্রণালীতে মোটামুটি সমঞ্জসভাবে বোঝা যেতে পারে।

দেকার্তীয় দর্শনের মোদ্দাকথাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানেই সমাপ্ত করছি। এরপর, তাঁর বিভিন্ন মত সম্বন্ধে পরবর্তী দার্শনিকরা যেসব বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত করেছেন. তার কয়েকটির সামান্য আলোচনা করব। এইরূপ অল্প কিছু আলোচনা এর আগেই, বিশেষতঃ সংশয় শীর্ষক অনুচ্ছেদে, করা হয়েছে। ঐ গুলোর পুনরুক্তি করবো না। তবু, একটি বিরুদ্ধ মতের সম্বন্ধে, আরো দুচার কথা বলা আবশ্যক মনে হচ্ছে। অনেকের কাছে এটা খুবই অদ্ভুত লেগেছে যে, 'আমি চিন্তা করছি' এই বিধানটিকে দেকার্ৎ সন্দেহাতীত[1] বলে ভাবলেন, অথচ ২+২=৪ এই বিধানকে তিনি সংশয়ের আওতায় আনতে পারলেন। কিন্তু যদি আমরা লক্ষ্য করি যে, বিধান দুটি অত্যন্ত ভিন্ন শ্রেণীর, তা হ'লে এই অদ্ভুত লাগা কিছু কমে যাওয়ার কথা। প্রথমটি একটি বাস্তবক্রিয়া বা ঘটনা বা অবস্থার বোধক ; অতএব তার সম্বন্ধে সন্দেহ হ'তে পারে ; কিন্তু সন্দেহও একপ্রকার চিন্তা ; তাই, এ স্থলে কোন না কোন রকমের চিন্তার বাস্তবতা অবশ্য-স্বীকার্য। অপরদিকে, 'দুই-যুক্ত-দুই ও চার', এদের

1 Indubitable.

সমতা[1] ও আর চিন্তা নয়। তাই, উক্ত সমতাকে সন্দেহ করলে, এই সমতাকে সন্দেহাতীত বলা যায় না। বরং সন্দেহটিকে এবং সেজন্য চিন্তা পদার্থটিকে সন্দেহাতীত বলা যাবে। আমাদের বক্তব্য এই যে, চিন্তা ও চিন্ত্য, এ দুটির মধ্যে এমন এক আকাশ পাতালের পার্থক্য রয়েছে যে, একটির সম্বন্ধে সন্দেহ করা যুক্তিতঃ[2] অসম্ভব; কিন্তু অপরটির সম্বন্ধে সন্দেহ সে রকমভাবে অসম্ভব নয়; চিন্তাবিষয়ক সন্দেহ হ'লে, চিন্তাই ঐ সন্দেহ দূর করে দেয় এবং চিন্তা যে অস্তিত্ববান্ তা নিশ্চয় পূর্বক বলা যায়; কিন্তু চিন্ত্য-বিষয়ক সন্দেহ ঐ চিন্ত্য পদার্থের দ্বারা দূরীভূত হয় না এবং যতক্ষণ তা যথাযোগ্য অন্য কিছুর দ্বারা দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ ঐ চিন্ত্য পদার্থ যে অস্তিত্ববান্, তার নিশ্চিত জ্ঞান হ'তে পারে না; কারণ, উক্ত সংশয়ের দ্বারাই এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান প্রতিবন্ধ হ'তে বাধ্য।

তাছাড়া, বর্তমানকালে যে-সব দার্শনিক ২+২=৪ এইটিকে সন্দেহাতীত বলে ভাবেন, তাঁরা এইরূপ বিধানকে বৈশ্লেষণিক বলে সাব্যস্ত করেন। আর এঁদের মতে, এ সকল বিধান হচ্ছে ধরে নেওয়া কথার পুনরুক্তি মাত্র এবং এদের সত্যতা শুধু যুক্তি-শাস্ত্রীয়[3], কিন্তু বস্তুগত[4] নয়। দেকার্ৎ কিন্তু এদের সত্যতা বস্তুগত বলেই মনে করেন এবং তদনুসারে তিনি ভেবেছিলেন যে, এদের সত্যতা বাহ্য জগতের স্বরূপের ওপর এবং ঐ জগতে প্রয়োজ্য নিয়মের ওপর নির্ভর করে; কাজে কাজেই, কোন ধারণার অনুরূপ বাহ্য বস্তু আছে কিনা, এই সংশয়ের মতন, গণিতের অনুরূপ বাহ্যবস্তু আছে কিনা, এইরূপ সংশয়ও একইভাবে সম্ভবপর। ঈশ্বরের অস্তিত্ব দ্বারা এই সংশয় দূর হয় কিনা, সে অন্য কথা। বর্তমানকালীন পদার্থ-বিজ্ঞানীদের ভেতর, যাঁরা দেশকে[5] সর্বত্র ও সর্বদিকে বর্তুল বলে মনে করেন, তাঁদের মতে, ইউক্লিড্-সম্মত সরল-রেখার ধারণা অনুযায়ী কোন বাস্তবিক পদার্থ থাকতে পারে না[6]। তাঁদের মতে, রেখামাত্রই বর্তুল বা বক্র হতে বাধ্য; যা সরলরেখা বলে

1 The equality of two-plus-two and four.
2 Logically.
3 Logical.
4 Real.
5 Space.
6 ইউক্লিডের মতে, রেখার দৈর্ঘ্য আছে, কিন্তু প্রস্থ নেই। কিন্তু প্রস্থহীন রেখা আঁকা-ও যায় না, কোথাও দেখা-ও যায় না।

মনে করা হয়, তা আসলে অত্যন্ত বৃহৎ একটি বর্তুল রেখারই অতি ক্ষুদ্র অংশ। এর থেকে, আমরা বেশ বুঝতে পারি যে, দেকার্ৎ দক্ষ গণিতজ্ঞ হওয়াতেই গণিতের ধারণা ও বিধানের অনুরূপ কিছু বাস্তব-জগতে আছে কিনা, তা যে সন্দেহাতীত নয়, তা টের পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে, আরও একটি কথা বিবেচ্য। সম্প্রতিকালীন গণিত-বিষয়ক দার্শনিকদের অধিকাংশেরই অভিমত এই যে, গণিতিক বিধান বাস্তব জগতে প্রয়োজ্য[1] কিনা, তা গণিত বা তর্কশাস্ত্রের বিষয় নয়, তা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ছাড়া নির্ধারণ করা অসম্ভব। যদি তাই হয়, তা হ'লে, গাণিতিক বিধানের সত্যতা অর্থাৎ বাহ্যবস্তুতে তার প্রয়োজ্যতা কি করে সন্দেহাতীত হবে? এই প্রশ্নের অর্থ এমন নয় যে, গাণিতিক বিধান বাস্তব জগতে প্রয়োজ্য নয়। গাণিতিক বিধান যে বাস্তব জগতে প্রয়োজ্য, তা নিশ্চয়ই আধুনিক সভ্য মানুষের অভিজ্ঞতার দ্বারা বিশেষ-ভাবে সমর্থিত। কিন্তু দেকার্তের দার্শনিক সংশয় ত এই অভিজ্ঞতার প্রামাণ্য সম্বন্ধেই। তাঁর প্রশ্ন হচ্ছে, জগৎ ও তাতে প্রয়োজ্যতা, এসবটাই স্বপ্ন নয় ত?

দেকার্তের অপর একটি যুক্তি-ও তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। যুক্তিটি হচ্ছে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে। এটিকে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সাধারণতঃ সত্তা-নির্ণায়ক যুক্তি[2] বলা হয়। সংক্ষেপে আমরা এই যুক্তির বিবরণ আগেই দিয়েছি। যুক্তির মোদ্দা কথাটি এই যে, ঈশ্বরের ধারণা হচ্ছে পূর্ণবস্তুর ধারণা; কিন্তু পূর্ণবস্তুর ধারণার ভেতর সত্তার ধারণা থাকতে বাধ্য; অতএব ঈশ্বরের ধারণা থেকে অনিবার্যভাবে এই সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয় যে, ঈশ্বরের সত্তা আছে; অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন। এর বিরুদ্ধে, কান্ট্ যে-আপত্তি তুলেছেন, তা মোটামুটি বোঝা গেলেও, আপত্তিটিতে তিনি কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন; আর এদের ভেতর অন্ততঃ এক জায়গায় কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের[3] অর্থ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত পণ্ডিতেরা একমত হ'তে পারেন নি। এই পারিভাষিক শব্দ-সমষ্টির সম্বন্ধে পরে কান্ট্-শীর্ষক পরিচ্ছেদে[4] দু এক কথা বলবো। এখন, কান্টের আপত্তিটি বোঝার চেষ্টা করা যাক্।

1 Applicable.

2 Ontological argument.

3 যথা, Existence is not a predicate.

4 এই পরিচ্ছেদটি বর্তমান পুস্তকে সমাবিষ্ট হয় নি।

কান্টের বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরের ধারণা থেকে যদি তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যেতো, তা হলে, 'একশ টাকার' ধারণা থেকে 'একশ টাকার' অস্তিত্বও প্রমাণিত হতো। এর বিরুদ্ধে, হয়ত বলা হবে যে, 'একশ টাকার' ধারণার ভেতর অস্তিত্ব সমাবিষ্ট নয়; কাজে কাজেই, ধারণা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এর জবাবে, কান্ট্ বলবেন, তাহলে কি "অস্তিত্ববান্ একশ টাকার ধারণা" থেকে একশ টাকার অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে? যদি এটা সম্ভবপর হ'ত, তা হ'লে, কপর্দকহীন ব্যক্তি তা'র পকেটে 'একশ টাকা আছে' এইরূপ ধারণা তৈরি করে, নিজের পকেটে হাত দিয়েই, একশ টাকা পেয়ে যেত। আসলে, কোন পদার্থের ধারণা থেকে ঐ পদার্থের শুধু সম্ভবপরতাই[1] জানা যায়, কিন্তু বাস্তবতা বা অস্তিত্ব জানা যায় না; ধারণার দিক থেকে বিচার করলে, "অস্তিত্ববান সাদা টেবিলের ধারণা" আর "সাদা টেবিলের ধারণা", এ দুটি ধারণার কোন পার্থক্য নেই[2]। ধারণার বিষয়ীভূত যে অস্তিত্ব, তা সম্ভবপর অস্তিত্বমাত্র, বাস্তব অস্তিত্ব নয়। প্রকৃতপক্ষে, 'সম্ভবপর অস্তিত্ব' মানে সম্ভবপরতা। সাক্ষাৎ অনুভব ছাড়া, ধারণার বিশ্লেষণ দ্বারা ধারণার সীমা অর্থাৎ সম্ভাবনার গণ্ডি অতিক্রম করে বাস্তবতার রাজ্যে প্রবেশ অসম্ভব। ঈশ্বরের ধারণা থেকে তাঁর অস্তিত্বের ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।[3]

সত্তা-নির্ণায়ক যুক্তির এই কান্টীয় নিরাকরণ বিশেষভাবে এন্‌সেল্‌ম্-প্রদত্ত যুক্তিটির সম্বন্ধেই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। অবশ্য, 'ক্রিটিক অব্ পিয়োর রীজনে'র যে-জায়গায় এই নিরাকরণ রয়েছে, সেখানে কান্ট্ দেকার্তের নামই উল্লেখ করেছেন; এবং একথাও ঠিক যে, দেকার্তের যুক্তির মোদ্দা কথাটি এনসেল্‌মের যুক্তিতেও রয়েছে। তবু, দেকার্তের যুক্তিতে আরো এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে, যা কান্টের বক্তব্য, অন্ততঃ সাক্ষাৎভাবে, স্পর্শ করে না। প্রথমেই লক্ষ্য করার মতন জিনিষ এই যে, দেকার্তের মতে, ঈশ্বরের ধারণা হচ্ছে সহজাত অন্তর্নিহিত

1 Possibility.

2 কারণ, প্রথম ধারণাটির যথার্থতা যে-রকম অস্তিত্ববান সাদা টেবিলের ওপর নির্ভর করে, দ্বিতীয় ধারণাটির যথার্থতাও সেরকম অস্তিত্ববান্ সাদা টেবিলের ওপরই নির্ভর করে—উভয় ধারণারই অনুরূপ (corresponding) পদার্থটি হচ্ছে অস্তিত্ববান্ সাদা টেবিল।

3 *Critique of Pure Reason,* tr. by N. K. Smith পৃঃ ৫০০-৫০৭.

ধারণা[1]—এটি ইন্দ্রিয়-সংবেদন জনিতও নয়, আর এটিকে আমি নিজে তৈরিও করিনি। এটি হচ্ছে একটি প্রাক্-সিদ্ধ ধারণা[2]। আমাদ্বারা অথবা মদতিরিক্ত কিছুর দ্বারা জনিত ধারণার সম্বন্ধে কান্ট্-এর এই অভিমত অবশ্যস্বীকার্য যে, এরকম ধারণা থেকে, ঐ ধারণার বিষয়ীভূত পদার্থের অস্তিত্ব তর্কশাস্ত্রীয় নিয়মে নিগমিত হয় না। কিন্তু পূর্ণবস্তুর অস্তিত্ব তার ধারণা থেকে নিঃসরণ করা অযৌক্তিক নয়। কান্ট জিজ্ঞেস করতে পারেন, ঈশ্বরের ধারণা যে সহজাত ও অন্তর্নিহিত, এর প্রমাণ কি? দেকার্তের তরফে প্রতি-প্রশ্ন হবে, কান্ট্ যে মানবীয় বস্তু-জ্ঞানের নিয়ামক রূপে বৌদ্ধিক প্রকার নামক[3] মনের কতকগুলো স্বাভাবিক, ক্রিয়াপ্রবণ, সার্বিক ও প্রাক্-সিদ্ধ বিধারণা[4] এবং নিয়ম স্বীকার করেছেন, তার সমর্থনে প্রমাণ কি? কান্ট নিশ্চয়ই বলবেন যে, তাঁর ক্রিটিক নামক গ্রন্থের সবটাই এর সমর্থনে লেখা হয়েছে। কিন্তু একইভাবে দেকার্ত ও বলতে পারেন যে, ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে তাঁর যে অভিমত, তার সমর্থনে তিনিও কিছু যুক্তি দিয়েছেন। এর কয়েকটির সামান্য সমালোচনা কান্টের লেখায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সবগুলোর নয়। তার ভেতর একটি যুক্তি এই যে, ঈশ্বরের অর্থাৎ যে-বস্তু সব দিক থেকে পূর্ণ, তার ধারণা আমি নিজে তৈরি করতে অসমর্থ। সীমিত বস্তুকে কল্পনায় বাড়িয়ে, সীমিতের নিষেধ বা অভাবরূপে অসীম অথবা অনন্ত বস্তুর ধারণায় উপনীত হওয়া অসম্ভব। অনন্তের ধারণাকে সান্তের ধারণার পূর্ববর্তী বলতে হবে। কারণ, পূর্ণের বা অসীমের ধারণা মনের সামনে না রাখলে, আমি নিজের বা মদতিরিক্ত বস্তুর অপূর্ণতা বুঝতে পারি না। ঈশ্বরের ধারণা যে প্রথম থেকেই আমার মনে রয়েছে এর সমর্থনে এই যুক্তিটিকে নিশ্চয়ই অবহেলা করা যায় না। আপত্তি হবে, ঈশ্বরের ধারণা সহজাত ও অন্তর্নিহিত হ'তে পারে, কিন্তু তাই বলে, তাকে যথার্থ বলে গ্রহণ করা, অর্থাৎ এই ধারণার বিষয়ীভূত পদার্থটি যে অস্তিত্ববান, তা স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হবে না; কারণ, ধারণার স্ব-প্রকাশত্ব বশতঃ তার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় থাকলেও, ধারণার বিষয়ীভূত পদার্থের সাথে ত আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই; অনুমানেও ঐরূপ পদার্থের অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা

1 Innate idea.
2 *A priori* idea.
3 Categories of the understanding.
4 Concept.

যায় না, কারণ, স্বাপ্ন ধারণার অনুরূপ পদার্থ যে নেই, এটা সর্ববাদি-সম্মত। এই আপত্তির উত্তরে, দেকার্ৎ "স্পষ্টতা ও বিবিক্ততা" যে ধারণার সত্যতা নির্ণায়ক চিহ্ন, এইটি হয়ত কাজে লাগাবেন। ধারণার সত্যতা-নির্ণায়ক এই চিহ্নটি যে যথার্থ, তা আগেই "আমি চিন্তা করছি, অতএব আমি আছি" এই স্ব-প্রকাশ চিন্তার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে।

কিন্তু এইভাবে ঈশ্বর-সিদ্ধি হয় কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। সাক্ষাৎ অনুভব ও যৌক্তিক নিঃসন্দিগ্ধতার সাহায্যে মৎস্থ চিন্তা বা ধারণার অস্তিত্ব আমার কাছে প্রমাণিত হয় বটে, তথাপি তার দ্বারা এই চিন্তাতিরিক্ত কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। চিন্তা বা ধারণার স্পষ্টতা ও বিবিক্ততা এখানে নিষ্ফল। কারণ, অনেক স্থলে, দেখতে পাওয়া যায় যে, যতক্ষণ ভ্রান্তি বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ ভ্রান্ত ধারণাটি স্পষ্ট ও বিবিক্ত বলেই প্রতিভাত হয়। একথা অবশ্য ঠিক যে, "আমি চিন্তা করছি, অতএব আমি আছি" এই চিন্তার প্রামাণ্য সন্দেহাতীত, আর এটি স্পষ্ট ও বিবিক্তও বটে। কিন্তু এর থেকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে নিঃসৃত হয় না যে, যে যে চিন্তা স্পষ্ট ও বিবিক্ত, সেই সেই চিন্তাই যথার্থ। 'চিন্তা করছি' এই চিন্তার দ্বারা এই সার্বিক নিয়মের সমর্থন হয়, দেকার্ৎ এরকম বলেছেন বটে, তবু এতে তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল বলে মনে হয় না। আস্থা থাকলে, তিনি ঈশ্বরের অপ্রবঞ্চকতা দিয়ে এই সার্বিক নিয়মের যথার্থতা প্রমাণ করতে যেতেন না। বরং, ঈশ্বরকে টেনে না এনে, সরাসরি ধারণার স্পষ্টতা ও বিবিক্ততা দিয়েই জড়বস্তুর ও মদতিরিক্ত অন্যান্য চেতন আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় বলে স্বীকার করতেন। এমন কি সত্তা-সম্বন্ধীয় যুক্তি অথবা কার্য-কারণীয় যুক্তি প্রয়োগ না করে, ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণার স্পষ্টতা ও বিবিক্ততা দিয়েই ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণ করতেন।

দেখা যাক, ঈশ্বর-সিদ্ধির ব্যাপারে কার্যকারণীয় যুক্তির জোর কতখানি। কার্যকারণীয় যুক্তিটি এই যে, পরিপূর্ণবস্তুর ধারণা আমার মতন অপূর্ণ জীব তৈরি করতে অসমর্থ, আর কোন জড়বস্তুও এই ধারণার উৎপাদক হ'তে পারে না; কারণ, জড়বস্তু চৈতন্যের অভাব বশতঃ অপূর্ণ, অতএব পূর্ণ চেতন ব্যক্তিই এই ধারণার জনক; আর ঐ চেতন ব্যক্তিরই নাম হচ্ছে ঈশ্বর।

এই যুক্তির দ্বারা নিশ্চিত ভাবে ঈশ্বরসিদ্ধি হয় কি? যাদের প্রথম থেকেই ঈশ্বরে কিছু বিশ্বাস আছে, হয়ত, এই যুক্তিতে তাদের বিশ্বাসের দুর্বলতা কিছু কমে যায়। কিন্তু অবিশ্বাসীর কাছে, এই যুক্তি পঙ্গু বলেই প্রতিভাত হবে। অপূর্ণ জীব কি তার অভিজ্ঞতার সাহায্যে পূর্ণের কল্পনাও

করতে পারে না ? সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা নিশ্চয়ই বিবিধগুণের অন্ততঃ মাত্রাগত তারতম্যের সাথে পরিচিত হই। কোন কোন স্থলে, আমাদের ধারণা অনুযায়ী পূর্ণতার সাথেও আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। অমুকের বেশী বুদ্ধি, তমুকের রসবোধ কম, এই চাকাটি পুরোপুরি গোল নয়, এইটি সম্পূর্ণ গোল, এই গাছটি ঐ গাছটির থেকে বেশী উঁচু, এইভাবে ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ভিত্তিতেই ধর্মবিশেষের পূর্ণতা এবং তরতমভাবে বিবিধ পদার্থের অল্পতা ও বৃহত্ত্বের জ্ঞান আহরণ বেশ স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। সুতরাং সর্ববিষয়ে পূর্ণতা ও সর্বাপেক্ষা বৃহতের কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে কেন ? যদি ধরেও নিই যে, পূর্ণের ধারণা হচ্ছে সহজাত ও অন্তর্নিহিত, তা হলেও, এই ধারণা অনুযায়ী পূর্ণ বস্তু যে আছে, সে সম্বন্ধে দেকার্তীয় পাদ্ধতিক[1] সংশয় হ'তে বাধা কোথায় ? কিন্তু এই সংশয়ের ফলে, 'আমি চিন্তা করছি' এই স্থলের ন্যায়, কোন স্ব-বিরোধ দেখা যায় কি ? যদি দেখা না যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, এই সংশয় দুরতিক্রম্য। তাই, যুক্তি দিয়ে ঈশ্বর-সিদ্ধি হয় না, কান্টের এই উক্তি অবশ্যস্বীকার্য বলেই মনে হয়।

সমপ্রতিকালীন বিশ্লেষণবাদী দার্শনিকরা দেকার্ৎ-প্রদত্ত দ্রব্যের লক্ষণ ও ঐ লক্ষণ-যুক্ত পদার্থগুলোর সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি দ্রব্যের যে লক্ষণ দিয়েছেন, তা এই :—যে পদার্থ নিজের অস্তিত্বের জন্যে অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করেনা, তাই দ্রব্য। প্রশ্ন হচ্ছে, এই লক্ষণটি কি প্রাক্-সিদ্ধ[2] ? যদি তাই হয়, তাহলে এই লক্ষণ যে বাস্তব-জগতে অবশ্য-প্রয়োজ্য, তার প্রমাণ কি ? দেকার্ৎ এমন কোন প্রমাণ দিয়েছেন বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালে কান্ট কয়েকটি প্রাক্-সিদ্ধ বৌদ্ধিক প্রকার[3] মেনে, সেগুলো যে মানবীয় জ্ঞানের বিষয়ে অবশ্য-প্রয়োজ্য, তার একটি জ্ঞানাতিগ[4], সমর্থন দিয়েছিলেন। কিন্তু দেকার্ৎ সে রকম কিছু করেন নি। দেকার্ৎ হয়ত বলবেন, বাস্তব জগতে এই লক্ষণযুক্ত পদার্থ যে আছে, তা পর্যবেক্ষণ ও বিচারের দ্বারাই জানা যেতে পারে। তাহলে কিন্তু লক্ষণটিকে প্রাক্-সিদ্ধ না বলে পশ্চাৎ-সিদ্ধ[5] বলাই সঙ্গত হবে। অর্থাৎ বলতে হবে যে,

1 A methodical doubt.
2 *A priori.*
3 Categories of the understanding.
4 Transeendental.
5 *A posteriori.*

বাস্তব জগতে দ্রব্য নামক পদার্থ রয়েছে ; এবং পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন, নিষ্কাশন প্রভৃতির[1] দ্বারা দ্রব্যের এই লক্ষণটি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু যা নিজের অস্তিত্বের জন্যে অন্যকিছুর ওপর নির্ভর করে না, এমন কোন পদার্থ পর্যবেক্ষণে পাওয়া যায় কি ? যদি কেউ এমন পদার্থে পর্যবেক্ষণলব্ধ বলে মনে করে, তাহ'লে সহজেই এই আপত্তি উঠবে যে, ঐরূপ পদার্থ আমাদের অজ্ঞাতসারে অন্য পদার্থের ওপর হয়ত নির্ভর করে, এ রকম সংশয় হ'তে কিছুমাত্র বাধা নেই। বস্তুতঃ, হেগেল প্রমুখ কোন কোন দার্শনিকের মতে, বিশ্বে এমন কোন বস্তু নেই, যা অন্য প্রত্যেকটি বস্তুর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে[2] সংবদ্ধ নয়, আর এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, সম্বন্ধীগুলোর একটিও না থাকলে, বাকি সবগুলোই নাই হয়ে যাবে। এই মতটি অভ্রান্ত কিনা, তা বলা কঠিন। তবু, দ্রব্যসম্বন্ধে দেকার্তীয় মত যে সন্দেহাতীত নয়, শুধু এইটুকু দেখাবার জন্যই, এখানে হেগেলীয় মতটির উল্লেখ করা হ'ল। পদার্থ-বিজ্ঞানীরাও তাদের পরীক্ষা-লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে বলবেন যে, বিশ্বের প্রত্যেকটি অংশ অন্য প্রত্যেক অংশের সাথে সম্বদ্ধ কিনা, তা নির্ধারণ করতে না পারলেও, এই অংশগুলো যে বিবিধ কার্যকারণীয় সম্বন্ধে পরস্পরের সাথে সম্বদ্ধ, তা প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

একটু বিচার করলে, বোঝা যাবে যে, উপরি-বর্ণিত সমালোচনা কিছু পরিমাণে অপ্রাসঙ্গিক। দেকার্ৎ যে-ভাবে তাঁর লক্ষণটি ব্যবহার করেছেন, তাতে প্রতিভাত হবে যে, এই লক্ষণটি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য-ব্যক্তির লক্ষণ নয়, কিন্তু এটি হচ্ছে পরস্পর থেকে ভিন্ন জাতীয় দু-রকম দ্রব্যের লক্ষণ। বিশ্বের পদার্থ সকল পর্যবেক্ষণ করে, দেকার্তের প্রাতিভ অন্তর্দৃষ্টি[3] মূলতঃ শুধু দুই শ্রেণীর দ্রব্য দেখতে পেয়েছিল। এই দুই শ্রেণীর দ্রব্য হচ্ছে চেতন ও জড়। এই দুই শ্রেণীর পদার্থ কেন দ্রব্য নামের যোগ্য হ'ল, এর হেতুও তিনি ভেবেচিন্তে বার করলেন। হেতুটি এই যে, এরা স্বাস্তিত্বের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করে না। এর অর্থ শুধু এই যে, চেতন দ্রব্য নিজের অস্তিত্বের জন্যে জড়ের ওপর অবলম্বন করে না ; তেমনি, জড় দ্রব্যও স্বাস্তিত্বের জন্য চেতন দ্রব্যের ওপর নির্ভর করে না। আর জড় দ্রব্য মূলতঃ শুধু একটি। গ্রহ, নক্ষত্র থেকে আরম্ভ করে, অণু পর্যন্ত জড়-

1 Observation, inspection, abstraction, etc.
2 Integrally.
3 The insight of a genius.

ব্যক্তিগুলো একই জড়দ্রব্যের রকম বিশেষ।[1] দেকার্তের মতে, একই জড় দ্রব্যের এই রকমগুলো এবং তাদের বিশেষ বিশেষ ধর্মগুলো দ্রব্য নামের যোগ্য নয়; কারণ, এদের অস্তিত্ব ঐ একই জড়দ্রব্যের ওপর নির্ভর করে। জড়-দ্রব্যের এই বিশেষ বিশেষ রকমগুলো নিশ্চয়ই কার্যকারণ ও বিভিন্ন দৈশিক ও কালিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ; আর জড়-বিজ্ঞান এগুলোর আবিষ্কারে উদ্যোগী। দেকার্ৎ এমন কথা বলতে চান না যে, বিশ্বের পদার্থগুলো পরস্পরের সাথে সম্বদ্ধ নয়। তিনি শুধু এটাই বলতে চান যে, জড়-দ্রব্য এবং চেতন-দ্রব্য পরস্পরের সাথে একেবারেই অসম্বদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন চেতন-ব্যক্তিরাও কি একই চেতন দ্রব্যের রকম বিশেষ? খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী দেকার্ৎ সেরকম মনে করতেন না। তাঁর মতে, আমি, তুমি, রাম, শ্যাম প্রভৃতি প্রত্যেক চেতন-ব্যক্তিই দ্রব্য নামের যোগ্য। এক চেতনের অস্তিত্ব অন্য চেতনের ওপর অথবা জড়দ্রব্যের ওপর নির্ভর করে না। তাই, ওরা প্রত্যেকেই দ্রব্য। জড় দ্রব্যকে যেমন দেকার্ৎ মূলতঃ এক বলে মেনেছেন, চেতন দ্রব্যকে সেভাবে এক বলে ভাবেন নি। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন আত্মার প্রত্যেকটিই যে দ্রব্য, এরা যে একই চেতন দ্রব্যের প্রকার বিশেষ নয়, এ সম্বন্ধে দেকার্ৎ কোন আলোচনা করেন নি। এটা তিনি প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিলেন। অথবা বলা যায় যে, বহু আত্মায় আমাদের যে সাধারণ বিশ্বাস, তা ঈশ্বরের অপ্রবঞ্চকতা দিয়ে সমর্থিত হয়।

জড় ও চেতনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে পরস্পর-নিরপেক্ষ অর্থাৎ ঐ দুয়ের ভেতর কার্যকারণীয় সম্বন্ধ থাকতে পারে না, এই দেকার্তীয় মতের ভিত্তি কি? মতটি শুধু দেকার্তের নয়। নানা দেশে ও নানা কালে বহু দার্শনিক এই মত সমর্থন করেছেন। ভারতবর্ষে সাংখ্য, যোগ ও কোন কোন বেদান্ত সম্প্রদায় জড় ও চেতনের অত্যন্ত বৈলক্ষণ্যের কথা বলেছেন। এই মতটিও হয়তো প্রাতিভ অন্তর্দৃষ্টির ফল। অবশ্য, প্রাতিভ দৃষ্টিতে সত্যাংশ ধরা পড়লেও তাতে অবিচার-সিদ্ধ কল্পনার মিশ্রণ থাকা অসম্ভব নয়। জড়-চেতনের এই অত্যন্ত নিরপেক্ষতা বোঝানের জন্য, দেকার্তের যুক্তি এই যে, জড়ের মূল ধর্ম হচ্ছে বিস্তৃতি, আর চেতনের মূলধর্ম হচ্ছে জ্ঞান বা চৈতন্য; কিন্তু এই ধর্ম দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ, অর্থাৎ ইচ্ছা, সুখ প্রভৃতি চেতন অবস্থাগুলোকে বিস্তৃত, লম্বা, মোটা প্রভৃতি বলা যায় না; আবার জড়-

1 Modes.

কণা, ঘট, পট প্রভৃতির চৈতন্য আছে, অথবা সুখাদি চেতন অবস্থা আছে, এরকম বলা যায় না। সংক্ষেপে, যা চেতন তা বিস্তৃত নয়, যা বিস্তৃত, তা চেতন নয়; এবং এমন কোন বস্তু নেই, যা চেতন ও বিস্তৃত দুই-ই। দেকার্ৎ মাঝে মাঝে এমন কথাও বলেছেন যে, জড় ও চেতনের কোন সাধারণ ধর্ম নেই। দ্রব্যত্ব কি তাদের সাধারণ ধর্ম নয়? কিন্তু সাধারণ ধর্ম বলতে, দেকার্ৎ হয়তো ভাবাত্মক সাধারণ ধর্ম বোঝেন। দ্রব্যত্ব মানে তো অন্য-সাপেক্ষতার অভাব। তবু, জড় ও চেতনের কোন ভাবাত্মক সাধারণ ধর্ম নেই, এটাই হয়ত তাঁর বক্তব্য। এই কথাটিও আক্ষরিক অর্থে বুঝলে, ভুল করা হবে। কারণ, দেকার্তের মতে, চেতন দ্রব্যের সংখ্যা বহু, জড়-দ্রব্যের সংখ্যা এক; অতএব সংখ্যাকে এদের একটি ভাবাত্মক ধর্ম বলতে হবে। তেমনি, দেকার্তের মতে, জড় ও চেতন উভয়েই ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ, তাই, ঈশ্বরকর্তৃকত্ব এদের সাধারণ ধর্ম; তাছাড়া, জ্ঞেয়ত্বকেও এদের সাধারণ ধর্ম বলতে হবে। বলা বাহুল্য যে, এ সকল পল্লবগ্রাহী আপত্তি উঠবে না, এরকমভাবে দেকার্তের মূল বক্তব্যটি কিছু ভিন্ন ভাষায় বলা অসম্ভব নয়।

মন ও শরীর এ দুটি পদার্থ যে বহুলাংশে ভিন্ন শ্রেণীর, এই মতের সপক্ষে অনেক কিছু বলার আছে। আমরা সাধারণতঃ মনের কোন দৈশিক ধর্ম স্বীকার করি না। একজনের মন আরেক জনের মনের চেয়ে বেশী বড়, অথবা তোমার মনটি গোল, আর আমার মনটি ত্রিকোণ, এইরূপ বাক্য নিরর্থক বলে মনে হবে। তবু, অধিকাংশ লোক মনে করে যে, প্রত্যেকটি মন এক-একটি শরীরের সাথে সংবদ্ধ। আর শরীরের নিশ্চয়ই দৈশিক বিস্তার, অবস্থান প্রভৃতি আছে। একইভাবে, জড়বস্তুকেও মনের ধর্মযুক্ত ভাবা কঠিন। কারণ, আমার কলমটির কোনরকম যন্ত্রণা হচ্ছে কিনা, এইরূপ আলোচনা হাস্যাস্পদ নয় কি? তবু, এরকম উক্তিকে একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ বলে গ্রহণ করা চলে না। কোন কোন দার্শনিক বলেছেন যে, জড়বস্তুরও অত্যন্ত ক্ষীণমাত্রায় সংবেদন রয়েছে; আর এই ক্ষীণ সংবেদন থেকেই উৎক্রান্তির[1] উঁচু ধাপে চিন্তা বা বিচার অভিব্যক্ত হয়েছে; পাথরের-ও ক্ষীণ সংবেদনের লেশ আছে বললে, হয়তো আবোল-তাবোল মনে হবে না। অধিকন্তু, যদি বিশ্বের সর্ব পদার্থ মন ও জড়বস্তু, শুধু এই দুটি শ্রেণীতে বিভাগ-যোগ্য হয়, এবং জড়ের

1 Evolution.

অসাধারণ ধর্ম বিস্তৃতি হয়, তাহ'লে সংগীত, কাব্য প্রভৃতি পদার্থগুলোর বিস্তার নেই বলে, তাদের মন বলে ভাবা ঠিক হবে কি? হয়তো দেকার্ৎ বলবেন যে, সংখ্যা, সংগীত প্রভৃতি পদার্থগুলো মানসিক পদার্থ। কিন্তু সংখ্যা, সংগীত প্রভৃতি পদার্থগুলো মনোজনিত হলেও, এগুলো সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতির মতন নিশ্চয়ই মনের অবস্থা নয়।

এ রকম প্রশ্নও দার্শনিকরা তুলতে পারেন যে, জড়-বস্তুর বিস্তৃতি মানতেই হবে, এমন কি কথা? লাইবনিজ ভেবেছিলেন যে, প্রকৃত জড় বস্তুর বিস্তৃতি নেই, অবশ্য, তার ওজন আছে। এর বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে যে, ওজন-ওয়ালা জড়বিন্দুর দৈশিক অবস্থান নেই, এরকম কল্পনা করা দুরূহ। তাছাড়া, শুধু দৈশিক ধর্ম দিয়েই জড়বস্তুর ধারণা হ'তে পারে কি? যে জড় বস্তুর রূপ, রস গন্ধ প্রভৃতি নেই, তা কি ভাবা যায়?

অপরদিকে, এটাও ভেবে দেখতে হবে যে, সচেতনতাকে মনের স্বরূপ-ধর্ম বলা যায় কিনা। ফ্রয়েডের গবেষণার পরে, হয়তো এরকম কথা আজকাল সর্বজনমান্য হবে না। ফ্রয়েড্ নিশ্চয়ই দেখাতে পেরেছেন যে, অচেতন বিশ্বাস, অচেতন চিন্তা প্রভৃতি কথাগুলো মনকে বুঝবার জন্য অত্যাবশ্যক। অবশ্য, এটা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে, সচেতনতাকে মনের একটি অমোঘ চিহ্ন বলে না মেনে উপায় নেই। সচেতনতা মনের স্বরূপ বা নিত্যধর্ম না হ'লেও এই অর্থে তাকে মনের লক্ষণ বলা যায় যে, সচেতনতা শুধু মনেরই ধর্ম হতে পারে, জড়ের নয়।

৪. শরীর ও মনের সম্বন্ধ

চেতন ও জড়ের অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য মেনে নিয়েও, দেকার্ৎ স্পষ্টভাষায় এটাও স্বীকার করেছেন যে, জীবন্ত মানুষ হচ্ছে চেতন আত্মা ও জড়দেহ, এই দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ দ্রব্যের মিলন। কিন্তু মানুষের কাছে এই মিলন অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ বলে প্রতিভাত হয়। উক্ত অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য অক্ষুণ্ণ রেখে, মন ও শরীরের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব বলে মনে হয়। কারণ, দেকার্ৎ এমন কথা বলতে পারেন না যে, আমার মন আমার শরীরের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত; কেন না, তাঁর মতে, মনের কোন রকম দৈশিক ধর্ম নেই। তথাপি, দেকার্ৎ এরকমও

বলেছেন যে, মন ও শরীরের ভেতর কার্যকারণীয় সম্বন্ধ রয়েছে—মনের বিশেষ বিশেষ অবস্থার দ্বারা শরীরের পরিবর্তন ঘটতে পারে, আবার শারীরিক অবস্থার দ্বারা মনের অবস্থান্তর ঘটতে পারে। কিন্তু দেকার্তের অনুযায়ীরা এবং হয়তো দেকার্ৎ নিজেও এইরূপ বিশ্বাস করতেন যে, মন এবং শরীর এই দুটি পদার্থ এত বিসদৃশ যে, তাদের ভেতর কার্যতা বা কারণতার সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব। এরকম বিশ্বাসের মূল কারণ কি? হয়তো তারা ভেবেছিলেন, মনের ধর্মের পরিবর্তনগুলো শরীর-ধর্ম থেকে এত ভিন্নরকমের যে, তাদের ভেতর কার্য-কারণীয় সম্বন্ধ থাকতে পারে না। এই বিশ্বাসটি একেবারে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। দেকার্ৎ ভেবেছিলেন যে, শরীর হচ্ছে প্রধানতঃ এমন একটি যন্ত্র, যার সাহায্যে মনের কাছে কতকগুলো চিহ্নের মাধ্যমে বাহ্যজগতের খবর পৌঁছিয়ে দেওয়া যায় এবং মনের ইচ্ছা প্রভৃতি অন্য মনের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু দেকার্ৎ এটাও বলেছেন যে, শরীরে যখন কোন আঘাত লাগে, তখন তার জন্য আমি চেতন আত্মারূপে বেদনা-বোধ করতে পারি না ; কারণ, আমি হচ্ছি শুদ্ধ চেতন পদার্থ ; তাই আমি ঐ আঘাতটি আমার বিশুদ্ধ বৌদ্ধিক ক্রিয়ার দ্বারা শুধু প্রত্যক্ষ করতে পারি। অনেকে ভাবেন যে, বাহ্যবস্তু মনে সংবেদন ঘটায়। এরূপ মানলে, দেকার্তের শরীর ও মন বিষয়ক কিছু সমস্যার সমাধান হতে পারত ; কিন্তু যেহেতু তাঁর মতে, মনের স্বরূপ হচ্ছে বিচারবুদ্ধি, তাই সংবেদনকে তিনি মনের ধর্ম বলে স্বীকার করতেন না। তা হ'লে, শরীর ও মনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বলে কি কিছু নেই? দেকার্ৎ কিন্তু এরকম একটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধও মেনেছেন। এই সম্বন্ধটি হচ্ছে মন শরীরকে প্রত্যক্ষ করছে, এইরকম সম্বন্ধ ; আর সংবেদন ও কল্পনা শরীরের ধর্ম হ'লেও, যেহেতু মন শরীরকে প্রত্যক্ষ করে, তাই সে সংবেদন ও কল্পনাকেও প্রত্যক্ষ করে। মনে রাখা দরকার যে, মন সমগ্র শরীরকে নয়, কিন্তু একমাত্র মস্তিষ্ককেই প্রত্যক্ষ করতে পারে। এতে কিন্তু একটি সমস্যা থেকেই গেল : শরীর ও মন যদি পরস্পর থেকে অত্যন্ত বিলক্ষণ হয়, তা হ'লে, মন শরীরের একটি বিশেষ অংশকে প্রত্যক্ষ করতে পারে, এটাই বা কি করে সম্ভবপর হয়?

দেকার্তের মতে, বিষয়ের জ্ঞান দুই রকমের হ'তে পারে। প্রথমতঃ, বৌদ্ধিক জ্ঞান—এতে বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে আমাদের মনে কিছু বিশ্বাস উৎপন্ন হয় ; দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান—এতে মন সাক্ষাৎভাবে কোন কোন

জড়বস্তুকে জানে। আর দুঃখের সংবেদন, রূপরসাদির সংবেদন এবং এদের স্মরণ ও কল্পনাতেও এই রকম সাক্ষাৎজ্ঞান হয়।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, দেকার্ৎ শরীর ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে কোনরকম সন্তোষজনক মতে উপনীত হতে পারেন নি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই বিষয়ে কোন সন্তোষজনক মতই আজ পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় নি।

দেকার্তের দার্শনিক চিন্তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সামান্য আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করছি। এখন আধুনিক দর্শনে, তাঁর স্থান কি, সে সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা হ'বে। আগেই কয়েকবার বলে এসেছি যে, দেকার্ৎকে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক বলা হয়, আর আমাদের মতে, এর সর্বাপেক্ষা যোগ্য হেতু এই যে, দর্শনে তিনিই সর্বাগ্রে সুস্পষ্টভাবে সংশয়-পদ্ধতি ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন, এবং তা কাজেও লাগিয়েছেন। দেকার্তের আগে, এবং প্রাচীন গ্রীক দর্শনের পরবর্তীকালে, বিশেষতঃ মধ্যযুগীন ইউরোপে, যাঁরা দর্শন-চর্চা করতেন, তাঁরা সাধারণতঃ এরিষ্টটলের মত ও বাইবেলকে স্বতঃ-প্রমাণ বলে ধরে নিয়ে, শুধু তারই ব্যাখ্যা ও আলোচনাতে ব্যাপৃত থাকতেন। কিন্তু দেকার্ৎ বুঝতে পেরেছিলেন যে, দর্শনের কাজ ঠিক ঠিকভাবে করতে হলে, প্রথমতঃ মন থেকে সর্বপ্রকার বিনাবিচারে গৃহীত বিশ্বাস, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য, সরিয়ে দিতে হবে; আর শুধু তখনই সংস্কারমুক্ত মনে স্বাধীন যুক্তি-বিচারের দ্বারা যাচাই করে, তত্ত্ব-নির্ধারণ সম্ভবপর হবে। প্রকৃত দার্শনিকের এটাই হচ্ছে ফলপ্রদ কাজ। যে সকল ধারণার সাহায্যে বিচার চালাতে হবে, সেগুলো, সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও বিবিক্ত হওয়া দরকার। অস্পষ্ট ধারণা পরিত্যাগ করে, দর্শনকে বিচারাত্মক প্রজ্ঞার শরণ নিতে হ'বে। আর তা করতে পারলে, দেকার্ৎ ভেবেছিলেন যে, মধ্যযুগীন খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের চিন্তাজাল থেকে তিনি দর্শনের বিমুক্তি ঘটাতে পারবেন। দর্শনে এই স্বাধীন চিন্তার প্রস্তাব, তার আচরণ ও অন্ততঃ কিছু সফলতালাভ এবং যুক্তি-সমর্থিত মোটামুটি সর্বাঙ্গ-সমন্বিত একটি বিশিষ্ট দর্শনের রচনা, এগুলো দিয়ে দেকার্ৎ দর্শনে বস্তুতঃই একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠা করলেন। কারণ, দার্শনিক বিচারের এই প্রস্তাবিত যৌক্তিক পদ্ধতি আধুনিক যুগের অধিকাংশ চিন্তকই মেনে নিয়েছেন। তাছাড়া, সম্ভবতঃ দেকার্ৎই সর্বপ্রথমে দার্শনিক বিচারের জন্য একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির আবশ্যকতা উপলব্ধি করে, তার একটি মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর পরবর্তীকালে, স্পিনোজার

জ্যামিতীয় পদ্ধতি, কাণ্ট্-এর অনুভবাতিগ পদ্ধতি[1], হেগেলের দ্বন্দ্বাত্মক পদ্ধতি[2], হুস্রেল্-এর ভান-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি[3] প্রভৃতির নাম দর্শনের ইতিহাসে দেখা দেয়। এসব পদ্ধতির তুলনায়, দেকার্তের পদ্ধতিটিকে হয়ত সংশয়-পদ্ধতি বলা সংগত হবে।

দ্বিতীয়তঃ, দেকার্ৎ আমাদের চিন্তার এমন একটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, যা তাঁর আগে অন্য কেউ এ রকম স্পষ্টভাবে করেনি। এটা হচ্ছে চিন্তার স্ব-প্রকাশত্ব বা স্ব-সংবেদন ; আর এই স্ব-প্রকাশ চিন্তাকেই তিনি স্বয়ংসিদ্ধ অহম্, আত্মা বা মনের স্বরূপ বলে তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের সামনে রাখলেন। ইউরোপে এইটি প্রায় সম্পূর্ণ নতুন ধরণের কথা। প্রাচীন দার্শনিকরা যেন আত্মার এই স্ব-সংবেদনের দিকটিকে একেবারেই অবহেলা করে গেছেন। আর দেকার্ৎ-প্রদর্শিত এই দিকটি আধুনিক কয়েকজন বিখ্যাত দার্শনিকের বিশেষ কাজে লেগেছে। উদাহরণ স্বরূপ, হেগেল তাঁর দর্শনেতিহাসে[4] বলেছেন যে, মানুষের চৈতন্য বা চিন্তাকে দার্শনিক বিচারের মূল উৎস বলে স্বীকার করে দেকার্ৎ দর্শনের রাজ্যে বিপ্লব এনেছেন ; হুস্রেলের মতে, দেকার্ৎ-কৃত "পদ্ধতি-বিষয়ক চিন্তা" নামক গ্রন্থটি দার্শনিক বিচার পদ্ধতির ইতিহাসে একটি সম্পূর্ণ নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে—দর্শনের প্রকৃত আরম্ভ হচ্ছে আত্মাতিরিক্ত সর্ব পদার্থকে কিছুকালের জন্য দৃষ্টির বাইরে সরিয়ে দিয়ে[5], "স্ব-সংবেদক অহম্"-এর শুদ্ধ স্বরূপটিকে আন্তর নেত্রে নিরীক্ষণ করা, এটাই এই গ্রন্থের মূল বক্তব্য ; সম্প্রতিকালে, সার্ত্র্-ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'আমি চিন্তা করছি, অতএব আমি আছি' এটাই হচ্ছে সর্বসত্যের আদিম সত্য।

তৃতীয়তঃ, চিন্তা এবং চিন্ত্যের পার্থক্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিবিক্তভাবে পাশ্চাত্ত্য চিন্তকদের সামনে দেকার্ৎই সর্বপ্রথম উপস্থাপিত করলেন ; আর তিনি চিন্ত্য ও চিন্তার অর্থাৎ সত্তা ও জ্ঞানের এই যে বৈলক্ষণ্য, তা সত্ত্বেও এই দুই-এর মিলন কি করে ঘটানো যায়, এই সমস্যাটিকেও ভবিষ্যৎ দার্শনিকদের সামনে তুলে ধরলেন।

---

1 Transcendental method.
2 Dialectical method.
3 Phenomenological method.
4 *History of Philosophy.*
5 Bracketing.

চতুর্থতঃ, জড়-শরীর ও চেতন-মনের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমরা সবাই অনুভব করে থাকি, তার বিচার-সম্মত ব্যাখ্যা কি, এই অত্যন্ত কঠিন সমস্যাটির দিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়েছিল। তিনি নিজেই হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর স্ব-রচিত চিন্তার কাঠামে এই সমস্যার সমাধান হয় না। পরবর্তী দার্শনিকরাও যে এই সমস্যার সমাধানে কৃতকার্য হয়েছেন, তা বলা যায় না। তবু সমস্যাটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এর সমাধানের ওপর হয়ত দার্শনিকের সামগ্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গীটিই নির্ভর করে। তাই, আজও বহু চিন্তক নানাভাবে এই সমস্যার আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। এই গভীর সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যও দেকার্ৎ আধুনিক দর্শন-শাস্ত্রের প্রবর্তক বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেকার্তীয় দর্শনের ত্রুটি ও তার সংশোধন

গয়লি ও মালেব্রাঁশ

1. **ত্রুটি :** দেকার্তের মতে, চেতন মন বা আত্মা ও অচেতন জড়-বস্তু পরস্পর থেকে অত্যন্ত বিসদৃশ ও বিলক্ষণ—আত্মার ধর্ম চৈতন্য বা চিন্তা জড়ে নেই ; আবার জড়ের ধর্ম বিস্তৃতি ও গতি আত্মায় নেই ; অন্যদিকে ঈশ্বরের তুলনায় মন ও জড়বস্তু উভয়েই সৃষ্ট পদার্থ ; সুতরাং এরা পরাধীন, স্বাধীন নয়। কিন্তু এই অবস্থায় এ দুটিকে দ্রব্য নাম দেওয়া সঙ্গত হবে কি ? তাছাড়া, ঈশ্বর, মন ও জড়বস্তু এই তিনটিকেই দ্রব্য বলে গণ্য করায়, এদের পরস্পরের ভেতর কি রকম সম্বন্ধ থাকতে পারে, তার ধারণা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হতে বাধ্য। হয়ত, এই দুর্বোধ্যতার জন্যই দেকার্ৎ সৃষ্ট জগতের ব্যাপারে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্তৃত্বের মাত্রা যতদূর সম্ভব কমিয়ে দিয়েছিলেন : তাঁর মতে, জড় জগৎ এবং চেতন আত্মাগুলো ও তাদের ক্রিয়াকলাপের মূল কয়েকটি নিয়ম সৃষ্টি করেই, যেন এদের ব্যাপারে ঈশ্বরের সৃষ্টি-শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেল। একবার জড় জগতে গতি উৎপন্ন হলে, তার নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন সম্পূর্ণভাবে গতির নিয়মগুলোর ওপরই নির্ভর করে ; তেমনি মনে একবার বিজ্ঞান বা ধারণার উদ্ভব হলে, এক ধারণা থেকে আরেক ধারণা, এইভাবে ধারণার পরিবর্তন ও প্রবাহ মানসক্রিয়ার মূল-নিয়ম অনুসারেই চালিত হয়, প্রকারান্তরে এই কথাই বলা হল। কিন্তু মধ্যযুগের খৃষ্টীয় পণ্ডিত ও ধর্মযাজকরা সাধারণতঃ ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, সৃষ্ট জগতের সংরক্ষণ-ও ঈশ্বরের একটি নিত্য-সৃজনক্রিয়াসাপেক্ষ। এই ধর্মমতের সাথে দেকার্তের পূর্বোক্ত মত খাপ খাওয়ানো কঠিন। তাঁর দর্শনে জগৎ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধটি অনেকাংশে ঈশ-স্বভাবের বহির্ভূত বলে মনে হয় ; তাঁর মতে, জগৎ যেন একটি ঘড়ি জাতীয় যন্ত্র ; তাতে একবার দম দিয়ে দিলে, তা আপনাআপনিই যান্ত্রিক নিয়মে চলতে থাকে। আর মধ্যযুগের ধর্মীয় মতানুসারে এই জগৎ যেন এমন একটি সঙ্গীত, বা সঙ্গীত-কারের কণ্ঠ ও সুরের আওয়াজে রূপায়িত না হলে,

অস্তিত্বলাভে ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে অসমর্থ। সৃষ্ট জিনিস সমূহের অস্তিত্বের জন্য যদি অনবরত নূতন স্বজনক্রিয়া প্রয়োজন হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, এরা আসলে দ্রব্যই নয়, আর ওরা যদি দ্রব্যই হয়, তাহলে ঈশ্বর তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখেন এই কথাটি অর্থহীন হয়ে পড়ে না কি? কারণ, দ্রব্য মানে যা স্বাস্তিত্বের জন্য অপর কারও ওপর নির্ভর করে না। দেকার্ৎ ঠিকই লক্ষ্য করেছিলেন যে, মন ও জড় এই দুটি পদার্থ পরস্পর থেকে অত্যন্ত ভিন্ন বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু বাস্তবেও কি তাই? এদের একটিকে বুঝতে হ'লে, অপরটিকে বোঝার কোন প্রয়োজন নেই, একথা ঠিক বটে। কিন্তু মনের সর্বকার্যই কি জড়ের সাহায্য ছাড়া উৎপন্ন হয়? তেমনি জড়ের সর্বক্রিয়াই কি মনের সাহায্য ছাড়া ঘটে? বস্তুতঃ, জড়-জগতের কোন কোন গতি বা ক্রিয়ার কারণরূপে আমরা আমাদের মনের ইচ্ছা, প্রযত্ন বা সঙ্কল্পকেই নির্দেশ করে থাকি, আবার মনের কোন কোন ক্রিয়া বা বৃত্তিকে (যথা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে) আমরা জড়বস্তুর ক্রিয়ার দ্বারা জনিত বলেই বিশ্বাস করি। জড় শরীর ও চেতন আত্মা এই দুটিই যদি পরস্পর থেকে ভিন্ন জাতীয় বস্তু হত, তাহলে, একটির কোন কাজই অপরটির ওপর নির্ভর করত না। যাদের কোন সমান ধর্ম নেই, তারা পরস্পরের ওপর কিভাবে পরিণাম ঘটায়, তা বোঝা যায় না। আমাদের অশরীরী ও গতিহীন মন বা আত্মা জৈব তেজের[1] ভেতর কেমনে গতির সঞ্চার করে, এবং কিভাবেই বা ঐ গতির দ্বারা আত্মা নিজে সঞ্চালিত হয়? শরীর ও মনের দ্রব্যত্ব (অর্থাৎ অত্যন্ত বৈসাদৃশ্য ও পারস্পরিক নিরপেক্ষতা) এবং তাদের পরস্পরের ওপর পরিণামকারিতা, এ দুটি ধর্ম পরস্পরের বিরুদ্ধ নয় কি? এইজন্য, হব্‌স্-প্রমুখ জড়বাদীরা[2] মনের স্বাধীন অস্তিত্ব ও লাইব্‌নিজ, বার্কলি প্রভৃতি মনোবাদীরা জড়ের স্বাধীন অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করেছেন; আর উপলক্ষ-বাদ[3] তাদের পরস্পরের ওপর পরিণামকারিতা সরাসরি প্রত্যাখ্যানই করেছে। দেকার্তীয় দর্শনের চৌকাঠের ভেতর, এই শেষোক্ত উপলক্ষবাদই অধিক সঙ্গত বলে মনে হবে। দেকার্ৎ মন ও জড়ের বিরুদ্ধস্বভাব সত্ত্বেও, এদের পারস্পরিক পরিণামকরিতাটিকে অনুভব-সমর্থিত বলে মেনে নিয়েছেন; এবং এই দুই দ্রব্যের পারস্পরিক পরিণাম-

---

1 Animal spirits.
2 Materialists.
3 Occasionalism—কিছু পরেই এর ব্যাখ্যা ও আলোচনা হবে।

কারিতা, বিশেষতঃ মানুষের দেহ ও আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটি, কিভাবে সম্ভবপর হতে পারে, যখন তিনি এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, তখন একমাত্র ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতাতেই এটা সম্ভবপর, এরকম বলে, এই সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করেছেন। আর এটাই হচ্ছে পরবর্তী দার্শনিক গয়লিঁর[1] উপলক্ষবাদের সূচক। কিন্তু এতে প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা প্রাকৃতিক নিয়মেই দিতে হবে, দেকার্তের এই মত তাঁকে কিছুটা ছেড়ে দিতে হল। তাছাড়া, তাঁর মতে, গতির মোট পরিমাণ সর্বদা একই থাকে, কখনও তা বদলায় না, এবং এই গতির দিক পরিবর্তন সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক নিয়মেই সংঘটিত হয়; কিন্তু তা হলে, পিনিয়েল গ্রন্থিকে[2] অল্প একটুও নড়ানোর শক্তি অথবা জৈব তেজগুলোর গতিদিক অতি সামান্য ভাবেও বদলাবার ক্ষমতা আত্মায় বর্তাতে পারে কি? গয়লিঁর উপলক্ষবাদে দেকার্তীয় দর্শনের এই সব ত্রুটি বিচ্যুতি হয় ত কিছুটা দূরীভূত হয়েছে।

জড় ও চেতন, উভয়ের দ্রব্যত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে, তাদের পরস্পরের ওপর প্রত্যেকের পরিণামকারিতার ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। তাই, স্পিনোজা জড় ও চেতন-মন উভয়েরই দ্রব্যত্ব অস্বীকার করেছেন। এটা সম্ভবপর যে, জড় ও চেতনের পারস্পরিক পরিণামকারিতা বাস্তব নয়। তবু এই পরিণামকারিতার প্রতিভাস অনস্বীকার্য। আর এই প্রতিভাসের একটা কিছু ব্যাখ্যা আবশ্যক। কোন কোন শারীরিক ক্রিয়া বা অবস্থার সাথে কোন কোন মানসিক অবস্থার যে নিয়তসম্বন্ধ দেখতে পাওয়া যায়, তা কার্য-কারণ সম্বন্ধ না হ'তে পারে, তবু এই নিয়তত্বের একটা কিছু হেতু বাতলানো দরকার। উপলক্ষবাদের এটাই উদ্দেশ্য। এতে বলা হয় যে, যদিও কোন দৈহিক ক্রিয়া কখনও কোন সংবেদনাদি মানসিক অবস্থার কার্য বা কারণ নয়, তথাপি তাদের নিয়তসহচার পরস্পরের উৎপত্তির উপলক্ষ অথবা সময়-সূচক। প্রশ্ন থাকে, এদের উৎপত্তির কারণ কি? গয়লিঁ বলেন, উভয়েরই উৎপত্তির কারণ হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বর। যখন যখন শারীর ক্রিয়াটি ঘটে, তখনই ঈশ্বর ঐ ক্রিয়াটিকে উপলক্ষ করে, মানসিক অবস্থাটি সৃষ্টি করেন, আবার যখন আমার মনে এই ইচ্ছা জাগে যে, আমি হাততালি দেব, তখন এই ইচ্ছাটিকে উপলক্ষ করে, ঈশ্বরই আমাকে দিয়ে হাততালি দেওয়ান। সংকল্পের সাধ্য নেই যে, তা হাততালি দেওয়াতে পারে।

---

1 **Geulinx.**
2 **Pineal gland.**

হাততালির প্রকৃত কারণ হচ্ছেন ঈশ্বর। আমার সংকল্পটি হচ্ছে হাততালির উপলক্ষ মাত্র, কারণ নয়।

2 গয়লিঁ : এই উপলক্ষবাদের প্রতিপাদক আর্ণল্ড গয়লিঁ মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মারা যান (জন্ম ১৬২৪ ও মৃত্যু ১৬৬৯)। কিন্তু এই উপলক্ষবাদ তৎকালীন দেকার্ৎ-মতাবলম্বী দার্শনিকদের ভেতর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর মৃত্যুর আগে এবং পরেও, দেকার্তীয়রা প্রায় সবাই এই মত মেনে নিয়েছিলেন।

উপলক্ষবাদের সমর্থনে গয়লিঁ-প্রদত্ত যুক্তি সংক্ষেপে এই :—কোন ক্রিয়া ঠিক কি উপায়ে, কি পদ্ধতিতে ঘটে, যদি আমি তা স্পষ্ট বুঝতে না পারি, তা হ'লে, আমাকে তার জনক বলা যায় না। আমি কথা বলতে চাওয়ার পর, আমার বাগিন্দ্রিয় সক্রিয় হয়। কিন্তু মনের ইচ্ছা বাগিন্দ্রিয়কে কিভাবে সক্রিয় করে, তা আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সুতরাং আমি তার প্রকৃত কারণ হ'তে পারি না। তেমনি আমার নার্ভ বা ইন্দ্রিয়ে স্পন্দন হ'লে, আমার মনে নীলরঙের সংবেদন হয়; কিন্তু জড়ের স্পন্দনে সংবেদনরূপ চেতনক্রিয়া কিভাবে ঘটে, তা আমার অবিদিত। এমন অবস্থায় এর একটিকে অপরের কারণ বলা সঙ্গত হবে কি? কারণ মানে যা জেনে-শুনে কার্যজননে সমর্থ। শরীর ত অচেতন পদার্থ। তাই নার্ভ বা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এবং ঐন্দ্রিয়িক সংবেদন এই দুইয়ের কোনটিই শরীর দ্বারা জনিত নয়। এগুলো আমাদ্বারা যে জনিত নয়, তা আগেই দেখানো হয়েছে। সুতরাং এগুলো কোন বিজ্ঞতর চেতন মহাশক্তিধরের কার্য বলতে হবে। এই মহাশক্তিধর চেতন বস্তুটিকেই ঈশ্বর নাম দেওয়া হয়। আমার চেতন সংকল্প-ক্রিয়া ও হাততালি, অথবা অচেতন ইন্দ্রিয়-স্পন্দন ও চেতন সংবেদন, এদের একটিকে উৎপন্ন করার সময়ে, ঈশ্বর অপরটিকেও উৎপন্ন করেন—একের উৎপত্তিকাল হচ্ছে অপরের উৎপত্তিকালের সূচক অথবা উপলক্ষমাত্র। আমাদের অজ্ঞাত কোন প্রণালীতে, ঈশ্বর ঠিক প্রথমটির সময়ে দ্বিতীয়টিকেও, নির্মাণ করেন। সংকল্প-ক্রিয়া অথবা ইন্দ্রিয়-স্পন্দন হচ্ছে কার্যজননের উপায় বা সাধনমাত্র; এদের কোনটিই কার্যক্ষম কারণ নয়। ভগবানের এমনি সৃষ্টি-মহিমা যে, জড়-জগৎ ও মনোজগতের ঘটনা বা অবস্থাগুলোর যথাযোগ্য পারম্পর্য ও শৃঙ্খলায় কোথাও বিন্দুমাত্র ফাঁক নেই। বৈজ্ঞানিক যে এক জড়বস্তুর গতি অন্য জড়বস্তুতে সংক্রামিত হয় বলে মনে করেন, সেই গতিসংক্রমণের কর্তাও ভগবানই। তাছাড়া, ভগবান জড়ের গতিতে এমন সব নিয়ম চাপিয়ে দিয়েছেন যে, আমার

শরীরস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতি আমার সবল ইচ্ছার সাথে পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায়। তথাপি এই গতি ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না।

এই দিক থেকে দেখলে, গয়লিঁর উপলক্ষবাদ অনেকাংশে লাইবনিজের 'পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত ঐকতানের'[1] মতন। অন্ততঃ, উপলক্ষবাদকে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত ঐকতানের উপক্রমণিকা বলে ধরা যায়। উভয় প্রকল্পেই ঈশ্বরের অঘটন-ঘটন-পটুতার ধারণা নিহিত। তথাপি প্রকল্প দুটির স্বরূপগত পার্থক্যও রয়েছে। কেও কেও বলেছেন যে, উপলক্ষবাদে, সম্পূর্ণ বিসদৃশ জড় ও চেতন দুটি ঘটনা বা অবস্থা একইসঙ্গে ঈশ্বর হাজার হাজার বার সৃষ্টি করেন, আর এইরূপ ঐশ্বরিক চমৎকরণের[2] সংখ্যাও অসংখ্য, এই রকম মানতে হয়; কিন্তু পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত ঐকতানের প্রকল্পে শুধু একবার সৃষ্টির আদিতে একটিমাত্র ঐশ্বরিক চমৎকরণ স্বীকৃত হয়; এতে নিশ্চয়ই লাইনিজীয় মতের লাঘব ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়। লাইবনিজ নিজে অবশ্য পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত ঐকতানকে চমৎকরণের উদাহরণ বলতে রাজি নন; কারণ, এই ঐকতান সৃষ্ট-বিশ্বের একটি শাশ্বতরূপ, আর পদার্থের শাশ্বতরূপ বা স্বভাবকে চমৎকরণ নাম দেওয়া অসঙ্গত। বস্তুতঃ, লাইবনিজীয় প্রকল্পটির পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, তিনি প্রত্যেকটি কার্যের সাক্ষাৎ ঈশ্বর-কারণত্বের পরিবর্তে সর্বত্র নৈসর্গিক কারণতাই[3] মেনেছেন। গয়লিঁর মতে, কার্য-মাত্রই ঈশ্বর-কৃত, এবং ঘটনাবলীর পারস্পরিক পরিণামকারিতা আপাত-প্রতীয়মান হলেও, তা অবাস্তব মিথ্যা প্রতিভাস। লাইবনিজের মতে, চিদণুগুলো[4] পরস্পরের ওপর কোন ক্রিয়াই করতে অসমর্থ; তবু, তাদের ভেতর যা কিছু ক্রিয়া বা অবস্থান্তর ঘটে, তার কারণ তারা নিজেরাই।

গয়লিঁর মতে, পরিচ্ছিন্ন বস্তুমাত্রই পরাধীন ও স্ব-নিঃসৃত ক্রিয়াশক্তি-বিহীন। ঈশ্বরই অনন্ত ও স্বাধীন বস্তুরূপে ক্রিয়াশক্তির একমাত্র মালিক—সমস্ত ক্রিয়া ঈশ্বরেরই ক্রিয়া। জীব হচ্ছে সসীম, আর ঈশ্বর হচ্ছেন অসীম। তাদের সম্বন্ধটি হচ্ছে কোন বিশিষ্ট জড়বস্তু ও সর্বব্যাপী দেশ বা আকাশের সম্বন্ধের মতন। অর্থাৎ জীব ঈশ্বরের অংশমাত্র। বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে এই পরমতত্ত্বের বোধ হলে, জীব নিজের ভেতর ঈশ্বরকে

1 Pre-established harmony: এই মতের ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হয়েছে। লাইবনিজ-শীর্ষক পঞ্চম পরিচ্ছেদ দেখুন।

2 Miracle.

3 Natural causality.

4 Monads.

এবং ঈশ্বরের ভেতর নিজেকে দেখতে পাবে। এই মত যে স্পিনোজীয় সর্বেশ্বরবাদের[1] সদৃশ, তা বলার আবশ্যকতা নেই।

গয়লিঁর এসব চিন্তা তাঁর সমকালীন দেকার্তের সমর্থকদের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরিচ্ছিন্ন পদার্থ যে প্রকৃত অর্থে দ্রব্য নামের অনুপযুক্ত, তিনি এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর এই অভিমতের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ স্পিনোজার দর্শনে দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু সান্ত পদার্থ দ্রব্য নয়, অতএব যুক্তিশাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে এটা একেবারে অনিবার্য যে, ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য, ব্রহ্মাণ্ডের বাকি সব পদার্থ তাঁরই অংশ, ধর্ম বা পরিচ্ছিন্ন রূপ, এই সর্বেশ্বরবাদই যে দেকার্তীয় দর্শনের অবশ্যম্ভব পরিণতি, তা স্পিনোজা স্পষ্ট ও দ্বিধাহীনভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু এই জাতীয় সর্বেশ্বরবাদের প্রথম উদ্ভাবক হচ্ছেন গয়লিঁ।

গয়লিঁ অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জ্ঞানশাস্ত্রে[2] একাধিক সূক্ষ্ম তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছেন। এগুলোর কয়েকটি কাণ্টীয় মতের পূর্বাভাস; আর কয়েকটি উনবিংশতি শতাব্দীর বিখ্যাত জার্মেন দার্শনিক লটসের[3] দর্শনে সুস্পষ্ট আকারে দেখা দিয়েছিল। এই স্বল্পায়ু অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী চিন্তকের এ-সব মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণও এখানে দেওয়া সম্ভবপর হ'ল না।[4]

3. **মালেব্রাঁশ :** নিকোলাস মালেব্রাঁশ[5] (১৬৩৮-১৭১৫) নামক ফরাশিদেশীয় চিন্তকও দেকার্তীয় দর্শনের একজন প্রসিদ্ধ পরিপোষক ও পরিবর্ধক। তিনি এই দর্শন মোটামুটি মেনে নিয়ে, বিখ্যাত মধ্যযুগীয় খৃষ্টান সন্ন্যাসী অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০)-এর মতের সাথে খাপ খাইয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে ম্যালেব্রাঁশ বহু বড় বড় দার্শনিক গ্রন্থ লিখে গেছেন। কারো কারো মতে, আধুনিক ফরাসীদেশীয় সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকেদের ভেতর, দেকার্তের পরেই তাঁর স্থান। তাঁর বিস্তীর্ণ রচনা বহু সারগর্ভ মৌলিক চিন্তার আকর। এখানে তাঁর শুধু ঐ কয়েকটি মতেরই

---

1 Pantheism.
2 Epistemology.
3 Lotze.
4 *History of Modern Philosophy* by Richard Falkenberg দেখুন।
5 Nicolas Malebranch.

অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবো, যে-গুলো বিশেষভাবে দেকার্তীয় দর্শনের পরিপোষক।

তাঁর প্রসিদ্ধ একটি মত এই যে, আমরা যা কিছু জানি, তা ঈশ্বরের অধিষ্ঠানেই জানি। এই কথাটি নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হয়। দেকার্তের মতে, আমাদের মন, আমাদের শরীর ও অন্যান্য জড়বস্তু পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিসদৃশ ; এমন অবস্থায়, মনের পক্ষে, এসব জড়বস্তু জানা কিভাবে সম্ভবপর ? জ্ঞান নিশ্চয়ই জ্ঞাতা মন ও জড়-বিষয়ের মধ্যে একপ্রকার সম্বন্ধ। কিন্তু অত্যন্ত বিরুদ্ধ-স্বভাব চেতন ও অচেতনের সম্বন্ধ হতে পারে কি ?

মালেব্রাঁশের মতে, চেতন আত্মা বা মনের বিস্তৃতি নেই বটে, তবু তা বিস্তারযুক্ত শরীরকে বিধারণার[1] সাহায্যে জানতে পারে। মনোবাহ্য বস্তু মনের মধ্যে তার ছাপ বা প্রতিবিম্ব ফেলে ; আর বিধারণা হচ্ছে বস্তুর পরিপূর্ণ মূল আকৃতি বা ছাঁচ[2]। সুতরাং একদিকে মনোবাহ্য বস্তু, অন্যদিকে মানসিক প্রতিবিম্ব, এ দুয়ের মাঝামাঝি হচ্ছে বিধারণা। ঈশ্বর এসব বিধারণার ছাঁচে জগতের বস্তুসকল সৃষ্টি করেন। অবশ্যম্ভব তত্ত্ব বা সত্য[3] মানে বিভিন্ন বিধারণার পারস্পরিক সম্বন্ধ। বিধারণা ও তাদের সম্বন্ধগুলো শাশ্বত ও অনাদি। এসব শাশ্বত সত্য নিজের ভেতর ধারণ করেন বলেই, ঈশ্বর হচ্ছেন সর্বজ্ঞ বা পরম জ্ঞানী—এগুলো তাঁর ইচ্ছাশক্তির ওপর নির্ভর করে না। সর্ববস্তু তাদের পরিপূর্ণরূপে বিধারণার আকারে ঈশ্বরে অবস্থান করে। ঈশ্বরস্থ এসব পরিপূর্ণ আকার বা ছাঁচের সাহায্যেই বস্তুর সম্যক জ্ঞান আমাদের পক্ষেও সম্ভবপর। কেউ কেউ বলেন যে, বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়ের প্রণালীতে নিজ প্রতিবিম্ব জ্ঞাতার শরীরে ঢুকিয়ে, বিধারণা জন্মায়। এটা সম্ভবপর নয়। কারণ, ইন্দ্রিয়জ প্রতিবিম্ব জড়বস্তু থেকে উদ্ভূত, তাই তা জড়ধর্মী হতে বাধ্য ; অর্থাৎ তার কোন একটি বিশিষ্ট বিস্তার, পরিমাণ, গোল, ত্রিকোণ প্রভৃতি আকৃতি এবং ওজন প্রভৃতি না থেকে পারে না। অতএব তা শরীরে ঢুকলে শরীরের আকার ও ওজন প্রভৃতি বেড়ে যাওয়ার কথা। তাছাড়া, একটি প্রতিবিম্ব শরীরে প্রবেশ করলে, অন্য প্রতিবিম্ব তাকে তথায় ঢোকার সময়ে বাধা দেবে ; কারণ, এক জড়বস্তু অন্য জড়বস্তুর স্থান বিনা বাধায়

1. Idea or concept.
2 Archetype.
3 Necessary truth.

দখল করতে পারে না। সুতরাং এভাবে মন কখনও বস্তুর স্পষ্ট ছাপ গ্রহণ করতে পারবে না। সর্বোপরি জড়ধর্ম যে গতি, তা কি করে মনোধর্ম বিধারণায় রূপান্তরিত হয়, এটাও দুর্বোধ্য থেকে যায়। এভাবে বোঝা গেল যে, জড়বস্তু বিধারণার জনক নয়। মন বা আত্মা নিজেও তার জনক নয়। প্রথম থেকেই বিধারণাগুলো আত্মার অভ্যন্তরে নিহিত[1] থাকে, একথাও সত্য নয়। যদি তাই হত, তাহলে বস্তুর জ্ঞানের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে কেন? প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরই হচ্ছেন আমাদের বস্তুজ্ঞানের জনক। তথাপি একথা ঠিক নয় যে, ঈশ্বর জীবকে সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে জীবের মনে বিধারণাগুলো রেখে দেন, অথবা যখন যখন জীবের কোন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, তখন তখনই তিনি জীবের মনে এগুলো সৃষ্টি করেন। বস্তুর আদর্শীভূত পরিপূর্ণরূপ যে বিধারণা, তা শুধু পরিপূর্ণ-স্বভাব ঈশ্বরেই থাকতে পারে। আবার ঈশ্বর সর্বত্রাবস্থিত বোধ বা প্রজ্ঞাস্বরূপ হওয়ায়, জীবের চিন্ময় আত্মা-গুলোও ঈশ্বরাধিষ্ঠানেই থাকে। এইভাবে, জীব ও বস্তুর বিধারণা একই অধিকরণে থাকায়, জীব সাক্ষাৎভাবে বিধারণাগুলো দেখতে পারে। সর্ব জড়বস্তুর অধিষ্ঠান যেমন দেশ[2], তেমনি মন বা আত্মাদের অধিষ্ঠান হচ্ছে ঈশ্বর। জড়বস্তুগুলো যেমন দেশ বা বিস্তৃতির[3] বিশেষ বিশেষ প্রকার[4], তেমনি বিভিন্ন জাতীয় জড়বস্তুর বিধারণাগুলোও বিস্তৃতির বিধারণার অর্থাৎ জ্ঞানীয় বা চৈতন্যাত্মক বিস্তৃতির[5] বিশেষ বিশেষ প্রকার বা রূপ। তাই, আমাদের পক্ষে ঈশ্বরাধিষ্ঠানে থেকে, সর্ব বস্তু প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর হয়। সংক্ষেপে, এই কথা নিম্নলিখিতভাবে সমর্থিত হ'ল। জড়বস্তুর বিধারণা ও আমাদের মনগুলো একই ঈশ্বরে বিদ্যমান। তাই আমরা ঈশ্বরস্থ বিধারণার মাধ্যমে জড়বস্তু প্রত্যক্ষ করতে পারি।

যেমন আমাদের খাঁটি জ্ঞান মানে ঈশ্বর যে বস্তু যেভাবে জানেন, সেইবস্তু ঐভাবে জানা, তেমনি প্রকৃত নীতিমান হওয়ার মানে ঈশ্বর যে-বস্তু যতখানি ভালবাসেন, সেই বস্তুকে ততখানি ভালবাসা, অর্থাৎ পূর্ণতার সামীপ্যের তারতম্য অনুসারে যে বস্তুর যা ন্যায্য মূল্য, সেই বস্তুতে তদনুপাতে কম বা

1 Innate.
2 Space.
3 Extension.
4 Mode.
5 Intelligible extension.

বেশি ঠিক ততটুকু প্রীতি পোষণ করা। বস্তুর জ্ঞান যেমন এক অর্থে ঈশ্বরকেই জানা, তেমনি আমাদের সর্ব ইচ্ছাও মূলতঃ ভগবানের প্রতি প্রেম। প্রত্যেক সৃষ্ট প্রাণীর হৃদয়ে স্রষ্টার দিকে একটি সহজাত এষণা বা আকর্ষণ রয়েছে। ভগবান যে কেবল অনাদি ও অনন্ত সত্তা, তা নয়, তিনি সর্বোৎকৃষ্ট মঙ্গলের আকর এবং আমাদের সর্ব-প্রযত্নের অন্ত্য উদ্দেশ্যও বটেন। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর বিধারণাগুলো যেমন ভাগবত পূর্ণসত্তার বিশেষ বিশেষ অংশ বা রূপ, তেমনি আমাদের বিবিধ পদার্থ-বিষয়ক বিবিধ ইচ্ছাগুলিও আমাদের ভেতর পরম মঙ্গলের দিকে যে স্বাভাবিক এষণা রয়েছে, তারই বিবিধ পরিচ্ছিন্ন রূপ। তথাপি সাংসারিক মানুষ তার এই ঈশ্বরাভিমুখী আদ্য প্রবণতা ভুলে গিয়ে, নশ্বর জিনিষের দিকেই ধাবিত হয় এবং মহামূল্য পদার্থের চেয়ে বাজে জিনিষই বেশি পছন্দ করে, স্বর্গ-সুখের চেয়ে পার্থিব সুখ কাম্যতর বলে ভাবে। মানুষের ইচ্ছা এরূপ অদ্ভুত ও বিবেচনাহীন আচরণ করে কেন? এর কারণ এই যে, মানুষের আত্মা বা মন একদিকে ঈশ্বরের সাথে ও অপরদিকে শরীরের সাথে সম্বন্ধ হয়ে, দোটানায় পড়ে গেছে। আত্মার শরীর-সম্বন্ধই ইচ্ছাকে বিপথে চালিত করে। এটাই কর্মক্ষেত্রে নৈতিকভ্রান্তি ও পাপাচরণের মূল উৎস। কারণ, আত্মার দেহ-সম্বন্ধবশতঃ, ঈশ্বরস্থ শাশ্বত বিধারণাগুলোর প্রতিনিধি-স্বরূপ যে-সকল ধারণা মনে আবির্ভূত হয়, তাদের সাথে ইন্দ্রিয়-সঞ্জাত প্রতিবিম্ব বা বাহ্যবিষয়ের ছাপগুলো মিশে গিয়ে তাদের ঘোলাটে করে দেয়; আর তার ফলে, আত্মিক শুদ্ধ প্রেরণার সাথে শরীরস্থ হৃদয়াবেগের মিশ্রণ ঘটে। অবশ্য, এতেই যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অনৈতিক ও ঈশ্বর-বিরোধী মনোভাব দেখা দেয়, ঠিক তা নয়—শুধু তার সম্ভাবনা হয়, এই যা। বাস্তবে এই সম্ভাবনার পরিণতি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মের ওপরই নির্ভর করে। কারণ, মনোবিকার ও ঐন্দ্রিয়িক হৃদয়াবেগ থাকা মানেই পাপ নয়। মনোবিকারের বশবর্তী হয়ে, তার প্ররোচনায় সম্মতি দেওয়াতেই পাপ। অসৎ প্রবৃত্তিতে হৃদয়াবেগের সহযোগিতা কোন কোন শারীরিক ক্রিয়ার অব্যবহিত পরবর্তী হলেও, তার দ্বারা জনিত নয়। শারীরিক ক্রিয়া শুধু তার উপলক্ষ বা তার উৎপত্তিকালের সূচক মাত্র। অপরদিকে, স্বেচ্ছায় কৃত শারীরিক ক্রিয়া ও ঐ ইচ্ছা, এ দুটির সম্বন্ধও একই রকম। অর্থাৎ একে অন্যের উপলক্ষ মাত্র, কারণ নয়। যা কিছু ঘটে, ঈশ্বরই তার প্রকৃত কারণ বা কর্তা। তিনিই আমাদের মধ্যে চিত্তবিকার এবং জড়-জগতে গতি উৎপন্ন করেন। শরীরে শুধু গতির সম্ভাবনা বা

প্রবণতা আছে; কিন্তু গতি উৎপন্ন করার ক্ষমতা নেই। আমাদের মন বা আত্মাও এই গতির উৎপাদক নয়। কারণ, যদি তাই হোত, তাহ'লে শরীরের ঐ গতি বা ক্রিয়া আমি কি-প্রণালীতে উৎপন্ন করি, তা স্পষ্ট বুঝতে পারতাম। অথচ এই ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আসলে, ভগবানের সাহায্য ছাড়া আমরা আমাদের জিহ্বাটিও নাড়তে পারি না। তাই মনোবিকারের প্ররোচনায় সম্মতি দিয়ে, আমরা যখন ভগবানের উপদেশের বিরুদ্ধেও কিছু করি, তখনও ভগবানই আমাদের দিয়ে তা করান।

এটা স্পষ্ট যে, মালেব্রাঁশ-ও গয়লিঁর মতন একপ্রকার সর্বেশ্বরবাদের[1] সমর্থক। তথাপি তিনি নানাভাবে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, তাঁর মত স্পিনোজীয় সর্বেশ্বরবাদ থেকে পৃথক।[2] মালেব্রাঁশের বক্তব্য এই যে, তিনি জগৎকে ঈশ্বরের অন্তর্গত বলে স্বীকার করলেও, স্পিনোজার মতন তিনি ঈশ্বরকে জগতের সাথে এক বলে ভাবেন না। তা ছাড়া, তিনি ঈশ্বরকে বিশ্বের স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করেন; আর স্পিনোজা বিশ্ব কোন এক অতীতকালে সৃষ্ট হয়েছে, এই মতে অবিশ্বাসী। আরও এক কথা। জগৎ ঈশ্বরের অন্তর্গত, মালেব্রাঁশের এই উক্তির প্রকৃত অর্থ এই যে, জাগতিক সর্ব-পদার্থের বিধারণাগুলোর আশ্রয় হচ্ছেন ঈশ্বর—তিনি চৈতন্যময় ঈশ্বরের সত্তায় জড়-জগৎকে সমাবিষ্ট করেন নি। তিনি একদিকে জড়ীয় বিস্তৃতি বা জড়-স্বভাব সৃষ্ট জগৎ এবং অপরদিকে ঈশ্বরের অন্তর্ভুক্ত বৌদ্ধিক বিস্তৃতি বা বিস্তৃতির বিধারণা, এ দুটি যে পরস্পর থেকে অত্যন্ত ভিন্ন, তা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন। স্পিনোজা তা করেন না। মালেব্রাঁশ জীব থেকে ভিন্ন তার স্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, এবং জীবের ঈশ্বরানুমোদিত ঐচ্ছিক স্বাধীনতা মানেন। স্পিনোজা তা মানেন না। তাছাড়া, তিনি সর্ব-ক্রিয়ার কর্তা ঈশ্বরকে, স্পিনোজার মতন, গতির আশ্রয় প্রকৃতি[3] বলে না ভেবে, সর্বক্ষমতাসম্পন্ন এক বিরাট অমোঘ সংকল্প-শক্তি বলে মনে করেন।

মালেব্রাঁশের এসব উক্তি সত্ত্বেও, বিখ্যাত দর্শন-পণ্ডিত কিউনো-ফিশের ন্যায্যভাবেই বলেছেন যে, মালেব্রাঁশ তাঁর অজ্ঞাতসারে স্পিনোজীয়

1 Pantheism.

2 মালেব্রাঁশ তাঁর সর্বেশ্বরবাদে উপনীত হওয়ার আগেই, স্পিনোজা তাঁর সম্পূর্ণ দর্শন পণ্ডিতসমাজে উপস্থাপিত করেছিলেন।

3 Nature.

প্রকৃতি-বাদেরই[1] খুব নিকটে চলে গিয়েছিলেন। তিনি যখন সর্ব সসীম পদার্থকে ভাগবত সত্তার পরিচ্ছিন্ন অথবা বিশেষ বিশেষ প্রকার[2] বলে ব্যাখ্যা করেন, ঈশ্বরের সংকল্পশক্তিকে তাঁর নিত্য প্রজ্ঞার[3] ওপর, অর্থাৎ সৃষ্ট জগতের ঈশ্বরান্তর্গত শাশ্বত বিধারণার ওপর দাঁড় করান, সুতরাং ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা উক্ত নিত্য প্রজ্ঞাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করেন এবং সর্বপ্রকার ক্রিয়ার একমাত্র উৎপাদক বলে ভাবেন, তখন স্পিনোজীয় দর্শনের সাথে তাঁর মতের সাদৃশ্য অস্বীকার করা কঠিন। এসব সর্বেশ্বরবাদীয় মত মালেব্রাঁশের আগেই স্পিনোজা দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ সমাজের সামনে রেখেছিলেন। অবশ্য, এটা খুবই সম্ভবপর যে, মালেব্রাঁশ তাঁর স্বাধীন চিন্তাধারাই এসব মতে উপনীত হয়েছিলেন। আর এটাও লক্ষণীয় যে, মালেব্রাঁশের অভিমত খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের সাথে খাপ খাওয়ানো হয়ত সম্ভবপর; কিন্তু স্পিনোজার অভিমত হয়ত তা নয়।

তবু মোটের ওপর মনে হয় যে, গয়লিঁ, মালেব্রাঁশ প্রভৃতি দার্শনিকরা দেকার্তীয় দর্শনের সমস্যাগুলোর সমাধানের চেষ্টা করতে গিয়ে ক্রমশঃ স্পিনোজার দর্শনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন।

1 Naturalism.
2 Mode.
3 Wisdom.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্পিনোজা

জন্ম—১৬৩২ ; মৃত্যু—১৬৭৭

স্পিনোজার পুরো নাম হচ্ছে বেনিদিক্‌তুস্‌ দি স্পিনোজা। ইনি ১৬৩২ সালে এম্‌স্‌টার্ডামে এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বে, এই পরিবার স্পেন অথবা পর্তুগালে বসবাস করতো। কিন্তু সেখানে ইহুদী সম্প্রদায়ের ওপর যে নির্যাতন চলছিল, তা এড়াবার জন্যে, সেখান থেকে এঁরা হল্যাণ্ড দেশে পালিয়ে আসেন। স্পিনোজার বাবা ভাল ব্যবসায়ী ছিলেন। বাল্যকালে, স্পিনোজা ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ এবং তার ওপর মধ্যযুগীয় ইহুদী পণ্ডিতদের লিখিত ভাষ্য প্রভৃতি বেশ মনোযোগের সাথে পড়েন। ১৬৫৪ সালে, তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। অল্প বয়স থেকেই, ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীন চিন্তা করার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল এবং যৌবনে তিনি নানাভাবে ইহুদী ধর্মের সম্বন্ধে তাঁর অবিশ্বাস প্রকাশ করতে থাকেন। ১৬৫৬ সালে তাঁকে এইজন্য ইহুদী ধর্ম-যাজকরা ইহুদী সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করেন। এরপর, তিনি হল্যাণ্ডের বিভিন্ন শহরে বন্ধুদের বাড়ীতে অর্থের বিনিময়ে অতিথিরূপে থেকে নির্জন জীবন-যাপন করেন। চশমার কাঁচ ঘসে তাঁকে জীবিকা অর্জন করতে হ'ত। এতে তাঁর যক্ষ্মারোগ হয় ; এবং ১৬৭৭ সালে এই রোগে তিনি মারা যান। নির্জনে থাকলেও, তাঁর বিদ্যা এবং পাণ্ডিত্যের খ্যাতি পণ্ডিতদের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৬৭৩ সালে হাইডেলবুর্গে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করার জন্য তিনি আহুত হন। কিন্তু তা তিনি প্রত্যাখ্যান করে নির্জনে থাকাই বরণ করেন। এর প্রধান কারণ এই যে, হাইডেলবুর্গে তাঁর মত-স্বাধীনতা রক্ষিত হবে কিনা, সে সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল। অবশ্য, হাইডেলবুর্গের কর্তৃপক্ষগণ তাঁকে মতস্বাধীনতার আশ্বাসন দিয়েছিলেন। স্পিনোজা নিজে মাত্র দুখানা বই প্রকাশ করেছিলেন। প্রথমটি হচ্ছে দেকার্তের "দর্শনের মূলতত্ত্ব" নামক গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগের ওপর তাঁর বক্তৃতা। এই বক্তৃতাগুলোর সাথে তাঁর স্ব-রচিত "পরমতত্ত্ব-বিষয়ক চিন্তা" নামক একটি পরিশিষ্টও ছিল। ১৬৬৩ সালে, এই গ্রন্থ

প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম হচ্ছে "ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ।" এই গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের নাম ছাড়াই ১৬৭৩ সালে প্রসিদ্ধ হয়। এতে বিচার-স্বাধীনতা এবং খোলা মনে বাইবেলের সমালোচনা করার সমর্থন আছে। এই গ্রন্থে যে সব তত্ত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে, সেগুলো খৃষ্টান ও ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই নাস্তিক ও ধর্মের অবমাননা-কারক বলে দোষারোপ করেছিল। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "নীতি-বিজ্ঞান"[1] ছাপাবার জন্যে ১৬৭৬ সালে তিনি যখন এমস্‌টার্‌ডামে গেলেন, তখন পাদ্রী ও অন্যান্য ক্ষমতাশালী লোকেরা যাতে এই পুস্তক প্রকাশিত না হয়, তার জন্যে সরকারের কাছে দরখাস্ত করেছিল। স্পিনোজার মৃত্যুর অল্প পরে, ১৬৭৭ সালে, এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

স্পিনোজা তাঁর "বুদ্ধি-বৃত্তির সংস্কার-বিষয়ক প্রবন্ধ" নামক রচনায় নিজের সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার সারাংশ এই।

ধর্ম, খ্যাতি, ইন্দ্রিয়জ সুখ প্রভৃতির দ্বারা মনের অস্থিরতা উৎপন্ন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তিনি গভীর চিন্তার পর, উপলব্ধি করতে পারলেন যে, এক ভীষণ বিপদ তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান; তাই, সব শক্তি প্রয়োগ করে তাঁকে এই বিপদ এড়াবার চেষ্টা করতে হ'বে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, কোন কিছুই ভালোও নয়, খারাপও নয়। যদি আমরা বুঝতে পারি যে, যা কিছু ঘটছে, তা সবই প্রকৃতির নির্দিষ্ট নিয়ম ও ব্যবস্থায় ঘটছে, তাহ'লে আমরা এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারব। মানুষের বুদ্ধির ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। তাই, বোধ-শক্তি তার দুর্বলতাবশতঃ নিসর্গের এই ব্যবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। তথাপি তারপক্ষে এটা বুঝতে পারা সম্ভবপর যে, বর্তমান আধ্যাত্মিক নিম্নস্তর থেকে একটি উচ্চতর ও স্থিরতর অবস্থাও রয়েছে। মানুষের পরম কাম্য হচ্ছে এই পূর্ণ অবস্থাটিকে নিজে উপভোগ করা, এবং সম্ভবপর হ'লে, অন্য মানুষের সাথে মিলে তা উপভোগ করা। এই উচ্চতর অবস্থাটি হচ্ছে আমাদের মন ও নিসর্গ, এই দুই-এর ঐক্যের সাক্ষাৎ জ্ঞান বা উপলব্ধি। এইটি হচ্ছে আমাদের সর্ব কর্ম ও প্রচেষ্টার উদ্দিষ্ট গন্তব্য স্থল। যাতে অধিকাংশ মানুষ এই ঐক্যের জ্ঞানলাভ করতে পারে, তার জন্য সমাজ-ব্যবস্থা পরি-বর্তন করা উচিত ও তা সম্ভবপর। স্পিনোজা ভেবেছিলেন যে, নৈতিক দর্শন, শিক্ষা-বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, এমন কি কারিগরি বিদ্যা (যথা—নতুন

---

1 *Ethics.*

যন্ত্র আবিষ্কার) এগুলোর সাহায্যে মানুষের অবসর বৃদ্ধি করতে পারলে, চিন্তা করার ও এই ঐক্য উপলব্ধি করার সুযোগ-সুবিধা বর্ধিত হবে। সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিসটি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিটিকে নিরাময় রাখা এবং অন্ধবিশ্বাস, ঈর্ষাদ্বেষ প্রভৃতি আবর্জনাগুলোকে দূর করে, এই বোধ-শক্তিকে নিসর্গের প্রকৃত তত্ত্বটি অভ্রান্তভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ করা। স্পিনোজা মনে মনে স্থির করলেন যে, তিনি এই যে মানবীয় সর্ব্বোচ্চ পূর্ণতার ধারণায় উপনীত হয়েছেন, তাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্যে, তিনি সর্ব বিজ্ঞান ও সমাজ-ব্যবস্থাকে কাজে লাগাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

স্পিনোজার পূর্ণাঙ্গ দর্শন তাঁর "নীতিবিজ্ঞানে" পাওয়া যায়। এই দর্শনের কোন কোন মূল সিদ্ধান্ত মধ্যযুগীয় ধর্মযাজকদের বিরোধী প্রটেস্টেণ্টদের দর্শন থেকে গৃহীত হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন যে, স্পিনোজার মূলমতগুলো ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ "কেবালা" থেকে ও মধ্যযুগীয় ইহুদী ধর্মপণ্ডিতদের দর্শন থেকে, নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিখ্যাত পণ্ডিত কিউনো ফিশের[1] দেখিয়েছেন যে, এই ধারণা ভ্রান্ত ; আসলে, স্পিনোজা নিজেই দেকার্তীয় তত্ত্বগুলোর যৌক্তিক অর্থাক্ষেপ বের করে, স্বীয় মূল সিদ্ধান্তগুলোতে উপনীত হয়েছিলেন। স্পিনোজা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, যৌক্তিক বুদ্ধির যথাযোগ্য প্রয়োগে ঈশ্বরকে জানা সম্ভবপর। আর এই বিশ্বাসটি যে ইহুদী ধর্মপণ্ডিতদের মতের একেবারে বিপরীত, তা বলা বাহুল্য। তাছাড়া, স্পিনোজা মনে করতেন যে, ধর্মগ্রন্থগুলোর ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার ও আলোচনা অত্যাবশ্যক। তাঁর এই অভিমতটিকে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ নূতন ও আধুনিক বলতে হ'বে। স্পিনোজা অবশ্য বলেছেন যে, ধর্মমতের দ্বারা মন ও চরিত্র উন্নত করতে হ'বে। তথাপি, তিনি এটাও বলেছেন যে, সত্য-নির্ণয়ের ব্যাপারে, ধর্ম-মতকে বুদ্ধির শিক্ষকরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত হ'বে না। স্পিনোজা বেশ স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন ও প্রচার করেছিলেন যে, সায়ন্স্ বা বিজ্ঞান হচ্ছে ধর্ম থেকে অত্যন্ত ভিন্ন রকমের জিনিষ। তাঁর এই মতটি ইহুদীয় প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া অসম্ভব। বরং এরকম বলাই সঙ্গত হবে যে, স্পিনোজা যে যুগের মানুষ, তার ভেতরই ধর্ম থেকে বিজ্ঞানকে মুক্তি দিয়ে, তাকে পৃথক করার দিকে প্রবণতা ছিল।[3]

---

1 Kuno Fischer.
2 Implication.
3 এই মন্তব্যটি বিখ্যাত পণ্ডিত ভিন্ডেলব্যাণ্ড্ (Windelband)-এর।

অনেকাংশে, স্পিনোজীয় দর্শনের মূল কথাগুলো দেকার্তীয় দর্শনেরই যৌক্তিক বিকাশ। এই প্রসঙ্গে, দেকার্তের নিম্নলিখিত কয়েকটি মত উল্লেখ-যোগ্য। (১) সত্যকে জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিচার-বুদ্ধি; এবং এই বিচারের অমোঘ প্রণালী হচ্ছে গাণিতিক পদ্ধতি। (২) চেতন দ্রব্য ও জড়দ্রব্য পরস্পর থেকে অত্যন্ত ভিন্ন রকমের জিনিষ; প্রথমটির মূল ধর্ম হচ্ছে চিন্তা ও দ্বিতীয়টির মূল ধর্ম বিস্তৃতি। (৩) প্রকৃতির ঘটনা-বলীর ব্যাখ্যার জন্য, বল-বিজ্ঞানের[1] নিয়মগুলোই যথেষ্ট বলে গ্রহণ করে, উদ্দেশ্য-কারণতাবাদ[2] পরিত্যাগ করতে হ'বে; সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে হ'বে যে, জড় ও চেতনের মধ্যে পারস্পরিক পরিণামকারিতা অসম্ভব। স্পিনোজা এই মতগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে, এগুলোর প্রকৃত অর্থ প্রকট করলেন। তদুপরি, তিনি এগুলোর সাথে নিজের কয়েকটি মতও জুড়ে, তাঁর গোটা দর্শনটি তৈরি করেছিলেন। এই স্বকীয় মত-গুলোর মধ্যে, ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় মতটি বিশেষ গুরুত্ববান্‌। স্পিনোজার মতে, ঈশ্বর যে শুধু আমাদের যথার্থজ্ঞানের ব্যবস্থাপক, তা নয়; অধিকন্তু, যথার্থজ্ঞানের বিষয়গুলোর ভেতর, ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গুরুত্ব-পূর্ণ—এমন কি, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরই যথার্থ জ্ঞানের একমাত্র বিষয়। তাছাড়া, স্পিনোজা বিশ্বাস করতেন যে, আবেগভরা ভক্তি দিয়ে, জীব ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ সংযোগ স্থাপনেও সমর্থ। অবশ্য, স্পিনোজার মতে, এই আবেগ-ভরা ভক্তি বিচার-বর্জিত নয়। বরং তা হচ্ছে বিচার-যুক্ত প্রেম[3]। ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় স্পিনোজার এই সকল নতুন ধারণার উৎস হচ্ছে স্পিনোজার ভাবালু স্বভাব। এদের বীজ তাঁর সমকালীন দার্শনিক চিন্তায় দুষ্প্রাপ্য।

তবু মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, স্পিনোজা সম্পূর্ণ অভিনব চিন্তার উদ্ভাবক ছিলেন না। সুসংবদ্ধ যৌক্তিক চিন্তন—এতেই স্পিনোজার বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য। কোন একটি ধারণাকে গ্রহণ করে, তার সম্বন্ধে নিখুঁত তর্কশাস্ত্রীয় প্রণালীতে শেষ পর্য্যন্ত বিচার করে দেখা, এতেই তাঁর বিশেষ নৈপুণ্য। তাঁর চিন্তায় নূতন কল্পনার বিজলীচমক তেমন নেই। কিন্তু ধারণার পূর্ণাঙ্গ-বিকাশ সাধনে, তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তা খুবই অসাধারণ।

1 Teleogical causality.
2 Mechanics.
3 Intellectual love.

এরজন্য, বহু বুদ্ধিমান ও বিদ্বান দার্শনিক তাঁর অজস্র প্রশংসা করেছেন। তবু মনে রাখা দরকার যে, বিভিন্ন ধারণার পৃথক পৃথকভাবে যৌক্তিক গর্ভিতার্থ বার করার পরে, এগুলো গুটিয়ে পরস্পরের সাথে খাপ খাইয়ে, একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুসমঞ্জস দর্শনের আকার দেওয়ার ব্যাপারে, এই যৌক্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি তেমন ফলপ্রসূ নয়। এক ধারণার গর্ভিতার্থের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে, হয়তো অন্যান্য ধারণাগুলোর দিকে, বিশেষতঃ, হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির দিকে বাধ্য হয়েই কিছু অবহেলা করা হয়; আর তারপর, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ধারণার নিষ্কাশিত অর্থগুলোকে পরস্পরের সাথে খাপ খাওয়ানো প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। স্পিনোজার দর্শনে, হয়তো, এই কেবল যৌক্তিক পদ্ধতির অনুসরণ বশতঃই, কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি এবং অসামঞ্জস্য থেকে গেছে। অনুভবে যা কিছু পাওয়া যায়, বিজ্ঞান তার সবটুকু ঐক্যসূত্রে বেঁধে, জানার প্রয়াস করে; আর তা যতদূর সম্ভব অল্প কয়েকটি মূলীভূত তত্ত্ব বা নিয়মের সাহায্যে করার চেষ্টা করে। কিন্তু সত্যের স্বরূপ এত জটিল যে, আমাদের গৃহীত মূল ধারণাগুলোর দ্বারা তার আকলন সম্ভবপর নয়। হয়ত, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, এইভাবে জ্ঞানের অন্বেষণ সফল হতে পারে। কিন্তু যারা দার্শনিক চিন্তা দ্বারা এর বেশী কিছু আশা করেন, তারা স্পিনোজার মতন অল্প কয়েকটি ধারণা থেকে সুরু করে, ডাইনে বামে না তাকিয়ে, শুধু যুক্তির একমুখী স্রোতে বুদ্ধিকে চলতে দিয়ে, সন্তুষ্ট থাকতে পারবেন না। প্রথম থেকেই, যদি দার্শনিকের চিন্তা, বহুমুখী ও ভেদের ভেতর অভেদ-দর্শী এবং বিভিন্ন বিচারে সামঞ্জস্য সাধনে প্রয়াসী হয়, তাহ'লে দার্শনিক, হয়ত, বৈজ্ঞানিকের চেয়ে কিছু পূর্ণতর সত্যের সন্ধান পেতে পারেন। বলা বাহুল্য, স্পিনোজা নিজেও মাঝে মাঝে যুক্তির এই সংকীর্ণ পথ থেকে বাইরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এর মানে এই যে, তার্কিক স্পিনোজার চেয়ে মানুষ স্পিনোজা অনেক বড়।

দেকার্তীয় বুদ্ধিবাদের চেয়ে স্পিনোজার বুদ্ধিবাদ অনেক বেশী স্পষ্ট ও নির্ভীক। প্রকৃতপক্ষে, স্পিনোজা বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্বে এমন কোন পদার্থ নেই, যা বুদ্ধির আলোকে প্রকাশিত হবে না, এবং বুদ্ধি তার বিশুদ্ধ ধারণা ও সাক্ষাৎ-অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বিচিত্র জগতের সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানার ক্ষমতা রাখে।

দেকার্ৎ ও স্পিনোজা উভয়েই গাণিতিক-পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু গাণিতিক পদ্ধতির ভেতর দুটি রকম রয়েছে। একটি রকমকে বলা

হয় সাংশ্লেষণিক ও অপরটির নাম বৈশ্লেষণিক।[1] দেকার্ৎ তাঁর লেখার প্রায় সর্বত্র জ্যামিতীয় বিশ্লেষণ-প্রণালী অবলম্বন করেছেন। এই পদ্ধতিতে সংশ্লেষণ প্রণালীর চেয়ে যুক্তির আঁটাআঁটি যে কম, দেকার্ৎ এটা জেনেও, বিশ্লেষণ-পদ্ধতি এইজন্যে ব্যবহার করেছেন যে, এতে তিনি যে সিদ্ধান্তটি পাঠকের সামনে রাখতে চান, তা প্রথমে তিনি কিভাবে আবিষ্কার করেছিলেন, তা স্পষ্টভাবে দেখানো সম্ভবপর হয়। স্পিনোজা কিন্তু সাধারণতঃ সংশ্লেষণীয় প্রণালীই ব্যবহার করেছেন। তাঁর বিচার-প্রণালী মোটামুটি এই রকম :—(১) প্রথমে কয়েকটি লক্ষণ-বাক্যের দ্বারা তাঁর বক্তব্য শুরু হয়; (২) এগুলোর সাথে কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ[2] ও কয়েকটি স্বীকার্য[3] বাক্য সংযোগ করা হয়; (৩) তারপর মুখ্য বক্তব্য হিসেবে একটি বিধান বা প্রতিপাদ্য থাকে; এবং (৪) তারপর, এই বিধানটি যে সত্য, তা দেখাবার জন্যে পর পর কয়েকটি বাক্য থাকে—এই বাক্যগুলোর ভেতর, পরেরটির সত্যতা আগেরটির থেকে নির্ধারণ করা যায়—অবশ্য, এরজন্যে স্বতঃসিদ্ধ বাক্যগুলিও কাজে লাগে। যুক্তির এই চারটি প্রধান ধাপের পর, কয়েকটি অনুসিদ্ধান্ত[4] থাকে—এইগুলো মুখ্য সিদ্ধান্ত থেকে, অথবা এই মুখ্য সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের জন্য যে সকল বিধান ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো থেকে সাক্ষাৎভাবে অনায়াসে নির্গত হয়। কোন কোন স্থলে প্রস্তাবনা,[5] পরিশিষ্ট[6] এবং মন্তব্যের[7] আকারে দীর্ঘতর আলোচনাও সন্নিবিষ্ট হয়।

বিশ্বের প্রত্যেকটি পদার্থই যদি গণিতশাস্ত্রের বিচারে নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়, তা হলে বলতে হবে যে, যা কিছু ঘটে, তা অনিবার্যভাবেই ঘটে। মানুষের চিন্তা, সংকল্প ও কর্মও এই নিয়মের বাইরে যেতে অসমর্থ। সুতরাং চিন্তা, সংকল্প ও কর্মের ব্যাপারে, আমরা স্বাধীন নই; অর্থাৎ আমার মনে যে বিশেষ চিন্তা বা ইচ্ছা জাগলো, অথবা যে বিশেষ কাজটি আমি এখন করলাম, সেই চিন্তা, বা ইচ্ছা বা কর্মের পরিবর্তে অন্য কোন চিন্তা, ইচ্ছা বা কর্ম হয়ত হতে পারতো, এ রকম বলা চলে না।

---

1 Synthetic method and Analytic method.
2 Axiom.
3 Postulate.
4 Corollary.
5 Introduction.
6 Appendix.
7 Remark.

স্পিনোজা সর্বপ্রকার পরিবর্তন এবং ঘটনা, এমন কি আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বলবিদ্যার[1] নিয়ম প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন।

দেকার্ৎ শরীর ও মনের পারস্পরিক পরিণামকারিতা কি করে হতে পারে, তার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। এই পারস্পরিক পরিণাম-কারিতা যে অবশ্যস্বীকার্য, এটা তিনি স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারে তিনি এটাও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এই পরিণামকারিতা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। দেকার্তের সমর্থকদের মধ্যে কেউ কেউ এই পরিণামকারিতা যে বাস্তবিকই আছে, তা মানেন নি। তাঁরা বলেছেন যে, শরীর ও মন, এদের কোনটিই অপরের ওপর সাক্ষাৎ-ভাবে কোন পরিবর্তন ঘটাতে অসমর্থ ; তবু এরা একে অন্যের পরিবর্তনের উপলক্ষ বা নিমিত্ত[2] হ'তে পারে, কিন্তু এরা এই পরিবর্তনের আসল কারণ নয় ; আসল কারণ হচ্ছে ঈশ্বর। কিন্তু এইভাবে শরীর ও মনের পারস্পরিক পরিণামকারিতার ব্যাখ্যা দেওয়ার মানে হচ্ছে, এর কোন ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব, এইটাই স্বীকার করা। স্পিনোজা কিন্তু কোন সদ্-বস্তুকেই অনুপপন্ন বা অবোধ্য বলে মানেন না। তাঁর মতে, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে কোন অলৌকিক অপ্রাকৃত শক্তি হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তাই, তিনি শরীর ও মনের পারস্পরিক পরিণামকারিতা এবং তার অনুপপত্তি, দেকার্তের এই দুইটি মতই প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য, শরীর-মনের পারস্পরিক পরিণামকারিতার অবভাস অবশ্যস্বীকার্য এবং এই অবভাসের একটি সত্য হেতুও রয়েছে। তথাপি, একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এই পারস্পরিক পরিণামকারিতা একদিকে যেমন অসম্ভব, অপরদিকে তেমনি অনাবশ্যক। শরীর ও মন, একে অন্যের পরিণাম ঘটায়, এটা মানার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। কারণ, এরা আদৌ ভিন্ন বস্তু নয়, কিন্তু একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন ভূমি থেকে পরিদৃষ্ট স্বরূপমাত্র। একই বস্তুর দুটি ধর্ম—প্রসার বা বিস্তৃতি এবং চিন্তা বা চৈতন্য। এই একই বস্তু যখন তার বিস্তৃতি ধর্মের দিক্ থেকে বিবেচিত হয়, তখন তা শরীর ; আর যখন তা চৈতন্য-ধর্মের দিক থেকে বিবেচিত হয়, তখন তা মন বা আত্মা। দুই ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য পরস্পরের পরিণাম ঘটায়, এটা অসম্ভব। কারণ, এরূপ ঘটলে, দ্রব্য দুটির অনন্ততা বা স্বাধীনতা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের দ্রব্যত্ব-ও বজায় থাকবে না। তা ছাড়া, দ্রব্যের স্থির সংখ্যা

1 Mechanics.
2 Occasion, তুলনা :—"নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্"

তার স্বাধীনতা ও দ্রব্যত্বের বিঘাতক। দ্রব্যের বহুত্ব অসম্ভব। অনন্ত এক ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য। পরিবর্তন-ও এই ঈশ্বরের-ই ধর্ম ; জড়ীয় বস্তুর অবস্থান্তর-ও মানসিক বস্তুর অবস্থান্তর ; এই দুটি একই অবশ্যম্ভব জগৎ-পরিবর্তনের এপাশ ওপাশ মাত্র। কোন বিশিষ্ট জড়-ব্যক্তি ও কোন বিশিষ্ট চেতন-ব্যক্তি, উভয়েই একই অদ্বয় জগৎকারণের পরিবর্তনশীল অস্থায়ী অবস্থা মাত্র। জগৎ-কারণটি কিন্তু নিজে স্থায়ী ও অনন্ত। পরিবর্তনের অবশ্যম্ভবত্ব এবং সত্তার একত্ব, যান্ত্রিকতাবাদ[1] এবং সর্বেশ্বরবাদ[2]; এগুলো হচ্ছে স্পিনোজা-দর্শনের মূল ধারণা। বস্তুর বহুত্ব, বিশিষ্টবস্তু-ব্যক্তির অন্য-নিরপেক্ষতা, ঐচ্ছিক স্বাধীনতা, নূতনের অভিব্যক্তি, এবং বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য-মূলকতা, এসবগুলো স্পিনোজার মতে ভ্রান্তি মাত্র।

2. দ্রব্য, গুণ এবং প্রকার[3]

দ্রব্য শুধু একটিই এবং তা অনন্ত। তা অনন্ত কেন, কেনই বা তা এক ? উত্তর এই যে, দেকার্তের মতন স্পিনোজা-ও স্বাতন্ত্র্য বা অন্য-নিরপেক্ষতাকেই দ্রব্যের স্বরূপ-লক্ষণ বলে মানেন। "আমি দ্রব্য বলতে তাই বুঝি, যা নিজ সত্তাতেই সত্তাবান, যা নিজের ধারণার দ্বারাই বোধগম্য, অর্থাৎ যার ধারণা অন্য কিছুর ধারণার সাহায্য-ব্যতিরেকে করা যেতে পারে" ; আর যা সম্পূর্ণভাবে স্ব-সাপেক্ষ, তার কোন সীমা বা অন্ত থাকতে পারে না ; কারণ, তার সীমা থাকলে, যে অন্য বস্তুর সত্তার দ্বারা তা সীমাবদ্ধ হয়, নিজের সীমার ব্যাপারে, তা সেই অন্য বস্তুর সাপেক্ষ হ'তে বাধ্য। সুতরাং, দ্রব্যের এই স্ব-সাপেক্ষতা থেকে তার অসীমতা অথবা অনন্ততা নির্ধারিত হয়। আর এই অনন্ততা থেকে অত্যন্ত অনন্যসাধারণতা অথবা স্বলক্ষণত্ব প্রমাণিত হয়।

সেই বস্তুই দ্রব্য, যা অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে না, বরং যার ওপর অন্য সব কিছু নির্ভর করে, যা কারোর দ্বারা কৃত না হয়ে, অন্য সব কিছুর কারণ, যার সিদ্ধির জন্য তৎপূর্বসিদ্ধ অন্য কিছু স্বীকার করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু যা সৎ বলে প্রতীয়মান সকলবস্তুরই পূর্ব-সিদ্ধরূপে অবশ্যস্বীকার্য—তাই হচ্ছে শুদ্ধ, মৌলিক, সৎ এবং তা'ই হচ্ছে স্ব-পর সব কিছুর কারণ।

---

1 Mechanism.
2 Pantheism.
3 Substance, Attributes, and Modes.

এইভাবে স্পিনোজা বিশ্বের অনাদি কারণটিকে সর্ব সৎবস্তুর সাথে অত্যন্ত নিকট ও নিবিড় সম্বন্ধে সংবদ্ধ করেছেন। প্রাচীন এলিয়াটিক্‌দের মতন তিনি এই মূল কারণটিকে আমাদের অপূর্ণ নানা দোষে দুষ্ট জগৎ-থেকে বাইরে টেনে এনে, সুদূর উর্দ্ধে প্রাণহীন মহিমা ও শুচিতার আকাশে ছুঁড়ে ফেলেন নি। তাঁর মতে, সর্ববস্তুর অভ্যন্তরে যে-সত্তা আছে, যার প্রসাদে এরা সত্তাবান্, যা এদের স্রষ্টা ও ধারণকারী, তা'ই হচ্ছে দ্রব্য। সর্ব বস্তুর, মূল কারণ বলে, স্পিনোজা এই দ্রব্যকে ঈশ্বর নাম দিয়েছেন। অবশ্য, তিনি জানতেন যে, এই শব্দ দ্বারা খ্রীষ্টানরা যা বোঝেন, তিনি তার থেকে অত্যন্ত ভিন্ন প্রকার পদার্থ বোঝেন। তাঁর নিকট, ঈশ্বর মানে বিশ্বাতীত কোন এক চেতন অসাধারণ শক্তিশালী ব্যক্তি নন, কিন্তু ঈশ্বর মানে অসীম ও চরম সত্তা মাত্র, যা হচ্ছে সর্ব-বস্তুর হৃৎপিণ্ড বা প্রাণকেন্দ্র।

ঈশ্বর থেকে জগৎ কেমন করে আসে? ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এমন নয়; জগৎ স্বভাবত: ঈশ্বর থেকে নি:সৃত[1] হয়, তাও নয়। কিন্তু যেমন ত্রিভুজের স্বভাব থেকে অনিবার্যভাবে নিগমিত[2] হয় যে, তার কোণগুলোর সমষ্টিগত পরিমাণ হচ্ছে দুই সমকোণের সমান, তেমনি এই বিচিত্র জগৎ ঈশ্বরের স্বরূপ থেকে অনিবার্যভাবে নির্গত হয়। জগৎ ঈশ্বরের বাইরে এসে তার থেকে পৃথকভাবে অবস্থান করে, এরকম ভাবা ভুল। কিন্তু জগৎ সর্বদা ঈশ্বরের সাথে সংবদ্ধ হয়ে তাঁতেই বিদ্যমান। যেহেতু জগৎ অন্যের অর্থাৎ ঈশ্বরের আশ্রয়ে থাকে, তাই তা নিরপেক্ষ নয়। ঈশ্বর জাগতিক সর্ববস্তুর অন্ত:স্থিত হেতু,[3] তিনি বিশ্বাতীত বিশ্বস্রষ্টা নন, কিন্তু তিনি হচ্ছেন প্রকৃতির মূল প্রকৃতি বা স্বভাব[4]।

ঈশ্বরের বাইরে কিছুই নেই; সুতরাং তার ক্রিয়া কলাপ বাইরের কোন অদমনীয় শক্তির প্রভাবে ঘটে না। তাঁর কর্ম অন্য-নিয়ন্ত্রিত নয়। তিনি তাঁর কৃতির স্বাধীন কারণ, অর্থাৎ স্বীয় স্বভাব ছাড়া অন্য কিছুর প্রেরণায় তিনি কিছুই করেন না, তিনি যা কিছু করেন, তা স্ব-সত্তার স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে করেন।

---

1 Emanates.
2 Follows.
3 Reason.
4 *Natura naturans,* and not *natura naturata.*

স্বভাব দ্বারা অনিবার্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া, এই অন্তর্নিয়ন্ত্রণ কি একটি অপূর্ণতা বা ন্যূনতা নয়? না। বরং চঞ্চল, অনিয়ত ও অনিশ্চিত মনোবৃত্তি একটি মস্ত বড় অবগুণ; এবং পূর্ণস্বভাব ঈশ্বরে তার কোন স্থান নেই। স্বাধীনতা এবং অন্তর্নিয়ন্ত্রণ একই অর্থের বাচক। প্রকৃত স্বাধীনতা একদিকে অনিয়ন্ত্রিত চঞ্চল ইচ্ছা এবং অপরদিকে পরাধীনতা, এই দুয়েরই বিরোধী।

কোন ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজ করা, এটাও ঈশ্বরের স্বভাবের সাথে খাপ খায় না। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্ম অনন্ত ও পূর্ণসত্তায় আরোপ করলে, তাকে তদ্‌বাহ্য কোন প্রয়োজনের সাপেক্ষ করা হবে, এবং যা পাওয়ার জন্য ঐরূপ কর্মে প্রবৃত্তি মানা হয়, অসীম সত্তায় তার অভাব স্বীকার করতে হবে। যে-সত্তা কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তা অপূর্ণ হতে বাধ্য। ভগবৎ-প্রবৃত্তির হেতু আর ভগবৎ সত্তার হেতু অর্থাৎ তাঁর শক্তি এবং স্বরূপ-ধর্ম একই। তিনি নিজেই নিজের কারণ[1]। ঈশ্বর কখনো ছিলেন না, এরূপ কল্পনা স্ব-বিরোধী। কারণ, ঈশ্বর আছেন এই কথা না ভেবে, তাঁর কথা ভাবাই যায় না। ঈশ্বরের ধারণার ভেতর, তাঁর অস্তিত্বের ধারণাও গর্ভিত রয়েছে। নিজেই নিজের কারণ হওয়ার মানে অবশ্যম্ভবভাবে বর্তমান থাকা, অর্থাৎ অনপনেয় সত্তার অধিকারী হওয়া। "নিত্য" এই শব্দের দ্বারাও ঐ একই অর্থ ব্যক্ত হয়। নিত্যত্ব মানে স্বরূপ-সত্তা, অর্থাৎ যে-সত্তা নিত্য বস্তুর স্বরূপ থেকে অবশ্যম্ভবভাবে (যৌক্তিক নিয়মে) নিঃসৃত হয়।

অনন্ত দ্রব্যের সাথে সান্ত বিশিষ্ট পদার্থ-ব্যক্তিগুলোর যে-সম্বন্ধ, তা শুধু নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষের সম্বন্ধ নয়, অথবা কারণ ও কার্যের, কিংবা এক ও বহু, অথবা সমগ্র ও অংশের সম্বন্ধ নয়, অধিকন্তু এই সম্বন্ধটি হচ্ছে জাতি ও ব্যক্তির[2] (অথবা সামান্য ও বিশেষের), এবং নির্বিকল্প ও সবিকল্পের[3]। যার সীমা আছে, অর্থাৎ যাতে কোন কিছুর নিষেধ বা অভাব আছে, তাকে (অর্থাৎ সর্ব বিশিষ্ট ও সবিকল্প পদার্থকে) অনন্ত সত্তার স্বরূপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। কারণ, অনন্ত-সত্তা হচ্ছে নিষেধ-গন্ধহীন চরম-অস্তিত্বের বাচক। বিকল্প বা বিশেষণ কোন

---

1 *Causa sui.*
2 **Universal and Particular.**
3 **Indeterminate and Determinate.**

খাঁটি ভাব-পদার্থ প্রকাশ করে না। বিশেষণ মাত্রই সত্তার ন্যূনতা বা অভাব বা বিচ্যুতি প্রকাশ করে। বিশেষণ দ্বারা বস্তুর সত্তা নয়, কিন্তু অসত্তা বা অভাবই ব্যক্ত হয়[1]। বিশেষণ এক জিনিষ থেকে অন্য জিনিষের ভেদক; তা কোন পদার্থ কি নয়, সেটাই বলে, অর্থাৎ ঐ পদার্থের সীমা বা অবধিই নির্দেশ করে। সুতরাং ঈশ্বর সর্ব নিষেধ ও অবধি থেকে বিমুক্ত হওয়ায় তাঁকে নির্বিশেষ বা নির্বিকল্প বলতে হবে।

এখন পর্যন্ত স্পিনোজা-দর্শনের যে-সকল সিদ্ধান্তের বর্ণনা দেওয়া হল, সেগুলো সংক্ষেপে এই :—

দ্রব্য=ঈশ্বর=প্রকৃতি বা বিশ্ব। দ্রব্য ও ঈশ্বরের এই সমীকরণ দেকার্ৎই করেছিলেন। অবশ্য, তিনি তাঁর এই মত সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকতেন না। ব্রুনো নামক অপর একজন রহস্যবাদী চিন্তক[2] ব্রহ্ম-বিশ্বৈকত্ববাদের অথবা ঈশ্বর ও বিশ্বের সমীকরণের প্রায় কাছাকাছি এসেছিলেন। স্পিনোজা এই দুটি মতেরই পূর্ণতা সম্পাদন করে তাদের ঐক্য সম্পাদন করলেন।

কিন্তু স্পিনোজা অনন্তকে সর্ব পদার্থের 'নিত্য স্বরূপ' এবং 'উৎপাদক-কারণ', এই দুটি নামে অভিহিত করে, এমন একটি কথা বললেন, যা বুদ্ধির পক্ষে হজম করা কঠিন। বুদ্ধিকে বলা হচ্ছে সান্ত সর্ব পদার্থ দ্রব্যে আছে, আর এরই অর্থ হচ্ছে দ্রব্য-থেকে তাদের নিঃসরণ হয়—ঈশ্বরথেকে পদার্থ-সকল নির্গত হয়, এর অর্থ হচ্ছে এই যে, ঈশ্বরে তারা থাকে। থাকা আর নিঃসৃত হওয়া, এ দুটির মানে কি করে এক হতে পারে? এই কথা বুঝাবার জন্যে স্পিনোজা গণিতের সাহায্য নিয়েছেন। একটি ত্রিকোণের যে বিবিধ ধর্ম তার স্বরূপথেকে নিঃসৃত হয়, সেগুলো ঐ ত্রিকোণেই নিহিত থাকে; তেমনি জগতের পদার্থ সকল ঈশ্বরথেকে নিঃসৃত হলেও, ঈশ্বরেই নিহিত থাকে। সাধারণ দৃষ্টিতে স্পিনোজার এই মত ভ্রান্ত বলেই মনে হবে। এখানে "যৌক্তিক হেতু"[3] ও 'কার্যের কারণ'[4] এই দুটি ধারণা যে পরস্পর থেকে ভিন্ন, তা ভুলে যাওয়াতেই এই ভ্রান্তি ঘটেছে বলে মনে হয়। স্পিনোজা এ রকম ভাবলেন কেন? অবশ্য, হেতু ও কারণের ভেতর

---

1 *Determinatio est negatio.*
2 Mystic thinker.
3 Reason.
4 Ground.

কিছু সাদৃশ্য আছে। তথাপি, তারা কি একই পদার্থ? স্পিনোজা অবশ্য এ দুটিকে এক বলে ভেবেছেন। তাঁর মত এই যে, যুক্তিশাস্ত্র ও গণিতে যে এক বিধান থেকে অপর বিধানের সমনুগমন[1] হয়, সেটাই কারণথেকে কার্যের উৎপত্তির মূল স্বরূপ। গণিতের বিধানগুলো যখন, পর পর, একটি থেকে আর একটি নির্গত হয়, তখন ঐ নির্গমন অবশ্যম্ভব। অথচ, তার জন্য কারো ইচ্ছা-প্রযত্নের আবশ্যকতা নেই। শুধু তাই নয়। অধিকন্তু কারো ইচ্ছা বা অনিচ্ছা দ্বারা এই নির্গমন বা সমনুসরণের বিন্দু মাত্র-ও হ্রাস হয় না। স্পিনোজা ভেবেছিলেন, বিশ্বের সব বস্তু ঈশ্বরের সাথে ঐ রকম গাণিতিক সম্বন্ধে সংবদ্ধ।

অন্যান্য শাস্ত্রের তুলনায়, গণিতের বিধানগুলো অত্যন্ত বিবিক্ত ও একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ। দর্শন শাস্ত্র-ও এই স্পষ্টতা ও নিঃসন্দিগ্ধতা অর্জন করার জন্যে, গণিতের অনুসরণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে, দর্শন-শাস্ত্র এই নিঃসন্দিগ্ধতার আদর্শে পৌঁছবার চেষ্টাতেই সন্তুষ্ট থাকেনি; অধিকন্তু সর্ব-ব্যাপারে গণিতের অনুকরণ করে, তার অনুচরই হয়ে গেল।

দ্রব্যের সাথে আমাদের যে পরিচয় হয়, তা সাক্ষাৎভাবে তার সত্তা বা স্বরূপের সাথে হয় না; কিন্তু তার কোন গুণের মাধ্যমে এই পরিচয় ঘটে। দ্রব্য মানে "বুদ্ধি দ্রব্যস্থ যে-পদার্থটিকে দ্রব্যের স্বরূপ বলে উপলব্ধি করে, তা।" যে দ্রব্যের যত বেশী সত্তা, সেই দ্রব্যে তত বেশী গুণের সমাবেশ। সুতরাং অনন্ত অথবা চরম সত্তাবান দ্রব্যে অনন্ত-সংখ্যক গুণ আছে। এদের প্রত্যেকটিই দ্রব্যের স্বরূপ প্রকট করে। কিন্তু এদের ভেতর, শুধু দুটি গুণ আমাদের জ্ঞানপথে দেখা দেয়। এ দুটিকে মানুষ তার নিজের ভেতরেই দেখতে পায়। গুণ দুটি হচ্ছে চিন্তা বা চৈতন্য এবং বিস্তৃতি। যদিও মানুষ ঈশ্বরকে অর্থাৎ বিশ্বের একমাত্র দ্রব্যকে শুধু চেতন ও বিস্তৃত দ্রব্য রূপেই বুঝতে পারে, তথাপি ঈশ্বরসম্বন্ধে তার এই ধারণা স্পষ্ট ও যথাযোগ্য। গুণ দুটির স্বরূপ এ রকম যে, এদের প্রত্যেকটিকেই অন্যটির ধারণা ছাড়াই ভাবা যায়; তাই, এরা পরস্পর থেকে বিবিক্ত এবং পরস্পরের কোন অপেক্ষা রাখে না। ঈশ্বর সর্বতোভাবে অনন্ত—তাঁর অনন্ততা অত্যন্ত নিরপেক্ষ। গুণগুলিও সেই সেই জাতীয় পদার্থসকলের ভেতর অনন্ত। অর্থাৎ যত

1 Consequence.

চেতন পদার্থ আছে, তাদের মধ্যে, ঈশ্বরের চৈতন্য হচ্ছে অনন্ত; এবং বিস্তার-যুক্ত যত পদার্থ আছে, তাদের ভেতর ঈশ্বরের বিস্তৃতি হচ্ছে অনন্ত।

প্রশ্ন হচ্ছে, যা নির্বিশেষ, তার আবার গুণ বা ধর্ম কি করে থাকতে পারে? গুণগুলো কি শুধু বুদ্ধির দ্বারাই দ্রব্যে আরোপিত হয়, না, তাদের জ্ঞাতৃ-নিরপেক্ষ সত্তা-ও আছে? এই প্রশ্ন নিয়ে, স্পিনোজা-দর্শনের পণ্ডিতদের ভেতর অনেক বিতর্ক হয়ে গেছে। হেগেল ও এর্ডমান্ মনে করেন যে, গুণগুলো দ্রব্যের স্বরূপবহির্ভূত পদার্থ; বুদ্ধিই দ্রব্যে সেগুলোকে আরোপ করে: এগুলো জ্ঞাতার জ্ঞান-শক্তির আকার[1] মাত্র; স্বরূপতঃ, দ্রব্য চিৎ-ও নয়, বিস্তৃত-ও নয়; শুধু বুদ্ধির কাছে, দ্রব্য এই বিশেষণ দুটি দ্বারা বিশেষিত হয়ে অবভাসিত হয় এবং এই দুটি বিশেষণ না লাগিয়ে, বুদ্ধি দ্রব্যকে জানতে অথবা ভাবতেই পারে না। স্পিনোজীয় গুণের এই বৌদ্ধিক আকারীয় ব্যাখ্যা স্পিনোজা-লিখিত একটি পত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যাখ্যার বিরোধ-কারীদের মধ্যে বিখ্যাত দর্শন-পণ্ডিত কিউনো ফিশের একজন। বিরুদ্ধ দল বলেন যে, গুণগুলো দ্রব্যকে জানার জ্ঞাতৃনিষ্ঠ প্রকার মাত্র নয়; এগুলো দ্রব্যের বাস্তবিক ধর্ম; শুধু তাই নয়—এরাই দ্রব্যের স্বরূপ; তাছাড়া, বুদ্ধিবাদী স্পিনোজার মতে, বুদ্ধি বা যুক্তি যা যেরূপভাবে না জেনে পারে না, তা সেইভাবে বাস্তবিকই আছে, অর্থাৎ যা যুক্তিযুক্ত. তাই সত্তাবান। অবশ্য, স্পিনোজা-দর্শনের সাধারণ ভূমিকা থেকে দেখতে গেলে, দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতাদের মতটি প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাতাদের তুলনায় অধিক সমর্থনীয় বলে মনে হবে; কারণ, স্পিনোজার দর্শনে, জ্ঞাতৃ-সাপেক্ষতার কোন স্থান নেই। তবু অস্বীকার করা চলে না যে, এই দুই বিভিন্ন ব্যাখ্যার মূলে রয়েছে স্পিনোজার নিজেরই একটি অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব। তিনি যে দুটি পরস্পর-বিরোধী উদ্দেশ্য দ্বারা দার্শনিক বিচারে চালিত হয়েছেন, তাদের বিরোধ তাঁর দার্শনিক বিচারেও প্রতিফলিত হয়েছে। গুণের লক্ষণ দিতে গিয়ে, তিনি যে 'বুদ্ধি' কথাটি ব্যবহার করেছেন, তা নেহাৎ নিরর্থক নয়। চৈতন্য ও বিস্তৃতি এই গুণ দুটি পরস্পরের বিরোধী; এরা যদি পরম দ্রব্যের বাস্তবিক ধর্ম হয়, তা হলে, ঐ দ্রব্যের নির্বিশেষতাই তিরোহিত হয়ে যাবে। যাতে তা না হয়, এই

1 Forms of the understanding.

উদ্দেশ্যে গুণের লক্ষণে বুদ্ধি শব্দের সমাবেশ করা হয়েছে। কিন্তু আবার অন্য দিকে, স্পিনোজা পরমদ্রব্যের সর্বানুস্যূততা-ও রক্ষা করতে চান। এই জন্য, তিনি গুণগুলোকে স্পষ্ট ভাষায় জ্ঞাতৃ-জনিত ধর্ম বলে নির্দেশ করতে পারেন না। স্পিনোজার ভাষ্যকাররা তাঁকে যতটা স্ববিরোধমুক্ত এবং ঐকান্তিক মত পোষণকারী বলে মনে করেন, আসলে স্পিনোজা হয়ত তা নন। কিউনো ফিশের আরো বলেছেন যে, ঈশ্বরের গুণগুলো হচ্ছে তাঁর শক্তি। যদি আমরা 'কারণ' বলতে সেই অনবরোধ্য কিন্তু গতিশূন্য শক্তি বুঝি, যার জোরে একটি মূল সত্য তদনুগামী অন্যান্য সত্যের প্রতিষ্ঠা করে, তা হলে, কিন্তু ফিশেরের এই মতও সমর্থনযোগ্য।

বিস্তৃতি ও চিত্তের ভেদ যেমন দ্রব্যে না রেখে, তার নিম্নস্তরে গুণে রাখা হয়েছে, তেমনি বিশেষ বিশেষ শরীর ও মন এবং বিশেষ বিশেষ গতি ও চিন্তাগুলোকে আরও একস্তর নীচে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পৃথক্ পৃথক্ বিশিষ্ট পদার্থসকল সর্বপ্রকার নিরপেক্ষতা থেকেই বঞ্চিত। বিশিষ্ট সসীম ব্যক্তিসকল নিষেধ বা অভাবের ভারে ভারাক্রান্ত; কারণ, যে কোন বিশেষেই কোন একটি নিষেধ অন্তর্ভুক্ত; ব্যক্তিগুলোর ভেতর. যা পরামার্থত: সত্য বা বাস্তব, তা হচ্ছে ঈশ্বর। সান্তব্যক্তিগুলো অনন্ত দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ পরিবর্তনশীল অবস্থা[1] মাত্র। স্ব-স্বরূপে,[2] এরা কিছুই নয়। কারণ, ঈশ্বরথেকে পৃথকভাবে তাঁর বাইরে কিছুই সত্তার অধিকারী নয়। অনন্তের সাথে সম্বন্ধভাবে বিবেচিত হলেই, অর্থাৎ অনন্তের অবস্থারূপে বিবেচিত হলেই, এরা সত্তার অধিকারী হয়। স্ব-স্বরূপে নয়, কিন্তু নিজের থেকে ভিন্ন ঈশ্বরে থাকে বলে ধারণা করলেই, এদের সম্যক ধারণা হয়। এরা ভাগবত গুণগুলোরই বিশেষ বিশেষ পরিণাম মাত্র।

বিস্তারের পরিণাম ও চিত্তের পরিণাম—এই ভাবে অবস্থাগুলোর দুটি প্রধান শ্রেণী বা জাতি আছে। বিস্তারের সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ববান অবস্থা হচ্ছে দুটি: (১) স্থিতি ও গতি। আর চিত্তের অবস্থাগুলোরও দুই রকম রয়েছে: (১) বুদ্ধি বা বিচার এবং (২) সঙ্কল্প। অবস্থাগুলো বিশিষ্ট ও স্বল্পকাল-স্থায়ী সত্তার অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতির মূল প্রকৃতিতে[3] এদের

1 Mode.
2 In itself.
3 *Natura naturans.*

কোন স্থান নেই। স্পিনোজা ভগবানকে সর্ব অবস্থার ওপরে অর্থাৎ সম্বন্ধ ও বুদ্ধি, তথা স্থিতি ও গতির উর্দ্ধে তুলে রেখেছেন। প্রকৃতির প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা যেমন বলতে পারি যে, তাঁর স্বরূপের[1] ভেতরেই সত্তা নিহিত থাকে, সর্ব বিশিষ্ট পদার্থের সমষ্টিরূপে যে-জগৎ, তার সম্বন্ধে কিন্তু সেরকম বলা চলে না। সান্ত বস্তুর সম্বন্ধে একদিকে যেমন 'আছে' বলা চলে, আবার অপর দিকে তেমনি তার সম্বন্ধে 'নাই' এই রকমও বলা সম্ভবপর। আর এটাই হচ্ছে তাদের কাদাচিৎকত্বের[2] অর্থ। কাদাচিৎকতা মানে স্বেচ্ছাচার বা নিয়মশূন্যতা। প্রকৃতপক্ষে, জাগতিক ঘটমান সর্বপদার্থ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, ব্যতিক্রমহীন নিয়মের দ্বারা অবশ্যম্ভব-ভাবে নিয়ন্ত্রিত। যে কোন সান্ত পদার্থ-ব্যক্তি অথবা ঘটনার অস্তিত্ব ও ক্রিয়া তদনুরূপ অপর একটি সান্ত পদার্থ বা ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; আবার এই নিয়ামক কারণটির অস্তিত্ব এবং ক্রিয়া অপর একটি সান্ত অবস্থার দ্বারা জনিত। এইভাবে, নিরবধি-ধারায় সান্ত অবস্থা মাত্রই কার্যকারণ নিগড়ে আবদ্ধ—এই ধারার ভেতর কোথাও ফাঁক নেই। কার্যকারণ ধারা অনন্ত বলে, দৃশ্যমান জগতে কোথাও প্রথম অথবা শেষ কারণ বলে কিছু নেই। সান্ত কারণ মাত্রই দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণ—প্রথম বা আদি কারণ হচ্ছে এর ওপরের স্তরে এবং তা স্বয়ং ঈশ্বর। নীচের স্তরে, সান্ত অবস্থামাত্রই কারণ-পরম্পরার নীরন্ধ্র ও অনন্ত শৃঙ্খলে বাঁধা—এতে কোথাও বিন্দুমাত্র আকস্মিকতা ইচ্ছা-মতন নির্বাচন, অথবা উদ্দেশ্যমূলক প্রণোদনের অবকাশ নেই। যা যে-ভাবে আছে বা ঘটে, তা অন্যভাবে থাকতে বা ঘটতে পারে না।

কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার দুটো বিভাগ আছে: (১) বিস্তৃতির অবস্থা-বিশেষ, আর তা বিস্তৃতিরই অপর এক অবস্থা বিশেষের দ্বারা জনিত; (২) চিত্তের অবস্থা-বিশেষ; আর তা চিত্তেরই অন্য অবস্থা-বিশেষের দ্বারা উৎপন্ন হয়—প্রত্যেকটি পদার্থ-ব্যক্তি যে অপর ব্যক্তির সাহায্যে অস্তিত্ব লাভ করে, তা তৎশ্রেণীয় হওয়া অত্যাবশ্যক। এই দুই কার্যকারণ-প্রবাহ পরস্পরের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে চলে—কোন প্রবাহই অন্য প্রবাহে হস্তক্ষেপ করতে অথবা কোনরকম পরিণাম ঘটাতে অসমর্থ; গতি শুধু গতিই উৎপন্ন করতে পারে, অন্য কিছু নয়; মনের অবস্থা বা বৃত্তি, অন্য

1 Essence.
2 Contingency.

বৃত্তি ছাড়া আর কিছুই অস্তিত্বে আনতে পারে না ; শরীর কখনও মনে কোন বৃত্তির জনক হয় না ; মনও তেমনি কোন শারীরিক ক্রিয়ার উৎপাদনে অসমর্থ। তবু, বিস্তৃতি ও চিন্ত ত আর পরস্পর বিভিন্ন দুটি দ্রব্য নয়, কিন্তু একই দ্রব্যের বিভিন্ন গুণ বা ধর্মমাত্র ; অতএব আপাত দৃষ্টিতে যা পৃথক ও সমান্তরাল দুটি সারূপ্য-যুক্ত কারণ-ধারা বলে মনে হয়, তা আসলে একই ধারা ; শুধু দুটি ভিন্ন দিক থেকে দৃষ্ট হয় বলে, তা বিভিন্ন আকারে দেখা দেয়। বিস্তৃতির দিক থেকে যা কতকগুলো গতির পরম্পরা বলে প্রতীয়মান হয়, তাই চিত্তের দিক থেকে দেখলে, কতকগুলো মানসিক বৃত্তি বা ধারণার ধারা বলে লক্ষিত হয়। আত্মা মানে কোন জীবন্ত শরীরেরই ধারণা ; আর শরীর বা গতি মানে বিস্তৃতি-যুক্ত এমন একটি পদার্থ বা ঘটনা, যা কোন মানসিক বৃত্তি বা ধারণার অনুরূপ। এমন কোন মানসিক ধারণা নেই, যদনুগ একটি শারীরিক অবস্থা নেই ; এমন কোন শারীরিক অবস্থাও নেই, একই সময়ে যার নিজানুরূপ কোন বৌদ্ধিক ধারণা নেই। অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থ একই সঙ্গে জড় শরীরও বটে, আবার আত্মা বা মনও বটে—সকল জিনিষই চেতন বা প্রাণযুক্ত। প্রকৃতির এই সার্বত্রিক নিয়ম মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। "আমাদের শারীরিক ক্রিয়া[1] ও নিষ্ক্রিয় অবস্থাসকলের[2] ক্রম এবং মানসিক ক্রিয়া ও নিষ্ক্রিয় অবস্থাগুলোর ক্রম স্বরূপতঃ[3] পরস্পরের সমকালীন।"[4]

জড় ও চেতনের সম্বন্ধটি যে কি, তা নির্ধারণ করা স্পিনোজা-দর্শনের একটি মস্ত বড় সমস্যা। জড়জগৎ ও মনোজগতের ভেতর অবিচ্ছিন্ন অনুরূপতা বা সমনুগামিতা আছে এবং তদুপরি তাদের দ্রব্যগত ঐক্যও বিদ্যমান—এই মতের সাহায্যে উক্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে দার্শনিক চিন্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী, এমনকি এই চেষ্টা সমর্থনযোগ্য বলেই মনে হবে। তবু, স্পিনোজা যে-ভাবে এই সমাধানের চেষ্টা করেছেন, তার সম্বন্ধে স্বতঃই কয়েকটি আপত্তি ওঠে। প্রত্যেক শারীরিক ঘটনার অনুরূপ একটি মানসিক বৃত্তি আছে, আবার প্রত্যেক মানসিক বৃত্তির অনুরূপ একটি শারীরিক অবস্থা আছে, এই মতের বিরুদ্ধে যে আপত্তি

---

1 Actions.
2 Passions.
3 In nature.
4 *Ethics*, Prop. 2 schol.

ওঠে, স্পিনোজা তা দূর করার কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নি। তেমনি শরীরের সাথে গতির এবং মনের সাথে চিন্তার সম্বন্ধটির স্বরূপ কি, এবং শরীর ও মনের সাথে অস্তিত্বের বা সত্তার সম্বন্ধ কি, এসব কথারও স্পিনোজা কোন স্পষ্ট এবং সোপপত্তিক[1] উত্তর দেন নি। কেউ কেউ যে স্পিনোজার দর্শনে জড়বাদের[2] দিকে একটি ঝোঁক্ দেখতে পান, তাও একেবারে অকারণ নয়। তাঁর নিকট, শরীরত্ব ও সত্তা প্রায় একই অর্থের বাচক। সুতরাং জড়বস্তু যতটুকু সত্তার অধিকারী হতে পারে, মন ও মানসিক বৃত্তি তার থেকে বেশী সত্তার দাবী করতে পারে না। তাছাড়া, কেউ কেউ দেখিয়েছেন যে, স্পিনোজার দর্শনে অবস্থা-ব্যক্তিগুলোর সত্তা এবং গুরুত্ব এই দুটোর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। যে অদ্বয়তত্ত্ব তিনি প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন, কিছু পরিমাণে তাঁর ঐ কাজে এই আকর্ষণ সাহায্য করলেও, আসলে এই আকর্ষণটি উক্ত অদ্বয়বাদের বিরোধী। স্পিনোজা যে-ভাবে মন ও ধারণার সম্বন্ধটি নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন, তাতে এই প্রবণতা সুস্পষ্ট। কারণ, তাঁর মতে, মন বা আত্মা হচ্ছে কতকগুলো ধারণার সমষ্টি। কিন্তু সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, মন বা আত্মা হচ্ছে এমন একটি বস্তু, যা তার বিশিষ্ট অবস্থা বা ধারণাগুলোর থেকে ভিন্ন হয়েও, তাদের মালিক, যা ধারণাগুলোর আশ্রয়, যা শুধু তাদের সমষ্টি নয়। কিন্তু স্পিনোজা এই রকম দ্রব্যাত্মক আত্মা বা মন স্বীকার করেন নি। তাঁর কাছে দেকার্তীয় "আমি চিন্তা করছি", এই কথাটি একটি নির্ব্যক্তিক চিন্তা মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। যেহেতু অসীমের অনন্যসাধারণ দ্রব্যত্ব আছে, অতএব বিশিষ্ট আত্মাগুলোর দ্রব্যত্ব থাকা অসম্ভব। অবশ্য, আত্মা যে দ্রব্য,-এর পক্ষে যুক্তি এই যে, তাতে অহংত্ব অর্থাৎ স্ব-প্রকাশ চৈতন্যের একটি একত্ববোধ আছে। কিন্তু আত্মাকে যদি কতকগুলি ধারণা বা বৌদ্ধিক বৃত্তির জটপাকানো একটি সমষ্টি বলে ভাবা যায়, তাহলে এই অহংত্বের কোন পাত্তা পাওয়া যাবে না। জীব বা বিশিষ্ট আত্মা স্ব-সত্তায় সত্তাবান বলে মনে হয় বটে, কিন্তু তা অদ্বয়মতের বিঘাতক। তাই, কোন কোন দার্শনিকের দৃষ্টিতে অদ্বয়বাদ চৈত্বিক পরমাণুবাদের[3] আকারে দেখা দেয়, আর মন বা আত্মা কতকগুলো বৌদ্ধিক-বৃত্তিতে বা ধারণায় পরিণত হয়।

---

1 Intelligible
2 Materialism
3 Spiritual atomism

স্পিনোজা অনন্ত বা অসীম অবস্থা বলে একটি নতুন রকমের পদার্থ কল্পনা করেছেন। এই কল্পনা তাঁর মূল দর্শনের সাথে কিছুটা বিসংগত; আর তিনি এই কল্পনাটিকে বিশেষ কোন কাজেও লাগাননি। যে-সকল বাক্যে স্পিনোজা এই কল্পনাটির বর্ণনা দিয়েছেন, সেগুলো বুঝতে পারা কঠিন। এ সম্বন্ধে কিউনো ফিশেরের[1] ব্যাখ্যা এই। অনন্ত-অবস্থাকে সর্ব বিশিষ্ট অবস্থাগুলোর একটি সুসংবদ্ধ সমষ্টি বলে বুঝতে বুঝতে হবে। সান্ত অবস্থার সমষ্টি হলেও, সমষ্টি কিন্তু নিজে অনন্ত। এই অনন্ত অবস্থা হচ্ছে বিশ্ব অর্থাৎ সর্বব্যষ্টির সাকল্য, কিন্তু এই সাকল্যে ব্যষ্টিদের বিশিষ্টরূপ যে-বিস্তৃতি অথবা চিত্ত, সেই রূপটি থাকে না, শুধু তাদের সর্বসাধারণ রূপটি থাকে; সর্ব গতি ও স্থিতির সাকল্যে পাওয়া যায় অনন্ত জড়সত্তা এবং সর্ব ধারণা অর্থাৎ অন্তঃকরণ-বৃত্তির সাকল্যে পাওয়া যায় অনন্ত চিৎ-সত্তা। সর্ব চেতন-ব্যষ্টির সমাহার হচ্ছে যেন একটি অনন্ত বদ্ধি। এটাই ঐশ্বরিক বুদ্ধি। আমাদের ব্যষ্টি-মন এই ঐশ্বরিক বুদ্ধির অংশ। কিন্তু এর অর্থ এমন নয় যে, সমগ্র অংশীটি অংশগুলোর একত্র সমাবেশ মাত্র। ব্যষ্টি-মন ঈশ্বর-বুদ্ধির অংশ, একথার অর্থ শুধু এই যে, অংশটি অংশীর ওপর নির্ভর করেই অস্তিত্ববান্। আমরা যখন বলি যে, আমাদের মন এটা কিংবা ওটা প্রত্যক্ষ করছে, তখন আসলে ঈশ্বরে এটা কিংবা ওটার ধারণা রয়েছে, শুধু একথাই বলা হচ্ছে। অবশ্য, ঈশ্বরের অনন্ত স্বরূপে এসকল ধারণা থাকা সম্ভবপর নয়। কিন্তু মানব-মনের সার-পদার্থরূপে ঈশ্বর যেভাবে ঐ মনে প্রকট হয়েছেন, সেই প্রকটরূপেই এ সকল ধারণা ঈশ্বরে বর্তাতে পারে।

সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে স্পিনোজার ঈশ্বরতত্ত্ব[2]। এখন তাঁর মন[3] এবং মানববিষয়ক[4] তত্ত্ব বর্ণিত হবে।

3. মানব-তত্ত্ব

জ্ঞান ও এষণা: অনেকবার বলা হয়েছে যে স্পিনোজার মতে প্রত্যেক বস্তুই একদিকে মন এবং অপরদিকে শরীর, একদিকে ধারণা, আবার অপরদিকে ধারণার বিষয়। শরীর ও আত্মা বা মন হচ্ছে আসলে

1 Kuno Fischer
2 Doctrine of God
3 Mind
4 Man

দুটি ভিন্ন গুণের দিকথেকে পরিদৃষ্ট একই পদার্থের দুটি ভিন্ন রূপ। সুতরাং মানব-মন হচ্ছে মানব-শরীরের ধারণা। নিজের শরীরের পরিণাম উপলব্ধি করা মানে নিজেকে জানা। শরীরে যা যা ঘটে, সেই সবই মনে প্রতিফলিত হয়। অবশ্য, প্রত্যেক শারীরিক ঘটনা যথাযোগ্যভাবে ও পুরোপুরিভাবে মনে প্রতিফলিত হয় না। মানুষের শরীর যেমন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শরীরের দ্বারা গঠিত, তেমনি মানুষের মনও অসংখ্য ধারণার দ্বারা গঠিত। মানুষের মন ও ইতর প্রাণীদের মনে যে উৎকর্ষের বিভিন্নতা দেখা যায়, তা তাদের শারীরিক উৎকর্ষের বিভিন্নতারই অনুরূপ। যে শরীরের গঠন যত বেশী জটিল এবং যত বেশী রকমের প্রতিক্রিয়া করতে সমর্থ, সেই শরীরের সাথে জড়িত আত্মা বা মন তত বেশী উন্নত এবং তত বেশী উচ্চ জ্ঞানলাভে সমর্থ।

এই মতটিকে এক প্রকার শরীরাত্মৈক্যবাদ[1] বলা যায়। এর একটি অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, এটা মানলে আমাদের ইচ্ছা এবং ইচ্ছা-প্রণোদিত ক্রিয়াগুলোকে স্বাধীন বলে গণ্য করা চলে না। কারণ, এইরূপ ইচ্ছা ও ক্রিয়া আসলে চিত্ত্বগুণের দিক থেকে বিবেচিত শরীরেরই পরিণাম—শরীরের পরিণামগুলো যেমন কার্যকারণের নিগড়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা, তেমনি তথাকথিত স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্রিয়াগুলোও অনুরূপ শৃঙ্খলে বাঁধা। অবশ্য, মন যখন একটা কিছু করে, তখন সে এটাও জানে যে, সে তা করছে; অর্থাৎ মনের ক্রিয়াগুলো সচেতন বা স-জ্ঞান; সুতরাং মনের ক্রিয়া মানে শুধু মানব শরীর সম্বন্ধীয় ধারণা নয়, কিন্তু শরীর সম্বন্ধীয় ধারণার ধারণা অথবা মন-সম্বন্ধীয় ধারণা।

এলিয়াটিক্‌স্‌দের মতন যাঁরা শুদ্ধ সত্তাকে পরিদৃশ্যমান পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যময় জগৎ থেকে পৃথক বলে মনে করেন, তাঁরা শুদ্ধ সত্তাকে জানার উপায় এবং জগৎকে জানার উপায় এই দুটির মধ্যেও একটি জাতিগত পার্থক্য মানতে বাধ্য হন। জগতের বহুবিধ বস্তুব্যক্তিগুলোর জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানের করণ বা উপায়কে স্পিনোজা কল্পনা[2] নাম দিয়েছেন; আর সর্বব্যাপী এক মাত্র সৎ-তত্ত্ব যে-দ্রব্য, তাকে জানার উপায়টিকে বুদ্ধি[3] এই নাম দিয়েছেন। কল্পনা মানে সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় ইন্দ্রিয় দ্বারা জনিত ধারণা। এটা অপূর্ণ, অস্পষ্ট, অবিবিক্ত ও

1 The theory of psycho-physical indentity.
2 Imagination.
3 Intellect.

গোলমেলে[1]। এ রকম ধারণার থেকে নিষ্কর্ষণ[2] পদ্ধতির দ্বারা যে-বিধারণা[3] তৈরি হয়, তা, এবং ইন্দ্রিয়-সংবেদন ও স্মৃতি-মূলক মনশ্চিত্র, এ সবই কল্পনার অন্তর্ভুক্ত। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষে বিষয় হচ্ছে শরীরের পরিণাম বিশেষ। জ্ঞানের এই প্রাথমিক স্তরে, বাহ্য বস্তু, নিজের শরীর প্রভৃতি সম্বন্ধে মন যে জ্ঞান আহরণ করে, তা অত্যন্ত অবিবিক্ত বা বিমিশ্র ও খণ্ডিত[4]। উদাহরণস্বরূপ, বাহ্য পদার্থ থেকে উষ্ণতা নামক কিছু অংশ, এবং শরীর থেকে কিছু অংশ এক সাথে মিশে যায়, আর মন এদুটি অংশকে পৃথক করতে পারে না। এই জন্য, এ রকম ধারণাকে বিমিশ্র বলা হচ্ছে। তা ছাড়া, এরূপ ধারণা বা মনোবৃত্তি অপূর্ণ হতে বাধ্য। তাব'লে যে এরূপ ধারণা মিথ্যাই হবে, এমন কোন নিয়ম নেই। অবশ্য, ধারণাটি যে পূর্ণাঙ্গ নয়, তা না জেনে, ঐ ধারণাটিকে যদি পদার্থের পূর্ণাঙ্গ ধারণা বলে মনে করা হয়, তাহলে কিন্তু ধারণাটি মিথ্যা হয়ে পড়ে। বহু ব্যক্তির সাধারণ-ধর্মের বিধারণা,[5] উদ্দেশ্যের কল্পনা, ঐচ্ছিক স্বাধীনতার কল্পনা—এগুলো মিথ্যা ধারণার কয়েকটি মুখ্য উদাহরণ। সামান্যীয় বিধারণা যত বেশী ব্যাপক ও নিকৃষ্ট হয়, ততই তা অস্পষ্ট ও অবিবিক্ত হয়ে পড়ে। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য বা বিভেদ কেটে-ছেটে সামান্যীয় বিধারণা তৈরি করা হয়। এতে বেশ বোঝা যায় যে, সত্যের আকলনে সামান্যীয় বিধারণার উপযোগিতা অত্যল্প। সামান্যীয় ধারণা, তার কোন প্রতীক, অথবা তার বাচক কোন শব্দ প্রভৃতির সাহায্যে আমরা যে-জাতীয় জ্ঞান আহরণ করি, তা শুধু কল্পনার পর্যায়েই পড়ে, এতে সত্যের উপলব্ধি হতে পারে না। তেমনি উদ্দেশ্য ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য কল্পনা নিরর্থক, এমনকি অনিষ্টকর। আমরা ভাবি যে প্রকৃতির সামনে যেন কয়েকটি আদর্শ মনশ্চিত্র শূন্যে বিলম্বিত হয়ে আছে, আর প্রকৃতি সেগুলোকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; প্রকৃতির এই চেষ্টা সফল হয়েছে বলে যদি আমরা মনে করি, তা হলে এসব বস্তুকে আমরা সুন্দর বা পূর্ণ এই আখ্যা দিই; আর যদি মনে করি যে, প্রকৃতির এই চেষ্টা বিফল

1 Confused.
2 Abstraction.
3 Concept.
4 Mutilated.
5 General concepts.

হয়েছে, তা হলে আমরা এইরূপ বস্তুকে অপূর্ব বা কুৎসিত এই নাম দিয়ে থাকি। এ সকল মূল্য-জ্ঞাপক ধারণা হচ্ছে কল্পনা-রাজ্যের অন্তর্গত। ঐচ্ছিক স্বাধীনতার ধারণাটিও তথৈব। যার জোরে আমাদের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয়, তার অজ্ঞান থাকাতেই আমরা ঐচ্ছিক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। স্বাধীন সঙ্কল্প বা ইচ্ছা নামক পদার্থটি আসলে একটি নিকৃষ্ট ধারণা মাত্র। সঙ্কল্প বলতে আসলে কয়েকটি বিশিষ্ট কাজ করার ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। সঙ্কল্প নামক কোন প্রকৃত বস্তু নেই, এটি একটি অবাস্তব কল্পনা-জাতীয় পদার্থ। এই কথাটি ভুলে যাওয়াতেই, সাঙ্কল্পিক স্বাধীনতার ধারণাটি উৎপন্ন হয়। এই ধারণার উৎপত্তির অপর একটি কারণ এই যে, আমরা যখন কোন ক্রিয়া করি, তখন ঐ ক্রিয়া ও তার প্রেরণা-দায়ক ধারণাগুলোর সম্বন্ধে সচেতন থাকি; কিন্তু তার আসল কারণগুলোর সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান থাকে না। তৃষ্ণার্ত শিশু মনে করে যে, সে নিজ থেকেই জল খেতে চায়; আর অত্যন্ত ভীতু মানুষ যখন বিপদের মুখ থেকে পালিয়ে যায়, তখন সে মনে করে যে, তার এই পলায়ন তার স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারাই প্রণোদিত হয়। পাথরের যে-খণ্ডটি পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ছে, তার যদি জ্ঞান থাকতো, তা হলে সেও নিজেকে স্বাধীন ক্রিয়ার কর্তা বলেই ভাবতো।

বিচার-জনিত সত্য এবং পূর্ণজ্ঞানেরও তারতম্য আছে; অন্ততঃ, তাদের মাত্রাগত দুটি ভেদ স্বীকার করা আবশ্যক: (১) অনুমান, অর্থাপত্তি প্রভৃতির দ্বারা আহৃত যৌক্তিক জ্ঞান এবং (২) স্বতঃসিদ্ধ সাক্ষাৎ অনুভব-জনিত যৌক্তিক জ্ঞান।[1] দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে দর্শনের মূল তত্ত্বগুলো, এবং প্রথম প্রকার জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে তাদের থেকে নিঃসৃত তত্ত্ব-সকল। প্রজ্ঞা বা বিচার-বুদ্ধি নিকৃষ্ট বিধারণা ব্যবহার না ক'রে, কিছু সামান্যের ধারণার সাহায্যে পদার্থের তত্ত্ব বুঝতে চায়। জাতি বা শ্রেণী বলে কোন বাস্তবিক পদার্থ নেই বটে, তবু কোন শ্রেণীর অন্তঃপাতী ব্যক্তিগুলোতে একটা কিছু বাস্তবিক সাধারণ ধর্ম থাকে। আর বিচারবুদ্ধি এইগুলোকে কাজে লাগায়। শরীর মাত্রেরই একটি সাধারণ ধর্ম আছে; কারণ, শরীরগুলো বিস্তৃতিরই প্রকার বিশেষ। তেমনি সর্ব মন ও ধারণার সাধারণ ধর্ম এই যে, এরা সবাই চিত্তের প্রকার বিশেষ। আর পদার্থ মাত্রের

1 Rational Knowledge

সাধারণ স্বভাব এই যে, তারা ভাগবত দ্রব্য ও তাঁর গুণগুলোর বিভিন্ন প্রকার বা রকম। এবং "যা সর্বানুস্যূত, যা অংশেও আছে, অংশীতেও আছে, তার ধারণা পূর্ণ না হয়েই পারে না।" বিস্তৃতি, চিন্তা ও ঈশ্বরের শাশ্বত ও অনন্ত স্বরূপের ধারণাগুলো যথাযোগ্য ও পর্যাপ্ত। প্রত্যেক বিশিষ্ট সৎবস্তুর যথোচিত ধারণায় ঈশ্বরের ধারণাও গর্ভিত থাকে। কারণ, কোন বিশিষ্ট বস্তুই ঈশ্বর থেকে পৃথকভাবে থাকতেও পারেনা, আর ঈশ্বর থেকে পৃথকভাবে তার সম্বন্ধে সম্যক ধারণাও করা যায় না। 'ঈশ্বর-বিষয়ক হলে, যে-কোন ধারণাই সত্য।' দ্রব্য এবং তার গুণগুলোর ধারণা অন্য ধারণার সম্বন্ধ ছাড়া নিজ স্বরূপেই বোঝা অথবা সাক্ষাৎভাবে জানা সম্ভবপর। তাই, এই ধারণাগুলো অন্য-নিরপেক্ষ, মৌলিক ও স্বতঃসিদ্ধ।

এইভাবে জ্ঞানের তিনটি প্রকার, মাত্রা বা শক্তি পাওয়া গেল। যথাক্রমে এইগুলো হচ্ছে (১) ঐন্দ্রিয়িক অর্থাৎ কাল্পনিক ধারণা,[1] (২) বিচারবুদ্ধি[2] ও (৩) প্রত্যক্ষানুভূতি[3]। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার জ্ঞান অবশ্যম্ভবভাবে সত্য। আর মিথ্যা থেকে সত্যের পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য, এই দুই প্রকার জ্ঞানই আমাদের একমাত্র উপায়। আলো যেমন নিজেকে ও অন্ধকারকেও প্রকাশ করে, তেমনি সত্যও নিজের এবং মিথ্যার নির্ণায়ক[4]। সত্য মাত্রই নিশ্চয়াত্মক এবং নিজের সাক্ষী। পর্যাপ্ত জ্ঞানে, বস্তুসকল ব্যক্তিরূপে বিবেচিত হয় না; কিন্তু তাদের পরস্পরের ভেতর যে অবিচ্ছেদ্য[5] সম্বন্ধ আছে, এবং তারা যে জগতের হেতুভূত অধিষ্ঠান থেকে নিত্য-নির্গত[6] হয়, এই পরম সত্যের দিক থেকেই তারা তখন বিবেচিত হয়ে থাকে। শাশ্বত তত্ত্বের দৃষ্টিতেই[7] বিচারবুদ্ধি সর্ববস্তু প্রত্যক্ষ করে।

অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে হৃদয়াবেগ[8] সম্বন্ধে, স্পিনোজার মত দেকার্তীয় মতের ওপর বেশি নির্ভর করে। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে যেমন, এখানেও তেমনি, স্পিনোজা অধিকতর যুক্তিদার্ঢ্য ও কল্পনা-লাঘবের প্রযত্ন করেছেন

1 Sensuous or Imaginative representation.
2 Reason.
3 Immediate intuition.
4 Criterion.
5 Necessary.
6 Eternally deduced.
7 *Sub specie aeternitatis.*
8 Emotion.

এবং তাতে বেশ সকলকামও হয়েছেন। স্পিনোজা মনে করেন যে, দেকার্ৎ এই বিষয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মবিচার অবতারণা করেও নিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হতে পারেননি ; এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁর স্বাধীনতা-বিষয়ক ভ্রান্ত ধারণা। স্পিনোজার পূর্ববর্তী লেখকরা হৃদয়াবেগ সমূহের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে ব্রতী না হয়ে, এগুলোর নিন্দা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'রে, এগুলো জীবের মহা দুর্ভাগ্যের কারণ বলে বিলাপ করেছেন। স্পিনোজা কিন্তু হৃদয়াবেগগুলোকে জঘন্য নাম দিয়ে পরিহাস করে উড়িয়ে দিতে রাজী হননি। বরং তিনি ওগুলোকে নৈসর্গিক নিয়মের সাহায্যে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। ঘৃণা, রাগ, লোভ প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলোকে তিনি অবগুণ মনে না করে, মানব প্রকৃতির একটি অবশ্যম্ভব (যদ্যপি ক্লেশকর) অঙ্গ বলে মেনেছেন। উষ্ণতা ও শৈত্য, বজ্র ও বিদ্যুৎ প্রভৃতির যে-রকম কার্যকারণীয় ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, হৃদয়াবেগগুলির সম্বন্ধেও সেরূপ ব্যাখ্যা বাঞ্ছনীয়। মন হচ্ছে একটি সসীম ও সবিশেষ পদার্থ। তাই, তা নিজের অস্তিত্ব ও ক্রিয়ার জন্য অন্যান্য সসীম বস্তুর ওপর নির্ভর করে এবং তাদের সম্বন্ধ ব্যতিরেকে মনের স্বভাব বোঝা অসম্ভব। প্রকৃতির সাধারণ প্রবাহে মন যখন জড়িত হয়, তখন তার থেকে নানারকম অপূর্ণ ধারণা অনিবার্য-ভাবে নিঃসৃত হয় এবং এই সকল ধারণা থেকেই মনে পরাধীন অবস্থা অর্থাৎ হৃদয়াবেগগুলো উৎপন্ন হয়। সুতরাং, সসীমতা ও নিষেধ এই দুটির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়াতেই মন হৃদয়াবেগগুলোর মালিক হয়।

আকস্মিক অথবা কাদাচিৎক[1] ও বিনাশশীল পদার্থের ধ্বংস, তার বহির্ভূত কোন কারণের দ্বারা সংঘটিত হয়। কোন পদার্থই নিজ থেকে আপনা আপনি নষ্ট হয়ে যায় না। প্রত্যেক জিনিষই যথাসাধ্য নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য চেষ্টা করে থাকে। স্বাস্তিত্ব বজায় রাখার এই মৌলিক প্রচেষ্টা প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ বা স্বভাবের অন্তর্বর্তী। এই প্রচেষ্টা[2] যখন মনের ধর্ম বলে বিবেচিত হয়, তখন তাকে সংকল্প বা এষণা[3] বলা হয়। আর যখন প্রযত্নকে মন ও শরীরের মিলিতভাবে ব্যাস-জ্যবৃত্তি ধর্ম বলে মনে করা হয়, তখন তার নাম হয় ক্ষুধা, স্পৃহা বা লালসা[4]। জ্ঞানযুক্ত স্পৃহাকেই সংকল্প বলে। আমরা যা চাই বা

---

1 Contingent.
2 *Conatus*.
3 Will.
4 Desire, *Cupiditas*.

আকাঙ্ক্ষা করি, তাকেই "ভাল" অথবা "হিতকর" বলি। একথা ঠিক নয় যে, কোন জিনিষ ভাল বলে আমরা তা চাই। বরং আমরা যা চাই, তাকেই ভাল বলা হয়। স্পিনোজা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া হৃদয়াবেগের আরো দুটি মূল শ্রেণী মেনেছেন। এদুটো হচ্ছে সুখ ও দুঃখ। যা আমাদের শরীরের ক্রিয়াশক্তি বাড়ায়, তা ভাবলেই, আমাদের আত্মার চিন্তাশক্তি বাড়ে এবং আত্মা সানন্দে তার কথা ভাবে। "সুখ" মানে মানুষের পূর্ণতর অবস্থায় পরিবর্তন, আর 'দুঃখ' মানে ন্যূনতর অবস্থায় পরিবর্তন।

দেকার্ৎ মূল ছটি ভাবাবেগ মেনেছেন। স্পিনোজা এগুলোর সংখ্যা কমিয়ে উপরিবর্ণিত তিনটি প্রধান শ্রেণীতে পরিণত করেছেন। অন্যান্য হার্দিক ভাব এদেরই সংযোগবিয়োগে গঠিত হয়। মূল তিনটি হৃদয়াবেগ থেকে অন্যান্য হৃদয়াবেগগুলোকে নিঃসৃত করার সময়, স্পিনোজা মাঝে মাঝে খুবই কৃত্রিম কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। তবু অধিকাংশ স্থলে, এই নিঃসরণের কাজটুকু তাঁর বেশ নিপুণ ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় দেয়। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে, এগুলোর বেশ মূল্য আছে; দু-একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। যাতে সুখ হয়, তা আমাদের সত্তা বৃদ্ধি করে, আর যা দুঃখদায়ক, তাতে আমাদের সত্তার হ্রাস হয়। তাইতে, আমরা সুখকর হৃদয়াবেগের কারণগুলো সংরক্ষণের চেষ্টা করি ও তাদের দিকে সহজেই আমাদের ভালবাসা ধাবিত হয়। তেমনি আমরা দুঃখজনক ভাবাবেগের কারণগুলো দূর করার চেষ্টা করি, আর তাদের প্রতি সহজেই আমাদের ঘৃণা বা দ্বেষ উৎপন্ন হয়। "সুখের সাথে তার বাহ্যকারণের ধারণা সংযুক্ত হ'লে, তাকে প্রেম বা ভালবাসা বলে, তেমনি দুঃখের সাথে তার বাহ্যকারণের ধারণা সংযুক্ত থাকলে, তাকে দ্বেষ বা ঘৃণা বলে।" যে সকল কারণে, আমাদেয় প্রেমাস্পদের সত্তা বাড়ে বা কমে, সেগুলো আমাদের ওপরও অনুরূপ পরিণাম ঘটায়। এইজন্য যা প্রেমাস্পদের আনন্দবর্ধক, তা আমাদের ভাল লাগে, আর যা আমাদের প্রেমাস্পদের দুঃখের কারণ হয়, তার প্রতি আমরাও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হই। প্রেমাস্পদের সুখ-দুঃখে আমাদের সুখ-দুঃখ হয়। বিদ্বেষের বস্তুর ব্যাপারে অবশ্য এর বিপরীত অবস্থা। যাকে দেখতে পারি না, তার সৌভাগ্যে আমাদের দুঃখ হয়, আর তার দুর্ভাগ্যে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠি। যদি কোন ব্যক্তির প্রতি আমাদের কিছুমাত্র ভাবাবেগ উৎপন্ন না হয়, তাহলে কিন্তু আমরা অনিচ্ছাকৃত অনুকরণের দ্বারা তাদের সুখ-দুঃখের প্রতি সহানুভূতি দেখাই। একদিকে যেমন আমরা সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে চাই, তেমনি অনুকম্পা বা দয়া থেকেও মুক্ত হতে চাই।

তাই, দয়া হলে আমরা পরোপকারী অর্থাৎ অন্যের ক্লেশ দূর করার জন্য প্রবৃত্ত হই। ভাগ্যবানদের প্রতি ঈর্ষা এবং দুর্দশাগ্রস্তদের প্রতি অনুকম্পা এই দুটিরই মূল হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিস্পর্ধা। স্বভাবতঃ মানুষ ঈর্ষা-পরায়ণ ও পরবিদ্বেষী। বিদ্বেষ সহজেই অন্যকে ছোট বলে ভাবে। তেমনি ভালবাসা অন্যকে বড় করে দেখে; আর নিজের প্রতি অনুরাগের পরিণতি হচ্ছে অহংকার অথবা মিথ্যা আত্ম-তৃপ্তি। দ্বেষ, ঈর্ষা, অহংকার বা আত্মতৃপ্তি, এগুলো অকৃত্রিম নম্রভাব থেকে অধিক স্পষ্টভাবে দৃষ্টি-গোচর হয়। সম্মানের জন্য অপরিমিত ইচ্ছার অপর নাম হচ্ছে উচ্চকাঙ্ক্ষা। অন্যকে খুশি রাখার ইচ্ছাকে যদি যথাযোগ্য সীমার ভেতরে আবদ্ধ রাখা যায়, তাহলে লোকে একে নম্রতা, ভদ্রতা ও বিনয় প্রভৃতি নামে প্রশংসা করে। উচ্চাভিলাষ, বিলাসিতা, মাতলামি, লোভ এবং কামলিপ্সা, এগুলোর বিপরীত কোন ভাবাবেগ নেই। কারণ, পানাহারে সংযম অর্থাৎ মিতাচার এবং ব্রহ্মচর্য, এগুলোকে ভাবাবেগ বলা যায় না। কারণ, এগুলো মনের কোন আগমাপায়ী অবস্থা নয়। বরং এগুলো হচ্ছে আত্মার এমন একপ্রকার সক্রিয় শক্তি, যার দ্বারা পূর্বোক্ত দুর্গুণগুলো শান্ত ও সংযত রাখতে পারা যায়। পরে, স্পিনোজা এই গুণগুলোর সম্বন্ধে, "মনোবল" এই শিরোনামায় কিছু আলোচনা করেছেন। দৈন্যভাব হচ্ছে একপ্রকার দুঃখানুভূতি। এটা আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার জ্ঞান থেকে উদ্ভূত হয়। এর বিরুদ্ধ ভাব-বিকার হচ্ছে আত্মতুষ্টি[1]। দীনতা এবং আত্মতুষ্টি এই দুটি ভাবের সাথে এই ভ্রান্ত ধারণাটি জড়িত থাকে যে, সুখকর বা দুঃখকর যে রকম কাজই আমরা করি না কেন, তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই করি। দৈন্যভাবের সাথে যখন আমরা আমাদের দুঃখজনক বা সুখকর ক্রিয়াকে স্বাধীন ইচ্ছাবশতঃ করি বলে বিশ্বাস করি, তখন গোটা ভাবাবেগটিকে অনুশোচনা বলা যায়। যখন কোন অতীত ঘটনার ফল কি হবে, অথবা ভবিষ্যৎ কোন ঘটনা পরে ঘটবে কিনা—এরূপ সন্দেহ থাকে, তখন ঐরূপ অতীত বা ভবিষ্যৎ ঘটনার চিন্তা থেকে একপ্রকার ক্ষণস্থায়ী সুখ বা দুঃখ উৎপন্ন হয়—এরই অপর নাম হচ্ছে আশা বা ভয়। ভয়মিশ্রিত আশা এবং আশাবিরহিত ভীতি বলে কিছু নেই। কারণ, যার মনে সন্দেহ থাকে, সে নিশ্চয়ই এমন কিছু একটা কল্পনা করছে, যা প্রত্যাশিত বা আশঙ্কিত ঘটনার বিরোধী। সন্দেহের

1 Self-satisfaction.

কারণ দূর হ'লে, আশা দৃঢ়বিশ্বাসে, এবং ভীতি হতাশায় পরিণত হয়। ভাবাবেগের বিষয় অথবা কারণ যত বিভিন্ন শ্রেণীর হতে পারে, ভাবাবেগও তত বিভিন্ন শ্রেণীর বলে মানতে হবে। যে সকল হৃদয়াবেগ ঠিক ঠিক চিত্তের নিষ্ক্রিয়-অবস্থা[1] নামের উপযুক্ত, সেগুলো ছাড়া, স্পিনোজা সক্রিয় অথবা প্রেরণাদায়ক কয়েকটি হৃদয়াবেগও স্বীকার করেন। যেসব আবেগ সুখাত্মক কিংবা ইচ্ছা-প্রধান, শুধু ঐগুলোই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দুঃখ-প্রধান আবেগগুলোকে এই শ্রেণীর বাইরে রাখা হয়েছে। কারণ, এগুলো মনের চিন্তাশক্তি কমিয়ে অথবা একেবারে থামিয়ে দেয়। অন্তঃকরণের যে সকল প্রবৃত্তিজনক অথবা প্রেরণাদায়ক উদাত্ত হার্দিকভাব আছে, সেগুলোকে স্পিনোজা মানসিক-তেজ বা মনোবল[2] এই সামুদায়িক নামে অভিহিত করেছেন। এইরূপ তেজ বা মনোবলের দুটি প্রকার আছে: (১) আত্মিক-বীর্য,[3] এবং (২) উদারতা[4]। আমাদের যুক্তিসঙ্গত ইচ্ছা যখন নিজ মঙ্গলের সাধন ও রক্ষণে নিয়োজিত হয়, তখন এই মনোবল বা তেজ আত্মিক বীর্যরূপে দেখা দেয়; আর যখন তা আমাদের সমশ্রেণীর জীব যে মানুষ তার সাহায্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তা উদারতা এই আখ্যা পায়। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং মিতাচার[5] প্রথমশ্রেণীর তেজের উদাহরণ। আর নম্রতা ও দয়াশীলতা হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর তেজের উদাহরণ।

(গ) **আচরণ-বিষয়ক দর্শন:** স্পিনোজার নীতিবিজ্ঞান তিনটি ধারণার সমীকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ধারণা তিনটি হচ্ছে পূর্ণতা, সত্তা ও ক্রিয়াশীলতা। যে-বস্তু যতবেশী ক্রিয়াশীল, তা তত বেশি পূর্ণ, এবং তত বেশি সত্তার মালিক। কিন্তু যখন কোন বস্তু তার বহিঃস্থ অথবা অন্তঃস্থ কোন ঘটনার পূর্ণ অথবা পর্যাপ্ত কারণ হয়, কেবল তখনই তাকে পুরোপুরি-ভাবে ক্রিয়াশীল বলা চলে। আর ঐ বস্তু যদি উক্ত ঘটনার আদৌ কারণ না হয়, তাহলে, অথবা যদি শুধু তার অংশতঃ কারণ হয়, তাহলে, ঐ বস্তুকে সম্পূর্ণ অথবা অংশতঃ নিষ্ক্রিয় বলতে হবে। যে কারণের স্বরূপ দেখে তৎকার্যটি স্পষ্ট ও বিবিক্তভাবে জানা সম্ভবপর, সেটিই হচ্ছে পর্যাপ্ত বা পূর্ণ কারণ। মানুষের মন চিত্ত-গুণেরই একটি বিশিষ্ট প্রকার

---

1 Passion.
2 Fortitude.
3 Vigour of soul.
4 Magnanimity.
5 Temperance.

বা তরঙ্গমাত্র। মানসবৃত্তি বা ধারণা যথাযোগ্য হলে, মনকে সক্রিয় বা ক্রিয়াশীল বলা যায়। আর অন্তঃকরণের নিষ্ক্রিয়-ভাব বা অবস্থাগুলো[1] অবিবিক্ত কতকগুলো ধারণার মিশ্রণে গঠিত। বাহ্যবস্তু মনে যে সকল নিষ্ক্রিয় পরিণাম ঘটায়, সেগুলো এই অবিবিক্ত ধারণার অন্তর্গত। মনের স্বরূপ হচ্ছে চিন্তন অথবা চিন্ত; চিন্তা বা চিন্তন হচ্ছে মনের আসল ধর্ম[2]; সংকল্প যে শুধু জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে, তা নয়, কিন্তু তা মূলতঃ জ্ঞানের সাথে অভেদাপন্নও বটে।

হাঁ-কার ও না-কার অর্থাৎ অস্তিবিধান ও নাস্তিবিধান আমাদের ইচ্ছা বা সংকল্প শক্তিরই কার্য। এ কথা দেকার্ৎ আগেই বলে গেছেন। স্পিনোজা আর এক পা এগিয়ে বললেন যে, বিধান ও ধারণা পরস্পরের সাথে অবিনাভাবে[3] সংযুক্ত। তাছাড়া, সত্যের সম্বন্ধে কোন অস্তি-বিধান ব্যতিরেকে সত্যের ধারণা করা অসম্ভব। ধারণামাত্রেই তার সম্বন্ধে একটি অস্তি-বিধানও গর্ভিত থাকে। স্পিনোজার ভাষায়, "সংকল্প ও বুদ্ধি একই পদার্থ।" স্পিনোজার দৃষ্টিতে, নৈতিক কৃত্য হচ্ছে জ্ঞান ক্রিয়ারই প্রকার বিশেষ। জ্ঞান ক্রিয়ার যেমন কল্পনা ও বুদ্ধি বলে দুটি স্তর থাকে, তেমনি সংকল্পেরও তদনুরূপ দুটি স্তর আছে। আর এই দুটি স্তর হচ্ছে সাধারণ ইচ্ছা[4] এবং নিজ-নির্বাচিত ইচ্ছা[5]। প্রথমটি কল্পনার দ্বারা এবং দ্বিতীয়টি বিচার বুদ্ধির দ্বারা[6] নিয়ন্ত্রিত। ইন্দ্রিয়জ ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত অস্বাধীন চিত্তভাবগুলো নশ্বর পদার্থের দিকে ধাবিত হয়; আর বিচারবুদ্ধি থেকে উৎপন্ন সক্রিয় স্বাধীন আবেগগুলোর বিষয় হচ্ছে শাশ্বত পদার্থ অর্থাৎ সত্যের জ্ঞান, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আন্তরোপলব্ধি[7]। ন্যায়বুদ্ধির কাছে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই—তা সকল মানুষকে সমপর্যায়ে এনে সর্বমানবের সাধনীয় একটি সমান বা সাধারণ উদ্দেশ্য নির্দেশ করে; তা কালভেদও স্বীকার করে না; এবং তার কাছে সক্রিয় স্বাধীন ভাবাবেগগুলো সর্বাবস্থাতে হিতকর বলে স্বীকৃত হয়। আর এ সকল ভাবাবেগের কোথাও

---

1 Passion.
2 Essence.
3 Necessarily.
4 Desire.
5 Volition.
6 Reason.
7 Intuition.

কোন আতিশয্য থাকে না। পরাধীন ভাবাবেগগুলো অবিবিক্ত ও পরস্পরের সাথে মিশ্রিত[1] বিমিশ্র ধারণা থেকে উৎপন্ন হয়। শরীরে যে সব পরিণাম ঘটে, প্রথমে তাদের থেকে অবিবিক্ত বিমিশ্র ধারণা জন্মে। এগুলোই যখন বিশ্লেষণের দ্বারা স্পষ্ট ও বিবিক্ত করা হয়, তখন এই সকল অস্বাধীন চিত্ত-ভাবগুলো আর অন্যজনিত অবস্থার আকারে বিদ্যমান থাকে না। ধারণা স্পষ্ট হওয়ামাত্র আমরা পরাধীন অবস্থা অতিক্রম করে, স্বাধীন ক্রিয়ার অধিকারী হই এবং ইচ্ছার দাসত্ব থেকে মুক্ত হই। চিত্ত-ভাবগুলোর স্পষ্ট জ্ঞান দ্বারা তাদের ওপর প্রভুত্ব অর্জন করা সম্ভবপর। ধারণা স্পষ্ট হয় কিভাবে? কোন বস্তু-ব্যক্তিকে তার বিশিষ্ট বৈয়ক্তিক রূপে, ও তা যে-সমগ্রের অন্তর্গত, তার থেকে বিচ্যুতরূপে না দেখে, ঐ সমগ্রের সাথে সম্বন্ধ-ভাবে, অর্থাৎ কার্য-কারণ নিগড়ের অংশীভূত একটি আংটার আকারে অর্থাৎ দ্রব্য বা ঈশ্বরের একটি অবশ্যম্ভব বিশিষ্ট প্রকাররূপে[2] জানা—এটাই হচ্ছে খাঁটি স্পষ্ট ধারণার স্বরূপ। মন যতই সর্ব পদার্থকে তাদের অবশ্যম্ভব স্বরূপে, এবং চিত্ত-ভাবগুলোকে ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্তরূপে ধারণা করতে পারবে, ততই তা চিত্ত-ভাবের অধীনতা থেকে মুক্ত হবে, এবং ততবেশী তাদের ওপব তা আধিপত্য লাভ করতে পারবে। "নীতিমত্তা[3] মানে আধিপত্য বা ক্ষমতা[4]।" একথা অবশ্য সত্য যে, এক চিত্ত-ভাবকে অন্য এক বেশী জোরালো চিত্ত-ভাব দ্বারা, অথবা পরাধীম চিত্ত-ভাবকে স্বাধীন চিত্ত-ভাব দ্বারা জয় করা সম্ভবপর। যে স্বয়ং-ক্রিয় আবেগের সাহায্যে আমাদের জ্ঞান পরাধীন চিত্ত-ভাবগুলোকে জয় করে, তা হচ্ছে আমাদের স্বকীয় ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদেরই সচেতনতা; আর এই সচেতনতা আনন্দদায়ক। বস্তুর যথাযোগ্য বা পর্যাপ্ত ধারণায়, আমরা ঐ বস্তুকে ঈশ্বরের সাথে একতাপন্নরূপেই জানি। তাই, চিত্ত-ভাবগুলোর সম্যক জ্ঞান ও তাদের ওপর প্রভুত্বলাভ করতে পারলে, যে আনন্দ হয়, ঐ আনন্দের সাথে ঈশ্বর-বিষয়ক আমাদের একটি ধারণাও সংযুক্ত থাকে। অর্থাৎ প্রেমের লক্ষণ অনুসারে, এটাও বলা চলে যে, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক ভালবাসা আছে, তাও এই সুখানুভূতির সাথে জড়িত থাকে। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা ও তাঁকে ভালবাসা, এই দুটির

1 Confused.
2 Mode.
3 Virtue.
4 Power.

সংযোগ হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি প্রজ্ঞা-সম্ভূত প্রেম[1]। এই প্রেমই হচ্ছে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল।[2] আর এটাই সর্ব্বোচ্চ নীতিমত্তা। পরমহিত, পরমমঙ্গল যে পরমানন্দ, তা নীতিমত্তার ফল নয়, বরং এটাই হচ্ছে সাক্ষাৎ নীতিমত্তা। ঈশ্বরের প্রতি মানুষের যে বিচারবুদ্ধি-জনিত অথবা প্রজ্ঞা-সম্ভূত প্রেম, তাতেই মানুষের চরম শান্তি, পরমানন্দাবাপ্তি[3] অথবা কৃত-কৃত্যতা এবং পূর্ণ স্বাধীনতা। যেহেতু যথার্থ জ্ঞান হচ্ছে তার বিষয় ও কারণের মতন শাশ্বত, অতএব উক্ত ভাগবত প্রেমের প্রভাবে শরীর-ধ্বংসের পরেও আত্মা অবিনশ্বরই থেকে যায়। ভগবান যে অনন্ত ভালবাসায় নিজেকে ভালবাসেন, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালবাসা তারই একটি অংশ। শুধু তাই নয়। মানুষের প্রতি ভগবানের যে ভালবাসা, আর ভগবানের প্রতি মানুষের যে ভালবাসা, এ দুটি প্রকৃতপক্ষে একই পদার্থ। মানবাত্মার শাশ্বত অংশটির নাম হচ্ছে প্রজ্ঞা বা বিচার-বুদ্ধি; এরই শক্তিতে মানুষ স্বয়ংক্রিয় হয়। আর মানবাত্মার নশ্বর অংশ হচ্ছে কল্পনা বা ইন্দ্রিয়জ ধারণা। এই নশ্বর অংশের জন্যই মানুষ বাহ্যশক্তির অধীনে এসে বিবিধ পরিণামের ভাগী হয়। যথাযোগ্য জ্ঞান এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রজ্ঞাত্মক ভালবাসা, শুধু এ দুটির দ্বারাই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করতে পারে। নির্বোধ জনের আত্মা থেকে জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মা অধিকমাত্রায় অমৃতত্বের অধিকারী।

স্পিনোজার নৈতিক দর্শন বিচারবুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে সদ্‌গুণ বা নীতিমত্তা সম্যক্ জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। দয়া, অনুশোচনা প্রভৃতি দুঃখকর ও পরতন্ত্র চিত্ত-ভাবগুলো মানুষকে হয়তো এমন কাজে প্রবৃত্ত করতে পারে, যা না করার চেয়ে, করা ভাল। তবু এসকল চিত্তভাব বর্তমান অহিতের ওপর নতুন অহিত ডেকে আনে। এদের শুধু এইটুকু মূল্য যে, এরা এদের পূর্ববর্তী অহিতের তুলনায় ন্যূন অহিত। অবশ্য, যার বিচারশক্তি কম, তার পক্ষে দয়া ও অনুশোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ, দয়া থেকে সক্রিয় পরোপকারের প্রেরণা আসে; আর অনুশোচনা মানুষের গর্ব খর্ব করে; কিন্তু জ্ঞানীলোকের দৃষ্টিতে এই চিত্ত-ভাবগুলো অনিষ্টকর—অন্ততঃ, এরা নিরুপযোগী। কারণ, যুক্তিসঙ্গত কাজের জন্য কোন অযৌক্তিক প্রেরণার[4] প্রয়োজন নেই। অন্তর্দৃষ্টি থেকে

---

1 Intellectual love.
2 Good.
3 Blessedness.
4 Motive.

সঙ্গত কৃত্যই হচ্ছে প্রকৃত নৈতিক কৃত্য। তাছাড়া, স্পিনোজার নীতি-বিজ্ঞানকে নৈসর্গিক অথবা স্বভাবানুগ নীতিবিজ্ঞানও বলা চলে। কারণ, তাঁর মতে, নীতিমত্তা মনুষ্য-স্বভাব থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়; এটা হচ্ছে জড়বস্তুরই পরিণামবিশেষ, স্বাধীনতার ফল নয়। কারণ, সংকল্পীয় ক্রিয়াগুলো স্পষ্ট ধারণার দ্বারা জনিত ও নিয়ন্ত্রিত; আর ধারণা-গুলো তৎপূর্ববর্তী কারণসমূহের কার্য। আত্মসংরক্ষণ বা নিজকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা—এটাই হচ্ছে নীতিমত্তা বা সদ্‌গুণের ভিত্তি। বেঁচে থাকার ইচ্ছা না থাকলে, সৎ অথবা নৈতিক কর্ম করার ইচ্ছা কি করে সম্ভবপর হতে পারে? যে-হেতু বিচারবুদ্ধি নিসর্গের বিরুদ্ধে কখনও কিছু বলেনা, তাই বিচারবুদ্ধির নির্দেশ এই যে, প্রত্যেক মানুষ যেন তার নিজের পক্ষে বাস্তবিকই যা প্রয়োজনীয়, তারই অন্বেষণ করে, এবং যাতে নিজে অধিক পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, তার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। প্রকৃতির নিয়মানুসারে যাকিছু প্রয়োজনীয়, তাই নৈতিক দৃষ্টিতে অনুমোদনের যোগ্য। প্রয়োজনীয় কি? যাতে আমাদের ক্ষমতা, বিশেষতঃ ক্রিয়ার শক্তি বৃদ্ধি পায়, যাতে আমরা পূর্ণতার অধিক নিকটে যেতে পারি, অথবা যাতে আমাদের জ্ঞান-বৃদ্ধি হয়, তাই প্রয়োজনীয়। কারণ, আত্মার জীবন বা প্রাণ হচ্ছে চিন্তা বা বিচার। খারাপ, অহিত বা অমঙ্গল মানে যা মানুষকে তার বিচারবুদ্ধির বিকাশে এবং বিচারানুমোদিত অথবা যুক্তিসঙ্গত[1] জীবন যাপনে বাধা দেয়। আর নিজের সংরক্ষণের জন্য বিচারবুদ্ধি যে-রাস্তা দেখিয়ে দেয়, সেই রাস্তায় চলা, এরই নাম হচ্ছে নৈতিক কর্ম।

স্পিনোজার সমালোচকদের ভেতর অনেকের মত এই যে, তাঁর নৈতিক দর্শনে যত সংখ্যক ভ্রান্ত ধারণার সমাবেশ, তার অন্য কোন লেখায় এতটা দেখা যায়নি। তাঁর মনগড়া কৃত্রিম ধারণাগুলোতে যে নানারকম ত্রুটি আছে, তারজন্য এবং এদের নিকৃষ্টতার জন্য, এরা কোনদিকেই সত্যের অনুরূপ হতে পারেনা, একথা তাঁর নৈতিক বিচারে যেভাবে প্রকট হয়েছে, এমন আর অন্য কোথাও হয়নি। কোন কোন দার্শনিক নৈতিক বিধি-নিষেধরূপ আজ্ঞার কথা বাদ দিয়ে, মানুষের সর্ব কর্ম শুধু নিসর্গের ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। স্পিনোজাও তাদেরই অন্যতম। কিন্তু তাদের কেউ এই মতের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা বজায় রাখতে পারেননি। তবু স্পিনোজা যে-সকল নৈতিক বিধিনিষেধ প্রণয়ন করেছেন, সেগুলো

---

1 Rational.

পুরাতন গ্রীক আদর্শানুযায়ী হওয়াতে, এই ব্যাপারে তাঁর যৌক্তিক অসংগতির দিকে সহজে দৃষ্টি পড়ে না। স্পিনোজার নীতিবিজ্ঞান পড়বার সময়, আরো কয়েকটি বিষয়ে গ্রীক নীতিবিজ্ঞানীদের কথা মনে আসে। প্লেটো "দার্শনিকের নীতিমত্তা" বলে একটি কথা বলেছিলেন। আর সক্রেটিস বলেছিলেন যে, নীতিমত্তা বিচারবুদ্ধির অর্ন্তদৃষ্টি থেকে স্বতঃই নিঃসৃত হয়। প্লেটো ও সক্রেটিসের এই দুটি ধারণা স্পিনোজা আবার তাঁর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি নিজের অন্তরে জ্ঞানের জন্য যে বিশুদ্ধ তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছিলেন, তার থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, (১) মানুষ মাত্রেই এই জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান, (২) বুদ্ধি হচ্ছে মানবাত্মার সার পদার্থ, আর বিচার বা চিন্তা হচ্ছে এই বুদ্ধির সার পদার্থ এবং (৩) মানুষের ভেতর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার যে সহজাত প্রবৃত্তি দেখা যায়, তার স্বাভাবিক গতি হচ্ছে জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদনের দিকে, আর জ্ঞান হচ্ছে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বা অংশ।

প্রত্যেক মানুষ নিজের অস্তিত্ব অবিরাম চলতে থাকুক, এইটা কামনা করে। কিন্তু সকলেই কেন নীতিমান হওয়ার চেষ্টা করেনা? ধরে নেওয়া যাক্, সবাই নীতিমান হতে চায়। তবুও, প্রশ্ন থেকে যায়, শুধু অত্যন্ত অল্পসংখ্যক লোকই কেন এই আদর্শের দ্বারা চালিত হয়? অবিবেচক, অবিচারী, স্বার্থপর ও পাপাচারীদের সংখ্যা এত বেশী কেন? জগতে অকল্যাণকর কোথা থেকে এল? পুণ্য বা সৎকৃত্য নিসর্গ থেকে উৎপন্ন হয়, এরকম বলা যতখানি কঠিন, পাপও নিসর্গ থেকে উৎপন্ন হয়, এরকম বলাও ঠিক ততখানি কঠিন। কিন্তু পুণ্য স্বরূপতঃ বলবান্, আর পাপ হচ্ছে দুর্বল; প্রথমটি জ্ঞানাত্মক, আর দ্বিতীয়টি অজ্ঞান-স্বরূপ। কিন্তু এই দুর্বল জিনিষটি কোথা থেকে এসে দেখা দিল? জ্ঞান পঙ্গু হয় কেন? আরো ব্যাপকভাবে বলতে গেলে প্রশ্নটি এই:—অপূর্ণতার উৎপত্তির ব্যাখ্যা কি?

অপূর্ণতার ধারণার বিষয়টি কোন অস্তিত্ববান ভাবরূপ পদার্থ নয়। তা হচ্ছে, বস্তুর কোন ত্রুটি, বিচ্যুতি বা অভাবমাত্র। অপূর্ণতা হচ্ছে আমাদের মনের একটি বস্তুশূন্য ধারণা বা বিকল্পমাত্র। অর্থাৎ অপূর্ণতা হচ্ছে অ-বস্তু। বিভিন্নমাত্রার সত্তাযুক্ত একাধিক পদার্থের তুলনা থেকে এই বস্তুশূন্য ধারণার উৎপত্তি হয়। মাঝে মাঝে, কোন বস্তুর দিকে তাকিয়ে, আমাদের মনের হতে পারে যে ঐ বস্তুর যে-ধারণা আমাদের মনে রয়েছে, তাকে ঐ বস্তুটি মূর্তিত অথবা প্রকট করতে পারেনি, কিংবা পারবেনা। অপূর্ণতার ধারণা উৎপন্ন হওয়ার এইটি একটি কারণ। আমাদের মনে

কতকগুলো মূল্যবোধক ধারণা আছে। কিন্তু এই ধারণাগুলো কোন বস্তু-ধর্মের নির্দেশ করেনা। বরং সেগুলো কোন বস্তু আমাদের চিত্তে যে সুখ বা দুঃখ জন্মায়, তাই ব্যক্ত করে। এর প্রমাণ এই যে, একই বস্তু একই কালে ভাল, মন্দ এবং না-ভাল-না-মন্দ, সবই হতে পারে; যে সংগীত সুখীজনের প্রিয়, তাই শোকার্তের কাছে অপ্রিয় এবং বধিরের কাছে প্রিয়ও নয় অপ্রিয়ও নয়। অকল্যাণের বোধ হচ্ছে একটি নিকৃষ্ট[1] ও অপূর্ণ ধারণা; তাই ঈশ্বরে এই অকল্যাণ-বোধ নেই। অপূর্ণতা ও অমঙ্গল যদি বাস্তব পদার্থ হয়, তাহলে ঈশ্বরকেই তার স্রষ্টা বলতে হবে। আসলে, যে জিনিষ যেরকম হওয়া উচিত, সে জিনিষ বস্তুতঃ তা-ই। স্ব-স্বরূপে বিবেচিত হলে, প্রত্যেক পদার্থই পূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে। মূর্খ ও পাপী ব্যক্তিও আসলে পূর্ণতারই অধিকারী—শুধু জ্ঞানী ও পুণ্যবানের পাশে তাকে মূর্খ ও পাপী বলে মনে হয়। সুতরাং পাপ মানে পুণ্যের চেয়ে ন্যূন সত্তাক ধর্ম এবং অমঙ্গল মানে কম মঙ্গল। ভাল-মন্দ, সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা, বলবত্তা ও দুর্বলতা—এগুলো শুধু মাত্রার পার্থক্যের বাচক, এগুলো গুণগত বা জাতিগত ভেদের নির্দেশক নয়। তবু, প্রশ্ন ওঠে, সর্ব পদার্থই একেবারে নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্ণ নয় কেন? সত্তার তরতম মাত্রাভেদ থাকবে কেন? স্পিনোজা এই প্রশ্নের দুটি উত্তর দিয়েছেন। প্রথম উত্তরটি তিনি স্পষ্টভাবে দেন নি। সেটি তাঁর লেখার ভাবার্থ থেকে অনুমান করে নিতে হবে, আর সেটি এই। সবিশেষ জিনিষের সত্তা ও ক্রিয়াশক্তিতে যে-অপূর্ণতা দেখা যায়, তার একটি হেতু হচ্ছে ঐ জিনিষের সান্ততা, আর অপর হেতুটি এই যে, তা কার্য-কারণ প্রবাহে পতিত বলে তার ক্রিয়াকলাপ শুধু নিজ স্বভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, কিন্তু তা বাহ্য কারণের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। বাহ্যকারণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনাই মানুষের পাপাচরণের হেতু। একমাত্র উন্নত চরিত্রের লোকেরাই এই বাহ্যপ্রভাব সত্বেও স্বীয় স্ব-নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে। উপরোক্ত দ্বিতীয় জবাবটি স্পিনোজা নিজেই স্পষ্টভাবে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তাঁর নীতিবিজ্ঞানের ষোল-সংখ্যক প্রতিজ্ঞাটির সাহায্য নিয়ে এই জবাবটি বুঝতে হবে। ষোল-সংখ্যক প্রতিজ্ঞা এই:—ঈশ্বর যা কিছু স্রষ্টব্য বলে মনে করেন, তাই অস্তিত্ববান বস্তুরূপে পরিণত হয়; এবং উক্ত দ্বিতীয় উত্তরটি হচ্ছে এই—"যারা জিজ্ঞাসা করে যে, ভগবান কেন সকল মানুষকে

---

1 Abstract.

এরকমভাবে সৃষ্টি করলেন না, যাতে সবাই প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধির[1] দ্বারা চালিত হয়, তাদের প্রতি আমার বক্তব্য শুধু এই যে: পূর্ণতার উচ্চতম থেকে নিম্নতম মাত্রা পর্যন্ত তৈরি করবার পক্ষে যে মালমসলার প্রয়োজন, ঈশ্বরের সেই মালমসলার কোন অভাব ছিল না। অথবা আরো ঠিক ঠিক-ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁর স্বভাবানুগত নিয়মগুলোর ব্যাপকতা এত বেশী যে, অনন্তবুদ্ধিতে যা যা ধারণা করা সম্ভবপর, সে সবই নির্মাণ করার পক্ষে ঐ সকল নিয়ম পুরোপুরিভাবে পর্যাপ্ত।" তাই পূর্ণতার যতগুলো মাত্রা বা স্তর সম্ভবপর, সে সবই অস্তিত্ব লাভ করেছে; আর এদের ভেতর নিম্নতম স্তরের পাপ ও ভ্রান্তিও রয়েছে। বিশ্ব যেন পূর্ণতার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় গ্রথিত একটি বিরাট মালা—এর কোন অংশই বাদ দেওয়া চলে না। বৈকল্যের বিশেষ বিশেষ স্থলগুলো সমগ্রের পূর্ণতার দ্বারা সমর্থন-যোগ্য; কারণ, পূর্ণতার নিম্নতর মাত্রা অর্থাৎ পাপাচারকে বাদ দিলে, সমগ্রের প্রকৃত পূর্ণতাই থাকবেনা। এখানে স্পিনোজা চিন্তার এমন একটি রাস্তা ধরে চলেছেন, যা পরে লাইবনিজ একটি প্রশস্ত রাজমার্গে পরিণত করেছেন। উভয়েই জাগতিক সর্ব পদার্থের গুণগত ভেদগুলোকে পরিমাণের বা মাত্রার ভেদ বলে বুঝতে চেয়েছেন। এইরূপ চিন্তাধারায় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের পারস্পরিক বিরোধ অনেকখানি প্রশমিত হয়ে যায়।

বস্তুতে বস্তুতে যে মূল্যগত ভেদ আমরা দেখতে পাই, তাকে আমরা পরিমাণগত বলে ভাবি না, কিন্তু জাতিগত অথবা গুণগত বলেই মনে করি। এই সাধারণ মতটিকে দার্শনিক চিন্তায় কান্টের আগে অন্য কেউ তার প্রাপ্য ন্যায্য মর্যাদা দেন নি। যে-নীতিবিজ্ঞানে স্বাধীনতা এবং অমঙ্গলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়, তা নীতি বিজ্ঞানই নয়, কিন্তু তা হচ্ছে নীতিবিষয়ক পদার্থ-বিজ্ঞান। অবশ্য, বহু ধর্ম-বিশ্বাসী লোক স্পিনোজার পূর্ববর্ণিত মতের এইরূপ সমালোচনা করবেন না, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কে জানে, হয়তো শেষ পর্যন্ত স্পিনোজার কথাই ঠিক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্পিনোজা প্রায়ই সকল বিষয়ে হব্‌সের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তিনি অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা অথবা স্বেচ্ছা-তন্ত্রের বিরোধী সেই গণতন্ত্রের পক্ষপাতী, যে গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব-নির্ধারিত ও স্ব-নিয়োজিত নিয়ম মেনে চলে। স্পিনোজার মতে, এইরূপ গণতন্ত্রই সর্বাপেক্ষা বেশী যুক্তিসংগত শাসন-পদ্ধতি। তাঁর এই মত তিনি তাঁর

1 Reason.

গ্রন্থ "ঈশ্বরবাদীয় রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধে"[1] সমর্থন করেছেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ "রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধে"[2] তিনি অভিজাততন্ত্রের[3] দিকে অধিক পক্ষপাত দেখিয়েছেন। নিসর্গের সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়ণতা অনুসারে, প্রত্যেক মানুষ তার কাছে যা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়, সেটাকে ভাল বলে ভাবে, আর তা পাওয়ার জন্য চেষ্টাও করে। সকলেই সকল জিনিসের মালিক। প্রত্যেক ব্যক্তিরই এমন একটি অধিকার রয়েছে যে, সে তার বিদ্বেষ বা ঘৃণার বিষয়কে ধ্বংস করতে পারে। সুতরাং মানুষের ইন্দ্রিয়জ ইচ্ছা ও হৃদয়াবেগসমূহের ফলে, নিসর্গের স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হয় ও নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। এটা দূর করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যাতে শাস্তি-বিধায়ক আইনের সাহায্যে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বসাধারণের মঙ্গলার্থ কতকগুলো কাজ করতে এবং কতগুলো কাজ না করতে বাধ্য করা হয়। মারামারি ও বিশ্বাসঘাতকতা শুধু রাষ্ট্রে অর্থাৎ এইরূপ নিয়ম-বদ্ধ সমাজেই পাপ বা অপরাধ বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। রাষ্ট্র গঠনের আগে, পাপ বা অপরাধ বলতে শুধু তাই বুঝতে হবে, যা কেউ চায় না, অথবা যা করার ক্ষমতা কারো নেই। অন্যায় আক্রমণ প্রতিরোধ করে সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ, এই বিশেষ কাজটি ছাড়া সমাজের আরো উন্নততর উদ্দেশ্য রয়েছে। তা হচ্ছে বিচার-বুদ্ধির বিকাশের সহায়তা করা। প্রকৃত নীতিমত্তা ও প্রকৃত স্বাধীনতা শুধু রাষ্ট্র-জীবনেই সম্ভবপর। আইনে বাঁধা সমাজে বেশী স্বাধীনতা পাওয়া যায় বলে, বিজ্ঞ-ব্যক্তি নির্জনে থাকার চেয়ে, সেখানেই থাকতে পচ্ছন্দ করে।

এইভাবে, আমরা দেখতে পাই যে, নীতিশাস্ত্রে যেমন আগে ও পরে স্পিনোজার মত-বৈপরীত্য ঘটেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও তাই। নীতি-বিজ্ঞানের আরম্ভে বলা হলো যে, আত্মসংরক্ষণের সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে সদাচার বা নীতিমত্তার ভিত্তি, এবং ভাল বা মন্দ মানে যা ব্যক্তির জীবনে আবশ্যক। কিন্তু পরে, আবার আপাত প্রয়োজন ও বাস্তবিক প্রয়োজন, এই দুয়ের ভেতর ভেদ স্বীকার করে, নীতিবিজ্ঞানের যৌক্তিকতা অথবা ন্যায্যতার ধারণা আনা হলো ; সর্বশেষে, সদাচার ও নীতিমত্তার

---

1 *Tractatus Theologico Politicus.*
2 *Tractatus Politicus.*
3 Oligarchy.

মানে করা হল চিত্ত-শুদ্ধি, মনের পবিত্রতা, স্বার্থত্যাগ, মানবপ্রীতি, ভগবৎ-প্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণ। বলা বাহুল্য যে, পরের এই খৃষ্টীয় সিদ্ধান্তটি স্পিনোজার প্রারম্ভিক নিসর্গবাদের সাথে একেবারেই বিসংগত। ঠিক এরই মতন, স্পিনোজা প্রথমে তাঁর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নিসর্গবাদ সমর্থন করেছেন, কিন্তু পরিশেষে একটি আদর্শানুগ ধারণাতেই উপনীত হয়েছেন।

যে-সকল ধারণা স্পিনোজা-দর্শনের মূলতত্ত্ব এবং যেগুলোর জন্য দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে স্পিনোজার মতের গুরুত্ব, সেগুলো হচ্ছে তাঁর বুদ্ধিবাদ বা যুক্তিবাদ, জড় ও চেতনের মূলগত অভেদ, এবং পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক নিয়মের অবাধ ও অবিচ্ছিন্ন আধিপত্য।

স্পিনোজা তাঁর নৈতিক ধারণাগুলোকে মোচড় দিয়ে, কিভাবে তাদের অর্থ একেবারে পাল্টে দিয়েছেন, তা কিছু আগে আমরা লক্ষ্য করেছি। তাছাড়া, তাঁর দর্শন সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে-কয়েকটি আপত্তি ওঠে, তাও উল্লেখ করা হলো। স্পিনোজা একদিকে ঈশ্বরকে দেশ-কালাবচ্ছিন্ন এবং পাপ-পুণ্য ও সুখ-দুঃখে জড়িত এই প্রতীয়মান জগতের উর্দ্ধে দূরে রাখতে, আবার অপরদিকে তাঁকে এই জগতের অতি নিকটে এনে, জগৎটি তাঁর আবাস-স্থান বলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এরূপ করায়, ঈশ্বরের বিশ্বাতীত এবং বিশ্বানুস্যূত রূপের মধ্যে কোন যোগসূত্র দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, স্পিনোজা প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক কারণ বলে যে দু রকমের কারণ মেনেছেন, তাদের সম্বন্ধটি ঠিক কি রকম, অর্থাৎ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কারণত্ব এবং সান্ত কারণের সাহায্যে তাঁর যে গৌণ কারণত্ব—এ দুয়ের সম্বন্ধটি ঠিক কি রকম, সে সম্বন্ধে তিনি কোন আলোকপাত করেন নি। তৃতীয়তঃ, ঈশ্বর অনন্ত, এই মতটি এবং ঈশ্বর মানববুদ্ধির নিকট পূর্ণভাবে পরিজ্ঞেয় এই মতটি, পরস্পরবিরোধী বলে প্রতিভাত হয়—সান্ত মানববুদ্ধি অনন্তকে কি করে পুরোপুরি জানবে? মানববুদ্ধি তার প্রকারীয়[1] সান্ততা অতিক্রম করে, কিভাবে ঈশ্বরের সাথে রহস্যময় সংযোগ বা মিলনের যোগ্য হতে পারে? চতুর্থতঃ, আমরা আগেই বলে এসেছি যে, স্পিনোজীয় গুণগুলোর[2] দ্বৈতস্বভাব (অর্থাৎ তারা বৌদ্ধিক জ্ঞানের আকার, আবার তারা দ্রব্যের বাস্তবিক ধর্ম, এই দুটি রূপ), স্ব-বিরোধ দোষে দুষ্ট ও দুর্বোধ্য, এতে সন্দেহ নেই।

1 Modal.
2 Attribute.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লাইব্‌নিজ্‌

জন্ম—১৬৪৬ ; মৃত্যু—১৭১৬

আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের দুটি প্রধান ধারা। একটি ইউরোপের মুখ্য ভূ-খণ্ডের ; এর আরম্ভ দেকার্ৎ থেকে। অপরটি ইংলণ্ডের। এটি বেকন-প্রদর্শিত পথের যাত্রী। ধারা দুটি স্পিনোজা ও লক্ এই দুই সম-সাময়িক ব্যক্তির দর্শনে একেবারে বিপরীতমুখী হয়ে যায়। স্পিনোজা ছিলেন যৌক্তিক সর্বেশ্বরবাদী[1] ; আর লক্ ছিলেন ইন্দ্রিয়ানুভবীয় ব্যক্তিবাদী।[2] লাইবনিজ দুদিক থেকে এই ধারা যুগলের মিলন ঘটাতে প্রয়াসী হন। যুক্তিবাদী হিসাবে, তিনি লকের বিপক্ষে স্পিনোজার সমর্থক ; এবং ব্যক্তিবাদী হিসাবে তিনি স্পিনোজার বিরুদ্ধে লকের মতানুযায়ী। আবার তিনি যুক্তিবাদকে সর্বেশ্বরবাদ থেকে মুক্তি দিলেন ; কিন্তু অপরদিকে ইন্দ্রিয়ানুভববাদের কিছু গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, যুক্তিবাদের আতিশয্য কিছু কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। অবশ্যম্ভব যৌক্তিক সত্য এবং দেশকালাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূত সত্য, এই দুটিকে পরস্পর থেকে পৃথক করে, দ্বিতীয় একপ্রকার মতের প্রতিষ্ঠার জন্য "যথোচিত বা যথা-প্রয়োজন পর্যাপ্তহেতু"[3]—নাম দিয়ে পৃথক্ একটি বৌদ্ধিকতত্ত্বের নির্দেশ করলেন এবং এটাও স্পষ্টভাবে বললেন যে, বিচার বা চিন্তার জন্য ইন্দ্রিয়-সংবেদন হচ্ছে একটি অপরিহার্য সোপান।

পরস্পর বিবদমান মত সকলের প্রত্যেকটির যথাযোগ্য মূল্য স্বীকার করে, তাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ মিলন ঘটাবার এই মনোভাব লাইবনিজের প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে লক্ষিত হয়। ধর্ম-জগতেও তিনি প্রোটেস্টান্ট্ ও ক্যাথলিক মতের পুনর্মিলনের চেষ্টা করেছেন।

তাঁর অধ্যয়নের ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। তিনি এত বিবিধ ও বহু-সংখ্যক গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন যে, তা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

---

1 Rational Pantheism.
2 Empirical Individualism.
3 Sufficient Reason.

তিনি কোন একসময় বলেন যে, তিনি কখনও এমন একখানি পুস্তকও দেখেননি, যাতে মূল্যবান শিক্ষণীয় কথা নেই। অন্যের মত ও কল্পনা নিজের প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তন করে, তার দ্বারা নূতন কিছু বলবার তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। লাইবনিজ-দর্শনের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, কোন বইয়ে যা লেখা আছে, তার থেকে অনেক বেশী তিনি ঐ বইয়ের ভেতর আবিষ্কার করতে পারতেন। যে বিস্তৃত কক্ষায় তাঁর বিবিধ-বিষয়গামী[1] মেধা বিচরণ করতে পারত, তার যেন কোন অবধি ছিল না। তিনি একাধারে আইনশাস্ত্রজ্ঞ, ইতিহাসবিদ্, কূটনীতিবিশারদ, গণিতজ্ঞ, জড়-বিজ্ঞানী, দর্শনশাস্ত্র-পটু, এমনকি ধর্মশাস্ত্র ও ভাষাবিজ্ঞানেও বিশেষ ব্যৎপন্ন পণ্ডিত ছিলেন। জ্ঞানের এই সকল বিবিধ শাখায় বিরাট পাণ্ডিত্য-হেতু তিনি যে শুধু তাদের ভেতর অবাধ বিচরণে সমর্থ ছিলেন, তা নয়; উপরন্তু, তিনি স্বীয় মৌলিক কল্পনা ও বিচারের সাহায্যে তাদের উন্নতিসাধনও করে গেছেন। সৃজনক্ষম প্রতিভার সাথে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী লোকের সংখ্যা অত্যল্প। এই ব্যাপারে হয়তো কেউ এরিস্টটল ও লাইবনিজের সমকক্ষ নন।

গট্ ফ্রিড উইল্হেলম্ লাইবনিজ লাইপজিক শহরে ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এই শহরে নৈতিক দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। পনেরো বছর বয়সে লাইবনিজ আইনশাস্ত্র প্রধান-বিষয় নিয়ে, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দর্শন ও গণিতও সমান উৎসাহের সাথে অধ্যয়ন করতে থাকেন। ১৬৬৩ সালে অর্থাৎ সতেরো বছর বয়সে, স্নাতক পরীক্ষায়, এবং ১৬৬৪ সালে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; তারপর ১৬৬৬ সালে আইনশাস্ত্রে "প্রবীণ"[2] এই উপাধি লাভ করেন। এই উপাধি পাওয়ার পর, তিনি আল্টডর্ফ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে, ঐ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন, এবং এক জার্মান সর্দারের দরবারে আইন-সংক্রান্ত কর্মপ্রণালীর সংস্কারকার্যে নিযুক্ত হন। তিনি এই কাজের সঙ্গে, বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখতে থাকেন। ১৬৭২ সালে তিনি প্যারী শহরে গিয়ে, চার বছর সেখানে থাকেন। এই সময়ের ভেতর শুধু একবার তিনি কিছুকাল লণ্ডন শহরে গিয়ে অবস্থান করেন। প্যারী শহরে তিনি

1 Versatile.
2 Doctor.

যে ছিলেন, তার একটি সরকারি উদ্দেশ্য ছিল। সম্রাট চতুর্দশ লুইর মনে জার্মানীর বিরুদ্ধে কিছু দুরভিসন্ধি ছিল, এটা লাইবনিজের প্রভু ঐ জার্মান সর্দার জানতেন। লাইবনিজের ওপরে এই দায়িত্ব ন্যস্ত হল যে, তিনি ফরাশি দেশের সম্রাটকে বুঝিয়ে শুনিয়ে যেন মিশরের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রবৃত্ত করে, তাঁর দৃষ্টি অন্যদিকে নিয়ে যান। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তথাপি, প্যারীর বিদ্বৎসমাজের সংস্পর্শে এসে, লাইবনিজ মোহিত হয়ে যান। ১৬৭৬ সাল থেকে, তাঁর মৃত্যুকাল ১৭১৬ সন পর্য্যন্ত তিনি হ্যানোভারের সর্দারের শাসন পরিষদে পরামর্শদাতা ও গ্রন্থাগারিক রূপে হ্যানোভারে ছিলেন। এই সময় লাইবনিজের পরামর্শে ১৭00 সালে বার্লিনের 'বিজ্ঞান-পরিষৎ'[1] স্থাপিত হয়। তিনি এই প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যক্ষ[2] ছিলেন। লাইবনিজের অধিকাংশ গ্রন্থ কোন কোন সর্দার, রাজা, রাণী বা সম্রাটের অনুরোধে লিখিত হ'য়েছিল। এঁদের দ্বারা তিনি নানা পদবী ও সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। আর রাজ-সম্মানে লাইবনিজের অভিরুচিও কিছু কম ছিল না। তিনি অন্তর-করণ বা অন্তর-গণন[3] নামক গণিতের বিশিষ্ট শাখাটির উদ্ভাবক। কিন্তু এর আগেই নিউটনও স্বতন্ত্রভাবে এই গণনপদ্ধতির একটি বিশিষ্ট প্রণালী আবিষ্কার করেছিলেন। এইরূপ বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন ও অনেক রকম কার্যে সর্বদা ব্যাপৃত থাকায়, লাইবনিজ তাঁর দর্শন-বিষয়ক মৌলিক চিন্তাগুলো সুসমঞ্জসভাবে একত্র গ্রথিত করে একটি সুবিন্যস্ত সর্বাঙ্গযুক্ত দর্শন রচনা করবার অবসর পাননি—শুধু ছোট ছোট বহু প্রবন্ধ রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর প্রধান দার্শনিক গ্রন্থগুলোর নাম এই। (১) মানব-বুদ্ধি বিষয়ক নতুন প্রবন্ধাবলী; (২) চিদণুতত্ত্ব, (৩) থিওডিসি[4]।

লাইবনিজ চিদণু নাম দিয়ে দেকার্তীয় দ্রব্যের ধারণার থেকে একটি উন্নততর ধারণা দার্শনিকদের সামনে রাখলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, এই ধারণাটির ভেতর প্রাচীন পরমাণুবাদ ও দেকার্তীয় ধারণা, এই দুটির মিলন সংসাধিত হয়েছে; অথচ এতে লাইবনিজের ধারণার অভিনবত্ব বজায় রয়েছে। দেকার্তীয়রা দ্রব্যের লক্ষণের ভেতর স্বাধীনতার ধারণা

---

1 Academy of Sciences.
2 President.
3 Differential Calculus.
4 (1) *New Essays Concerning the Human Understanding*; (2) *Monadology*; (3) *Theodicy*.

সমাবিষ্ট বলে যে মতটি পোষণ করতেন, তা ন্যায়সঙ্গত, একথা ঠিক। কিন্তু, তাঁরা স্বাধীনতার যে লক্ষণ দিয়েছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি স্বাধীনতার অর্থ এমন হয় যে, যার সীমা আছে অথবা অবধি আছে, তাই পরাধীন, তাহলে, স্পিনোজাই দেখিয়েছেন যে, দ্রব্যশব্দ শুধু একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছুরই বোধক হতে পারে না। স্পিনোজীয় মতটি যদি এড়াতে হয়, তাহলে, স্বাধীনতা বলতে স্বাধীন অস্তিত্ব না বুঝিয়ে, স্বাধীন কৃতি অথবা স্বয়ংকৃতি বুঝতে হবে। দ্রব্য মানে যা স্ব-সত্তার জন্য নিজের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, এরূপ বলা সঙ্গত হবে না। যদি তা সংগত হতো, তাহ'লে, সসীম অথবা সান্ত দ্রব্যের অস্তিত্ব সম্ভবপর হ'তো না। দ্রব্য মানে যা স্বয়ংক্রিয়, অর্থাৎ যা নিজেই স্বীয় পরিবর্তমান অবস্থাগুলোর হেতু। অর্থাৎ দ্রব্যের লক্ষণ কুর্বদ্রূপ বা সক্রিয় শক্তি বা বল, এরূপ করা কর্তব্য। কিন্তু লাইবনিজ এই সক্রিয় বল শব্দের দ্বারা এমনকিছু বোঝাতে চান, যা খৃষ্টীয় মধ্যযুগীয় ধর্ম-পণ্ডিতদের[1] "সম্ভাবনা" অথবা "শক্তি"র ধারণা থেকে অত্যন্ত পৃথক্। আর, কিছু বিবেচনা করলে বোঝা যাবে যে, লাইবনিজের ধারণাটি ধর্মপণ্ডিতদের মতের তুলনায় অনেক বেশী সন্তোষজনক। শক্তি বা সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার কাজটি কোন বাহ্য ভাবাত্মক[2] উদ্দীপকের[3] ওপর নির্ভর করে। কিন্তু লাইবনিজের সক্রিয় কুর্বদ্রূপতা অথবা বল বাহ্য প্রতিবন্ধকের বাধা না পেলে আপনা থেকেই বাস্তবায়িত হয়। দ্রব্য মানে যা কর্মক্ষম। সত্তার অর্থ সক্রিয়তা বা কুর্বদ্রূপতা, এরকম একবার স্বীকার করলে, স্পিনোজার মতন সান্ত পদার্থ থেকে দ্রব্যত্ব 'তুলে' নিতে হয় না। অন্তঃস্ফূর্ত কুর্বদ্রূপতা থাকাতেই, প্রত্যেক সত্তাবান বস্তু এক একটি বিশিষ্ট ও স্বলক্ষণ ব্যক্তি হতে বাধ্য। দ্রব্য মানে বল-ধনে ধনী একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি।

দৃশ্যমান জাগতিক বস্তু সকলের উপপত্তির জন্য পরমাণুবাদীরা কতকগুলো অমিশ্র, অবিভাজ্য, নিত্য ও পৃথক পৃথক দ্রব্য মেনে ঠিকই করেছিলেন। কারণ, নিত্যবস্তু মাত্রই অমিশ্র বস্তুর উপাদানে গঠিত, কিন্তু পরমাণুবাদীরা এই অমিশ্র পৃথক পৃথক দ্রব্যগুলোকে জড় বস্তুরই অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য কণা বলে ভেবেছিলেন। এতে কিন্তু এঁরা মস্ত একটা ভুল করেছিলেন। কারণ, জড়বস্তুর যত ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম অংশই হোক না কেন,

1 Scholastics.
2 Positive.
3 Stimulus.

তাকে অবিভাজ্য বলা সংগত নয়। জড়ের স্বভাবই এরকম যে তাকে অবিরাম ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যেতে পারে। আর এই বিভাজন ক্রিয়ার কোন অন্ত নির্দেশ করা চলে না। অবিভাজ্য একক বস্তুর সন্ধান পেতে হলে, জড়ের রাজ্য অতিক্রম করে অজড়ের ক্ষেত্রে যেতে হবে এবং মানতে হবে যে, সর্ব মিশ্র বস্তু অজড় উপাদানে গঠিত। জড়ীয় বিন্দু অর্থাৎ জড়ের পরমাণুও ত জড়; তাকে পরিমাণ-শূন্য বিন্দু নাম দেওয়া ভুল হবে। গাণিতিক বিন্দু অবিভাজ্য বটে; কিন্তু এটি মনের একটি ধারণামাত্র, তা আসলে অস্তিত্বহীন। শুধু দ্রব্যাত্মক বিন্দু অর্থাৎ অজড় আত্মার মতন এককের মধ্যেই অবিভাজ্যতা এবং অস্তিত্ব, এ দুয়ের সমাহার দেখা যায়। এই অজড় দ্রব্যাত্মক বিন্দু তার অবিভাজ্যতাবশত: অমরও বটে। কারণ, অংশের সংযোগ-বিভাগে এর উৎপত্তি বা নাশ হতে পারে না। শুধু ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সৃষ্টি বা ধ্বংস ক্রিয়ার দ্বারাই এরকম অজড় বিন্দুর অস্তিত্ব লাভ অথবা অস্তিত্ব থেকে বিচ্যুতি ঘটতে পারে। এরকম বিন্দুদের দেশাতীত বৈন্দব স্বভাববশত: এদের ওপর কোনরকম বাহ্যপ্রভাবের সম্ভাবনা থাকতে পারেনা। এইরূপ চেতনাণু বা চিদণু[1] তার বিভিন্ন বৃত্তি বা অবস্থাগুলোকে নিজ অন্ত:স্বভাব থেকে নিজেই অভিব্যক্ত করে। অন্য কোন জিনিষের ওপর কোন ব্যাপারেই তাকে নির্ভর করতে হয়না। চিদণু হচ্ছে স্বয়ং সম্পূর্ণ। সুতরাং, তা, এরিষ্টটল-পরিকল্পিত এ্যান্‌টেলেচি নামের যোগ্য।

দেকার্ৎ ও পরমাণুবাদী উভয়ের নিকটই লাইবনিজ তাঁর স্ব-রচিত চিদণুবাদের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। তিনি দেকার্তীয় দর্শনকে সম্যক্ তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রবেশগৃহ এবং পরমাণুবাদকে চেতানাণুবাদের পূর্বাভাস বলে প্রশংসা করেছেন। প্রথম মতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্রব্য হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় শক্তি-স্বরূপ, আর দ্বিতীয়টি থেকে এটাই নির্গত হয় যে, আসল দ্রব্য হচ্ছে অজড়, স্বলক্ষণ একটি একক[2]। চিদণুর এই দ্বৈতরূপ থেকে বোঝা যায় যে, চিদণুর মূল উপাদান হচ্ছে একপ্রকার ধারণা-জনক শক্তি বা বল[3]। সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চিদণু ও তৎস্থ ধারণা এই দুই প্রকার জিনিষই একমাত্র সত্য।

1 Monad.
2 A unitary entity.
3 Representative force.

ধারণা সকলের উৎপাদন, এটাই চিদণুর একমাত্র ক্রিয়া। কিন্তু সৃষ্টির সর্বত্র এই ক্রিয়াটি মানুষ সচেতনভাবে যে-ক্রিয়া করে, তার মতন নয়। লাইবনিজ ধারণা শব্দটি কিছু ব্যাপক-অর্থে ব্যবহার করেছেন। মনোবিজ্ঞানে সংবিৎ ও স্ব-সংবিৎ, এই দুয়ের ভেতর পার্থক্য স্বীকৃত হয়। লাইবনিজের ধারণাগুলো যেন সংবিদের মতন—যে সংবিদের কোন চেতনা নেই। সাগরতীরের নিকট যে গর্জন শুনা যায়, তা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের পৃথক পৃথক আওয়াজ মিলিত হয়ে তৈরী হয়, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে শুধু একটি শব্দ এত ক্ষীণ যে, তা শোনা অসম্ভব। বহুস্থলে, চিদণুর ধারণাগুলো এই রকম; অর্থাৎ এ সকল ধারণার কোন স্পষ্ট চেতনা নেই। ছোট ছোট তরঙ্গের ক্ষীণ আওয়াজগুলো শোনা না গেলেও, তারা নিশ্চয়ই আমাদের মনে দাগ কেটে যায়। তা না হলে, ঐ সকল আওয়াজের সমষ্টি কতকগুলো শূন্যের যোগফলের মতন শ্রবণের অযোগ্য হয়ে যেত। সুতরাং প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র তরঙ্গগতি আমাদের মনে যে পরিণাম ঘটায়, তাকেও একটি অতিশয় দুর্বল, বিজড়িত ও অস্পষ্ট সংবেদন বলে মানতে হবে। এইরূপ অনেক সংবেদন একত্র হওয়ার ফলে, গোটা সংবেদনটি সবল, বিবিক্ত ও স্পষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানপদের বাচ্য হয়। এক-একটি তরঙ্গের অত্যন্ত ক্ষীণ আওয়াজটি কোন না কোন রকমে অনুভূত হয়; কিন্তু তা বিবিক্তরূপে অনুভূত হয় না। অর্থাৎ, তার সংবেদন থাকলেও, প্রতি-সংবেদন নেই[1]। মানবমনের স্পষ্ট চিদ্-বৃত্তির (বা চিদবস্থার) সাথে অসংখ্য অস্পষ্ট ও নির্জ্ঞান ধারণাও রয়েছে। আর, সত্তার নিম্নতম স্তর-গুলিতে কোন চিদণুর সমগ্র জীবনে এইরকম নির্জ্ঞান ধারণা ছাড়া আর অন্য কিছুই পাওয়া যাবে না। নিম্নতম স্তরে চিদণুগুলো কখনও তাদের গাঢ় সুষুপ্তি অর্থাৎ নির্বুদ্ধ মূর্চ্ছাবস্থার উর্ধ্বে উঠতে পারে না।

এই ব্যাপক অর্থ অনুসারে, বিষয়-প্রত্যক্ষের[2] ব্যাখ্যা এরকম হবে যে, তা হচ্ছে একের ভেতর বহুর ধারণা। ধারণাকারী চিদণুটি নিজের অমিশ্র-স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রেখেই নানা বাহ্যবস্তুর সাথে বহুবিধ সম্বন্ধে সংবদ্ধ হয়। নানা বাহ্য বস্তু মানে সমগ্র বিশ্ব। প্রত্যেকটি চিদণু অন্য প্রত্যেকটি চিদণুকে নিজের ভেতরে প্রতিবিম্বিত করে বলে, তাও একটি ঘনীভূত সমগ্রের অথবা ক্ষুদ্র আকারে আকারিত বিশ্ব। যে চিদণুর কাছে, অস্পষ্ট

1 Perceived but not apperceived.
2 Perception.

ধারণা স্পষ্ট আকার ধারণ করেছে, এরকম সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্ন একটিমাত্র চিদণু আছে, যা নিজের ভেতর সমগ্র বিশ্বের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে দেখতে পায়। এইভাবে প্রত্যেকটি চিদণুকে বিশ্বের এক একটি দর্পণ বলা যেতে পারে। কিন্তু এই দর্পণ সাধারণ দর্পণের মতন নিষ্ক্রিয় ও নির্জীব নয়। কিন্তু তা ক্রিয়াশীল ও সজীব। এই চিদণু বাহ্য-প্রভাবের প্রেরণা ছাড়াই শুধু নিজস্ব ক্রিয়ার দ্বারা অন্তর্নিহিত বীজরূপে অবস্থিত ধারণাগুলোকে অঙ্কুরায়িত ক'রে, তাদের বাড়িয়ে, বাহ্য বিশ্বের প্রতিবিম্ব নির্মাণ করে। চিদণুগুলো হচ্ছে গবাক্ষবিহীন—তাদের এমন কোন জানালা নেই, যার ভেতর দিয়ে অন্য পদার্থ আনাগোনা করতে পারে। স্বীয় কৃতির জন্য চিদণু শুধু ঈশ্বর ও নিজের ওপর নির্ভর করে। প্রত্যেক চিদণু একই বিশ্ব প্রতিবিম্বিত করলেও, প্রত্যেকেই তা নিজের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করে। বিশ্বের যে অংশ চিদণুর নিকটে, তার প্রতিফলন স্পষ্ট হয় এবং যা দূরে, তার প্রতিফলন অস্পষ্ট হয়। সকল চিদণুরই জ্ঞাত বিষয়টি এক হওয়ায়, তাদের পারস্পরিক পার্থক্য তাদের ধারণার স্পষ্টতা, অথবা ক্রিয়াশক্তির তারতম্য দ্বারা নিরূপিত হয়। ধারণাই চিদণুর একমাত্র ক্রিয়া ব'লে, স্পষ্ট ধারণা মানে অপ্রতিরুদ্ধ অবাধ ক্রিয়া, আর অস্পষ্ট ধারণা মানে বাধাপ্রাপ্ত প্রতিরুদ্ধ ক্রিয়া অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়তা। চিদণুর ধারণাগুলো যতখানি স্পষ্ট, তা ততখানি সক্রিয়। সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও বিবিক্ত বিষয়-প্রত্যক্ষের ব্যাপারে একমাত্র ঈশ্বরেরই অধিকার রয়েছে। কারণ, যিনি সর্বত্র বিরাজমান, সকল জিনিষই সমানভাবে তাঁর নিকটে। একমাত্র ঈশ্বরই শুদ্ধ ক্রিয়াস্বরূপ। সসীম সত্তামাত্রেই সক্রিয়তার সাথে কিছু নিষ্ক্রিয়তাও থাকে। কারণ, সসীম সত্তার ধারণাগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট ও বিবিক্ত হয় না। এ্যারিস্টটল এবং স্কলাসটিকস্‌দের পরিভাষা অনুসরণ করে, লাইবনিজ সক্রিয়তার তত্ত্বটিকে আকার এবং নিষ্ক্রিয়তার তত্ত্বটিকে জড় বা তম এই আখ্যা দিয়েছেন। চিদণুগুলো ঈশ্বরের মতন বিশুদ্ধ ক্রিয়ারূপ নয় বলে, তারা আকার (অর্থাৎ এণ্টেলেচি বা আত্মা) এবং জড়ের মিশ্রণে গঠিত। কিন্তু চিদণুর উপাদান যে, এই তম, তার অর্থ পিণ্ড বা মূর্তি নয়। তম শব্দের দ্বারা এখানে শুধু চিদণুস্থ ক্রিয়ার রোধকারী কোন হেতু বুঝতে হবে। এটাই আদি জড়তত্ত্ব। পিণ্ড বা ভরাট মূর্তিকে দ্বিতীয় তম-তত্ত্ব বলা চলে। প্রথম তম-তত্ত্বটি ধারণা সকলের অবিবিক্ততার হেতু। কিন্তু দ্বিতীয় তত্ত্বটি এই অবিবিক্ততার ফল বা কার্য। কয়েকটি চিদণুর সমূহ যদি

অবিবিক্তভাবে জ্ঞাত হয়, তাহলে তা নিরেট পিণ্ডরূপে অবভাসিত হয়। চিদণুর সক্রিয়তা স্বীকার না করলে, স্পিনোজার মতন ভুল করা হবে; কিন্তু তার তমগুণ না মানলে বিপরীত ভুলটি করা হবে, অর্থাৎ সান্ত ব্যক্তি-সত্তাকে ঈশ্বর বলে মনে হবে।

ধারণার স্পষ্টতা ও বিবিক্ততার যত সংখ্যক মাত্রা থাকতে পারে, চিদণুর সংখ্যাও তদনুরূপ হবে। তবুও, এই সকল চিদণুকে কয়েকটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। বিষয়ের প্রত্যক্ষ মোটামুটি দুই রকমের হয়: (১) স্পষ্ট ও (২) অস্পষ্ট। স্পষ্ট প্রত্যক্ষেরও দুটি উপবিভাগ আছে: (অ) বিবিক্ত ও (আ) অবিবিক্ত অথবা জড়িত। যখন কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ অন্যান্য বিষয়ের প্রত্যক্ষের তুলনায় পুরোপুরিভাবে ঘটে, তখন ঐ প্রত্যক্ষটিকে স্পষ্ট বলা যায়; আর ঐ প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলো যখন পরস্পর থেকে পৃথকভাবে প্রতিভাত হয়, তখন প্রত্যক্ষটিকে বিবিক্ত বলা হয়। বর্ণিত এই কয়েকটি পার্থক্য মেনে নিয়ে, লাইবনিজ চিদণুগুলোকে তিনটি প্রধান স্তরে সন্নিবিষ্ট করেছেন। সকলের নিম্নস্তরে রয়েছে একেবারে সাদাসিধে রিক্ত অণুগুলো। এরা কখনও অস্পষ্ট ও নির্জ্ঞান ধারণার উর্ধ্বে উঠতে পারে না। এদের জীবন যেন এক প্রকার চির সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছায় অতিবাহিত হয়। যখন এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানযুক্ত-হার্দিক-অনুভবের আকারে দেখা দেয়, তখন চিদণুটি জীব[1] নামের যোগ্য হয়। এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় স্তর। ক্রমে যখন এই জীব স্ব-সংবেদন-যুক্ত হয়, এবং বিচারবুদ্ধি অথবা সার্বিক সত্য লাভ করে, তখন তাকে আত্মা[2] নাম দেওয়া চলে। এটাই হচ্ছে তৃতীয় বা সর্বোচ্চ স্তর। প্রত্যেক স্তরেই নীচের স্তরগুলোও সমাবিষ্ট থাকে। অর্থাৎ আত্মার স্তরেও চিদণুর ভেতর বহু অস্পষ্ট ও অবিবিক্ত ধারণা থেকে যায়। দেকর্তীয়েরা চিন্তা বা জ্ঞানযুক্ত মানসক্রিয়াকে আত্মার স্বরূপ-ধর্ম বলে মনে করায়, তাতে যে নির্জ্ঞান মানস অবস্থা বা বৃত্তি আছে, তা অস্বীকার করেছেন। অবশ্য, ইতর প্রাণী থেকে আত্মার যে বৈশিষ্ট্য, চিন্তাই হচ্ছে তার হেতু। তবু, দেকার্তীয়দের উপরিবর্ণিত মতটি যে ভুল, তাতে সন্দেহ নেই।

বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ[3] থেকে কামনা বা এষণার জন্ম। তাই, এষণা পদার্থটি প্রত্যক্ষ থেকে কোন ভিন্ন ক্রিয়া নয়। তা সংবেদন বা

---

1 Soul.
2 Spirit.
3 Perception.

প্রত্যক্ষেরই রূপ। এক ধারণার ভেতর অন্য ধারণায় রূপান্তরিত হওয়ার দিকে ঝোঁক থাকে; তারই অপর নাম হচ্ছে কামনা বা এষণা। পরিবর্তন-উন্মুখ ধারণাই হচ্ছে প্রেরণা[1] (বা এষণা)। প্রত্যক্ষ যখন জ্ঞানযুক্ত এবং যুক্তি-বিচারানুগ[2] হয়, তখন এষণা বা ইচ্ছা সংকল্পে পরিণত হয়। প্রত্যেক চিদণুই স্বয়ংক্রিয়; কিন্তু চিদণুগুলোর ভেতর যারা চিন্তাশীল, শুধু তারাই স্বাধীন। আত্মার স্বয়ংক্রিয়তাই স্বাধীনতা নামে অভিহিত হয়। অনিয়তভাবে যথেচ্ছ আচরণকে স্বাধীনতা বলে না। অন্যের দ্বারা বাধ্য না হয়ে, স্বধর্মানুগ নিয়মে চলা, এতেই প্রকৃত স্বাধীনতা।

আগেই বলা হয়েছে যে, চিদণুতে যে সকল ধারণা দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলো চিদণুরই স্ব-নিহিত কতকগুলো ধারণার বীজের অভিব্যক্তির দ্বারা নিজের ভেতর থেকেই ঐ চিদণু আহরণ করে। তথাপি বিভিন্ন চিদণুর ভেতর বিশ্বের যে-সকল ভিন্ন ভিন্ন বস্তুবিষয়ক নানা ধারণা বা মনশ্চিত্র অভিব্যক্ত হয়, সেগুলো পরস্পরের সদৃশ। এই সাদৃশ্য ঐশ্বরিক পূর্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার দ্বারা[3] জনিত। প্রথম থেকেই ভগবান চিদণুগুলোকে এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যে, যদিও প্রত্যেকটির অবস্থান্তর বাহ্য প্রভাব ব্যতিরেকে স্বনিষ্ঠ নিয়ম দ্বারাই সংঘটিত হয়, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন চিদণুর পৃথক পৃথক অবস্থান্তরগুলো পরস্পরের সদৃশ হয়ে থাকে—ফলে মনে হয় যেন প্রত্যেকটি চিদণু অপর প্রত্যেকটি চিদণুর ওপর অনবরত ক্রিয়া করে যাচ্ছে। দেহ ও আত্মা পরস্পরের ওপর কিভাবে ক্রিয়া করে, দেকার্তের দিন থেকে এই যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধানে এই "পূর্বপ্রতিষ্ঠিত মিল বা সামঞ্জস্যের" ধারণা বিশেষ উপযোগী। দেহ ও আত্মা যেন এমন কৌশলে নির্মিত দুটি ঘড়ি যে, যদিও একটি অপরটির দ্বারা মোটেই নিয়ন্ত্রিত নয়, তবু এরা সর্বদাই ঠিক ঠিক একই সময় তাদের কাঁটায় নির্দেশ করে। দেকার্তীয় নিমিত্তবাদীরা যে অসংখ্য ছোটখাট অপ্রাকৃত দৈব ঘটনা ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে ছিলেন, তার তুলনায় লাইবনিজের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্যের ধারণায় নিশ্চয়ই অনেক সুবিধে ও লাঘব আছে। ভগবানের বুদ্ধিবিবেচনার দিক থেকে দেখলে, এটাই বেশী সংগত বলে মনে হবে। শুধু তাই নয়। এই সামঞ্জস্যকে অ-প্রাকৃত ব্যাপার বলাও ঠিক হবে না। কারণ, এটা প্রাকৃতিক নিয়মের

---

1 Impulse.
2 Rational.
3 By pre-establishad harmony.

বিঘাতক নয়, বরং সংসাধক। এমনকি, এই কল্পনাটিকে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ থেকেও মুক্তি দেওয়া চলে। আর তা করলে, মানসিক ঘটনাবলী ও শারীরিক ঘটনাবলীর আনুরূপ্য ব্যাখ্যা করার জন্য, এদের বাইরে কোন কারণের সন্ধান করা আবশ্যক হয় না। বলা চলে যে, সমগ্রবিশ্ব একটি নিবিড়ভাবে-সংযুক্ত-উপাদান-রাজীর দ্বারা সুসংঘটিত-সংঘাত[1]; এবং এই নিবিড় সংঘাতে প্রত্যেক দ্রব্যের বিশিষ্ট স্থানটি হচ্ছে তার স্বরূপ—এর প্রত্যেকটি অবিভাজ্য অংশ অপর প্রত্যেকটি অবিভাজ্য অংশের সাথে "প্রভাবক ও প্রভাবিত"[2] এই উভয় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এবং বিশ্বের ইতিহাস হচ্ছে অসংখ্য প্রতিবিম্বের সামঞ্জস্যযুক্ত একটি বিরাট ও অন্বয় প্রবাহ।

প্রতিবিম্বের ধারণা দিয়ে, লাইবনিজীয় অধিবিজ্ঞান সুরু হয়েছে। আর বিশ্বের ঐক্য বা একতানে তা সমাপ্ত। ধারণার ভেতরে পাই একের ভেতর বহু। (অর্থাৎ একই প্রতিবিম্বধারী চিদণুর ভেতর বহু বস্তুর বহু প্রতিবিম্ব); আর সামঞ্জস্যে পাই বহুর ভেতর এক। (অর্থাৎ ধারণাগত স্পষ্টতার অনন্ত-সংখ্যক মাত্রার ভেতর বিশ্বপ্রতিবিম্বের শৃঙ্খলা ও সুষমতা[3])। প্রত্যেক চিদণু একই বিশ্বের প্রতিবিম্ব ধারণ করে; কিন্তু প্রত্যেকেই একটু ভিন্নভাবে এই বিশ্বপ্রতিবিম্ব ধারণ করে। এই ব্যবস্থায় ভেদ ও অভেদের মাত্রা যতখানি পাওয়া গেলে এর চেয়ে অন্য ব্যবস্থায় বেশী সামঞ্জস্য হতে পারত না, ঠিক সেই রকমটি ঈশ্বরের বিধানে চিদণুর রাজ্যে পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকটি চিদণুর ভেতর ধারণাগত বিবিক্ততার যতগুলো বিভিন্ন মাত্রা সম্ভবপর, তার সবগুলোই বর্তমান; তথাপি, চিদণুগুলো তাদের ধারণাগত বিবিক্ততার তারতম্য নিয়ে সকলে মিলে একটি সুর-সামঞ্জস্যের[4] সংঘটক। বৈচিত্র্যের সাথে শৃঙ্খলা, বহুর মধ্যে এক, এটাই তো সৌন্দর্য্য ও পূর্ণতার লক্ষণ। সুতরাং যদি একথা সত্য হয় যে, বিশ্বে চরম বৈচিত্র্যের সাথে চরম ঐক্য মিলিত হয়েছে এবং এখানে কোন কিছুর অভাবও নেই, এবং এমন কিছু নেই যা নিষ্প্রয়োজন, তাহলে বুঝতে হবে যে, যতরকম ও যতগুলো জগৎ হওয়া সম্ভবপর, তাদের ভেতর আমাদের জগৎই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণতম[5]।

---

1 Organic whole.
2 Actively and passively.
3 Congruity.
4 Harmony.
5 The best of all possible worlds.

নিম্নতম স্তরগুলোও সমগ্রের পূর্ণতা কিছু পরিমাণে সম্পাদন করে—এই নিম্নতম স্তরগুলো না থাকলে, পূর্ণতার ভেতর কিছু ফাঁক থেকে যেত। অস্পষ্ট ও অবিবিক্ত ধারণাগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে দেখলে, তাদের ভেতর ত্রুটিবিচ্যুতি নিশ্চয়ই লক্ষিত হয়। কিন্তু সমগ্রের দৃষ্টিতে সেরকম নয়। কারণ, ধারণার অস্পষ্টতা মানে চিদণুর বাধাপ্রাপ্ত কুর্বদ্রূপতা অথবা তার নিষ্ক্রিয়তা, অর্থাৎ এক চিদণু নিজেকে অন্য চিদণুর মতন ক'রে, তাদের অধীন হয়ে যায়; এবং এরই ওপর জগতের শৃঙ্খলা ও সুসংবদ্ধতা নির্ভর করে। বলা যেতে পারে যে, সুরসঙ্গতির ধারণাটি হচ্ছে চিদণুবাদ ও সুখবাদের[1] সংযোজক সেতু।

যত বিভিন্ন রকমের জগৎ কল্পনা করা যেতে পারে, তাদের ভেতর আমাদের বাস্তব জগৎটি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা ভাল, এবং সেইজন্য ভগবান এই জগৎটিকে বেছে নিয়ে, তা সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও সংকল্পের জোরে, জগৎ-সংঘটক চিদণুগুলো অস্তিত্বে আগমন করে। এর আগে এরা বীজরূপে অথবা ধারণার আকারে ঈশ্বরের মনে বিদ্যমান ছিল; তখনও চিদণুগুলোর গুণ, ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য তাদের বর্তমান বাস্তব অবস্থা যেরকম, ঠিক সেরকমই ছিল; অর্থাৎ তাদের সম্ভাবনা-অবস্থায় তাদের যে স্বরূপ ছিল, বাস্তব-অবস্থাতেও তাই—অস্তিত্ব লাভে তাদের স্বরূপ বাড়েও না, কমেও না। প্রত্যেকটি সম্ভাবনার ভেতর অস্তিত্বলাভের দিকে একটি প্রেরণা থাকে। সম্ভাবনার স্বরূপটি যত পূর্ণ, প্রেরণার জোর এবং যৌক্তিকতা তত বেশী। সম্ভাবনা-অবস্থায় চিদণুগুলো যখন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকে, তখন তাদের ভেতর একরকম প্রতিযোগিতা থাকে। প্রথমে, এদের ভেতর যেগুলো পরস্পরের অবিরুদ্ধ, সেগুলো এক একটি সমূহে সম্মিলিত হয়; তারপর, এই সকল সমূহের ভেতর, যে সমূহটি সর্বাধিক পূর্ণতার অধিকারী, শুধু সেইটি অস্তিত্বের রাজ্যে প্রবেশ করার হুকুম পায়। সুতরাং চিদণু স্বকীয় পূর্ণতার দ্বারা অস্তিত্বের অধিকার অর্জন করে না, কিন্তু তা যে-সমূহের একটি অংশ, তার পূর্ণতার দ্বারাই অস্তিত্বলাভ করে। সম্ভাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ জগৎ কোন্‌টি, তা ঈশ্বরের জ্ঞান ও বুদ্ধিবিবেচনায় নির্ধারিত হয়, আর তাঁর কল্যাণময় ইচ্ছায় ঐ সম্ভাব্য জগৎ নির্বাচিত হয়ে, তাঁরই শক্তিতে বাস্তবায়িত হয়। এই নির্বাচনে ভগবানের কোনরকম খামখেয়ালিপনা নেই। যোগ্যতা

---

1 Hedonism.

অথবা সর্বাধিক কল্যাণের বিচার দ্বারাই এই নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত। ভগবদ্বুদ্ধি বা পূর্ণ ব'লে নির্ধারণ করে, তাঁর সংকল্প-শক্তি তাকে মূর্তরূপ না দিয়ে পারে না।

যথাযোগ্যতা অথবা সর্বাধিক কল্যাণের এই অমোঘ নিয়ম একটি ব্যাপকতর নিয়মের প্রকার-বিশেষ। লাইবনিজ এই ব্যাপকতর নিয়মের নাম দিয়েছেন "পর্যাপ্ত হেতু"-র[1] তত্ত্ব। এই প্রসঙ্গে লাইবনিজ আরোও বলেছেন যে, এরিস্টটল্-স্বীকৃত "চিন্তার নিয়মগুলো"[2] যতখানি প্রামাণ্যের অধিকারী, এই তত্ত্বটিও ততখানি প্রামাণ্যের অধিকারী। যদি কোন পদার্থ বা ঘটনার অস্তিত্বের জন্য পর্যাপ্ত অথবা পুরোপুরি হেতু থাকে, তাহলে তা সত্তাবান এবং তদ্বাচক বাক্যটি[3] সত্য। পর্যাপ্ত হেতুর দ্বারা কাদাচিৎক সত্তার অথবা দেশকালান্তর্গত ঐন্দ্রিয়িক সত্তার জ্ঞানের প্রামাণ্য নির্ধারিত হয়; আর অবশ্যম্ভব[4] অথবা চিরন্তন সত্তার শুদ্ধ যৌক্তিক জ্ঞানটি অবিরোধ-তত্ত্বের[5] ওপর নির্ভর করে। অবিরোধ তত্ত্বের নির্দেশ এই যে, যার ভেতর স্ব-বিরোধ আছে, তা মিথ্যা অথবা অসম্ভব; যাতে স্ব-বিরোধ নেই, তা সম্ভবপর[6]; আর যার বিপরীত ধারণাটি স্ব-বিরুদ্ধ, তা অবশ্যম্ভব। অথবা অ-বিরোধ তত্ত্বটিকে অভাবরূপে না দেখে, ভাবরূপে অভেদ তত্ত্বরূপে নির্বচন করলে, তার নির্দেশ এই দাঁড়াবে যে, প্রত্যেক পদার্থ এবং প্রত্যেক ধারণা নিজের সাথে একতাপন্ন। ইন্দ্রিয়ানুভূত সত্য, আর চিরন্তন সত্যের ভেদ শুধু মানুষের নিকটেই প্রতিভাত হয়। যেহেতু ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না নিয়ে সবকিছু সাক্ষাৎভাবে জানেন, অতএব দেশ-কালাবচ্ছিন্ন সত্যও তিনি চিরন্তন বা নিত্য সত্যরূপে দেখেন। তথাপি, মানুষের পক্ষে, চিরন্তন সত্য ও দেশকালাবচ্ছিন্ন সত্যের এই ভেদ এড়ানো অসম্ভব। লাইবনিজ এই ভেদের ওপর দুটি ভিন্ন রকমের অবশ্যম্ভতা দাঁড় করিয়েছেন। যার বিপরীত ধারণাটির ভেতর স্ব-বিরোধ জড়িত থাকে, তা অবশ্যম্ভব; আর যার বিপরীত ধারণাটি সম্ভবপর হওয়া সত্ত্বেও, তা বিশেষ যোগ্যতা-বশতঃ ঈশ্বর তাকে তদ্বিপরীত ধারণাটির চেয়ে বেশী পছন্দ করেন, তা

1 Sufficient Reason.
2 Laws of Thought.
3 Assertion.
4 Necessary.
5 Principle of non-contradiction.
6 Possible.

নীতিগতভাবে অবশ্যম্ভব হ'লেও আধিবৈজ্ঞানিকভাবে কাদাচিৎক ।[1] জড়ীয়[2] অবশ্যম্ভবতা দ্বিতীয়শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মগুলোর যে অনিবার্যতা দেখতে পাওয়া যায়, তা হচ্ছে সাপেক্ষ[3]—'সর্বোত্তমের নির্বাচন[4]' হচ্ছে তার নিয়ামক ; এ সকল নিয়মের সত্যতা কাদাচিৎক[5] অথবা দেশ-কালাবচ্ছিন্ন বস্তুস্থিতি-বিষয়ক[6] । কার্যকর-শক্তি-সম্পন্ন[7] যে কারণ এবং উদ্দেশ্যীভূত যে কারণ, তারা উভয়েই "পর্যাপ্ত হেতু"র উদাহরণ । পাঞ্চভৌতিক জগতের সর্বত্র প্রত্যেকটি বিশিষ্ট সত্তা সম্পূর্ণ বল-বৈজ্ঞানিক অথবা প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যাখ্যা করতে হবে । কিন্তু সর্ব প্রাকৃতিক নিয়মের সমষ্টি অর্থাৎ সমগ্র বল-বিজ্ঞান বল-বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যাখ্যার যোগ্য নয়—তা উদ্দ্যেশীভূত কারণের দ্বারাই ব্যাখ্যা করতে হবে । আসলে, "পর্যাপ্ত হেতু" বলতে লাইবনিজ প্রধানত: উদ্দেশ্যীভূত কারণই বোঝাতে চেয়েছেন ।

ওপরে যে তত্ত্বগুলোর কথা বলা হল, তাছাড়া লাইবনিজ আরো যে কয়েকটি তত্ত্বের নির্দেশ করেছেন, সেগুলো নীচে দেওয়া হচ্ছে :

(১) অবিরাম অথবা অনবচ্ছেদের নিয়ম ।[8]

(২) সাদৃশ্যের নিয়ম ।[9]

(৩) সর্ব পদার্থের পারস্পরিক বৈসাদৃশ্যের নিয়ম ।[10] অথবা ভেদগ্রহা-যোগ্যের অভেদ-নিয়ম ।[11]

(৪) বল বা শক্তির অবিনাশ্যত্বের তত্ত্ব ।[12]

এই নিয়মগুলোর ভেতর অনবচ্ছেদের নিয়মটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ববান । এই নিয়মটি একদিকে দুই পদার্থ কিংবা ঘটনার ভেতর ফাঁকা, ব্যবধান কিংবা খালি জায়গার নিষেধ করে, আবার অন্যদিকে সত্তা বা ঘটনার

---

1 Contingent.
2 Physical.
3 Conditional.
4 Choice of the best.
5 Contingent.
6 Truths of fact.
7 Efficient.
8 Law of continuity.
9 Law of analogy.
10 Law of universal dissimilarity of things.
11 Law of identity of indiscernibles.
12 Law of conservation of force.

অবিরাম ধারায় একই পদার্থের পুনরাগমন অস্বীকার করে। প্রাণীদের উচ্চ-নীচ স্তরের সোপান-শ্রেণীতে যেমন, ঘটনাবলীর প্রবাহেও তেমন, অবিচ্ছিন্ন সন্ততভাবের অথবা নৈরন্তর্যের আধিপত্য। যেহেতু সর্ব সত্তা ও ঘটনা মিলে একই অব্যাহত ক্রমিক ধারার সৃষ্টি হয়েছে, তাই জগতে যে ভেদ দেখা যায়, তা জাতিগত বা গুণগত ভেদ নয়; কিন্তু ন্যূনাধিক মাত্রাগত ভেদ। যে কোন পদার্থ ও তার বিপরীত পদার্থ এই দুয়ের প্রান্তগুলো বিভিন্ন ক্রমিক অবস্থান্তর-যুক্ত অসংখ্য সংযোজক সূক্ষ্ম অন্যান্য পদার্থের দ্বারা পরস্পরের সাথে সংবদ্ধ। স্থিতি ও গতি পরস্পরের বিরুদ্ধ নয়; কারণ, স্থিতিকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও মন্থর গতি বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। উপবৃত্ত[1] ও অধিবৃত্তের[2] মধ্যে কোন বিজাতীয় ভেদ নেই; কারণ, যে সকল নিয়ম প্রথমটিতে প্রযোজ্য, সেগুলো দ্বিতীয়টিতেও লাগান যায়। যে বৈসাদৃশ্য ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে পেতে অদৃশ্য হয়ে যায়, তারই নাম হচ্ছে সাদৃশ্য; অমঙ্গল মানে স্বল্পীকৃত মঙ্গল। বিজড়িত বা ব্যামিশ্র[3] ধারণা হচ্ছে অত্যন্ত কম পরিমাণে বিবিক্ত ধারণা। অত্যল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেই ইতরপ্রাণী নাম দেওয়া হয়। পাদপ মানে যে প্রাণীর চৈতন্য প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে; তরলতার অর্থ হচ্ছে কাঠিন্যেরই ন্যূনতর মাত্রা; ইত্যাদি। বিশ্বের সর্বত্র[4] সাদৃশ্য ও আনুরূপ্যের[5] রাজত্ব; আপাত বৈসাদৃশ্যের স্থলেও শুধু সাদৃশ্যেরই মাত্রা বা তারতম্যগত ভেদ। সুতরাং এ সব স্থলেও সাদৃশ্যই বিদ্যমান। বিশ্বের বৃহত্তম ক্ষেত্রে পদার্থ সকলের চাল-চলন যে প্রকার, চিদণুর ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রেও ঐ প্রকারই চলছে; জগতের প্রত্যেকটি পরবর্তী অবস্থা তারই অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থার ভেতর বীজরূপে বিদ্যমান থাকে; ইত্যাদি। নিরবচ্ছিন্ন সন্ততভাব থেকে একদিকে যেমন সাদৃশ্যের তত্ত্ব নির্গত হয়, তেমনি অপরদিকে সার্বিক বৈসাদৃশ্যের অথবা "ভেদগ্রহাযোগ্যের অভেদ" এই তত্ত্বটিও নিঃসৃত হয়। প্রকৃতি যেমন রিক্ততা বা শূন্যস্থান অপছন্দ করে, তেমনি প্রয়োজনাতিরিক্ত পদার্থ অপছন্দ করে। বাস্তব জগতে ক্রমিক শ্রেণীর[6] প্রত্যেকটি স্তর

---

1 Ellipse.
2 Parabola.
3 Confused.
4 Similarity.
5 Correspondence.
6 Series.

বা মাত্রার অনুরূপ একটি প্রতিনিধি থাকা অত্যাবশ্যক ; তথাপি কোন মাত্রারই একাধিক প্রতিনিধি থাকলে চলবে না। অর্থাৎ জগতের কোথাও এমন দুটি পদার্থ বা ঘটনা নেই, যারা সর্বতোভাবে সমান। যদি তারা সর্বতোভাবে সমান হতো, তাহলে তারা দুই-ই থাকত না। এক হয়ে যেত। তাদের পার্থক্য শুধু সংখ্যাগত, অথবা স্থান কিংবা কারণ নিবন্ধন নয়, কিন্তু এই পার্থক্য সর্বদাই স্বরূপগত। প্রত্যেক পদার্থের স্বভাবই এমন যে, তা অপর অন্য সব পদার্থ থেকে ভিন্ন না হয়ে পারে না। এই সার্বিক বৈলক্ষণ্য পারমার্থিক বস্তুর অর্থাৎ চিদণুর জগতে যেমন, তেমনি প্রতীয়মান আভাসিক[1] জগতেও প্রযোজ্য। একই গাছের দুটি পাতার কখনও সর্বতোভাবে ঐক্য নেই।

দেকার্তীয়রা গতির অনপচয় মানত। লাইবনিজ তার পরিবর্তে বল বা শক্তির অনপচয় মেনে, ঐ মতের ভুল সংশোধন করে বর্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক ধারণার খুব নিকটে এসেছিলেন। দেকার্তের মতে, বাস্তবিক গতির সমষ্টি বদলায় না ; লাইবনিজের মতে সক্রিয় বল বা শক্তির সমষ্টি সর্বদা একই থাকে। আর বর্তমানকালীন বৈজ্ঞানিক মত এই যে, সক্রিয় বল এবং করিষ্যমাণ অথবা বীজরূপে বর্তমান বল, এই দুয়ের সমষ্টি সর্বদাই অপরিবর্তিত থাকে। সক্রিয় বল ও বীজাকারে বর্তমান বলের পার্থক্য লাইবনিজ নিজেও স্বীকার ও প্রয়োগ করেছিলেন।

2. জীব-জগৎ[2]

জীব বা প্রাণী হচ্ছে অসংখ্য অঙ্গের দ্বারা গঠিত একপ্রকার যন্ত্র। ঈশ-সৃষ্ট নৈসর্গিক যন্ত্র এবং মনুষ্য-সৃষ্ট কৃত্রিম যন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটি তার সূক্ষ্মতম অংশেও যন্ত্রপুঞ্জ ছাড়া আর কিছুই নয়। এক একটি জীব হচ্ছে অসংখ্য চিদণুর মিশ্রণ। এদের ভেতর একটি চিদণু মুখ্য-স্থানীয়, ওটাই ঐ জীবের আত্মা। অন্যান্য চিদণুগুলো এই আত্মার সেবক এবং সম্মিলিতভাবে তারা ঐ আত্মার দেহ। প্রধান চিদণুর প্রাধান্য-জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য এই যে, তার ধারণাগুলো অন্যান্য চিদণুর ধারণার থেকে অধিক স্পষ্ট ও বিবিক্ত। সুতরাং এই প্রধান চিদণুটি তাদের তুলনায় বেশি সক্রিয়। আত্মা ও দেহ পরস্পরের ওপর সাক্ষাৎভাবে পরিণাম

1 Phenomenal.
2 The Organic World.

ঘটাতে পারে না। তবে তাদের ভেতর একটি ত্রুটিবিহীন আনুরূপ্য[1] থাকে। যে-সকল চিদণু শরীরের উপাদান, তারাই আত্মার প্রথম ও সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয়। আত্মা তাদের সাহায্যে বাকি জগৎ পরোক্ষভাবে জানে। সুতরাং আত্মা বাহ্যজগতের চেয়ে দেহের উপাদানীভূত চিদণুগুলোকে বেশী বিবিক্তরূপে জানতে পারে। আত্মরূপ চিদণুটি এবং তার শরীররূপ চিদণুগুলোর ভেতরে যে সেব্য-সেবক সম্বন্ধ, তাও পূর্বসিদ্ধ সামঞ্জস্য অনুসারে ঈশ্বরই বিধান করেছেন।

লাইবনিজের মতে, যা সম্পূর্ণ একক ও অমিশ্র, শুধু তাই দ্রব্য নামের যোগ্য। কিন্তু জীবের অংশ সকলের ভেতর যে পারস্পরিক অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক দেখা যায়, তার জন্য, এবং খ্রীষ্টের মৃত্যুর স্মরণে যে ধর্মীয় ভোজের ব্যবস্থা আছে, তাতে ভোজ্য খাদ্যপদার্থে খ্রীষ্টের দেহ বিদ্যমান থাকে, এই ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য, লাইবনিজ তাঁর পূর্বমতটি ছেড়ে দিয়ে, মিশ্র-দ্রব্যের সম্ভাব্যতা অথবা জীবের অংশগুলোর ভেতর একটি দ্রব্যীয় বন্ধন[2] মেনেছিলেন। এই দ্রব্যীয় বন্ধনের কাজ কেন্দ্রস্থলীয় চিদণুটির ওপর যদি রাখা হত, তাহলে লাইবনিজের অন্যান্য মতের সাথে খুব বেশী বিসংগতি হত না।

নিসর্গের প্রত্যেক বস্তু কতকগুলো "অঙ্গাঙ্গীভাবে নিবদ্ধ"[3] অংশের সমুদায়—আত্মা ছাড়া দেহ অর্থাৎ প্রাণহীন জড়পিণ্ড এই ভূমণ্ডলে নেই। ক্ষুদ্রতম ধূলিকণাও অসংখ্য জীবন্ত প্রাণীর আবাসস্থল। তার মানে জৈববস্তু ছাড়া অজৈব বস্তু বলে কিছু নেই। তাহলে, অজৈবের প্রাতীতিক সত্তার[4] ব্যাখ্যা কি? লাইবনিজের মতে, বিস্তার-যুক্ত জড়পিণ্ডের অবভাস অবিবিক্ত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে, পিণ্ডের উপাদানীভূত চিদণুগুলো পরস্পরের সাথে বিমিশ্রভাবে প্রতিভাত হয় এবং তখন এদের সমুদায়টিকে একটি নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় নিরেট বস্তু বলে মনে হয়। সুতরাং তথাকথিত জড়দেহও অনুভবকারীর আত্মাতে অবিবিক্ত বিজ্ঞান বা ধারণা-রূপেই অস্তিত্ববান। তথাপি, যেহেতু এই জড়পিণ্ডের ধারণার বিষয়রূপে একটি জ্ঞাতৃবহির্ভূত সত্তা আছে, অর্থাৎ যেহেতু এই তথাকথিত জড়বস্তুর ধারণার অনুরূপ একটি চিদণু-সমুদায় রয়েছে, অতএব, জড়পিণ্ডের অবভাস

---

1 Correspondence.
2 Substantial bond.
3 Organised.
4 Apparent reality.

যে একেবারে তুচ্ছ আকাশকুসুমতুল্য অসৎ পদার্থ, এরকম বলা ঠিক হবে না। অবভাস হলেও, জড়পিণ্ডের ধারণার একটি আলম্বন আছে এবং তা সৎ-এ প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু, জড়ের অস্তিত্ব ঐন্দ্রিয়িক সংবেদন অথবা অবিবিক্ত ধারণার ওপর নির্ভর করে, তাই দেশ ও কালকেও পরমার্থতঃ সৎ বলা চলে না। দেশ ও কাল দ্রব্যও নয়, আবার দ্রব্যের ধর্মও নয়। এরা শুধু প্রাতিভাসিক পদার্থ মাত্র। প্রথমটি সমকালীন বিদ্যমানতার ক্রম-বিশেষ, আর দ্বিতীয়টি পূর্বাপর অস্তিতা অথবা অনুবৃত্তির ক্রম।[1]

নিরাত্মদেহ যেমন নেই, অশরীরী আত্মাও অসম্ভব। আত্মা মাত্রেই তদধীন কতকগুলো নিম্নশ্রেণীর চিদণুসমূহের সাথে সংযুক্ত থাকে। এই নিম্ন-শ্রেণীর চিদণুগুলোর সমষ্টিই হচ্ছে ঐ আত্মার শরীর। শরীরস্থ চিদণুগুলোর ভেতর সর্বদাই কিছু পরিবর্তন চলতে থাকে—কতকগুলো শরীর থেকে বাইরে খসে পড়ে, আবার কতকগুলো নতুন চিদণু শরীরে প্রবেশ করে। আত্মা অবিরাম শারীরিক পরিবর্তন ও প্রবাহে জড়িত থাকে। সাধারণতঃ এই পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটে। খসে পড়া চিদণুগুলোর স্থান নতুন উপাদানে ভর্তী করা হয়। এইটি যখন অতি দ্রুত ঘটে, তখন লোকে তাকে জন্ম বা মৃত্যু বলে। বস্তুতঃ, বস্তুর জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। কেবল যে তা অবিনশ্বর তা নয়, উপরন্তু প্রত্যেক সজীব বস্তুই অনাদি। মৃত্যু মানে হ্রাস এবং অব্যক্ত অবস্থা, আর জন্ম মানে বৃদ্ধি এবং ব্যক্ত অবস্থা। মানুষ ও ইতর প্রাণীর জন্ম-পূর্ব ও মৃত্যুত্তর অস্তিত্ব মানতে হবে। অবশ্য, সৃষ্ট জগতে মানুষের যে উন্নত ও ভব্য স্থান আছে, তদনুরূপ তার অমরত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য সব চিদণুর কেবলমাত্র অনুবৃত্ত অস্তিত্বের তুলনায়, মানুষের অনাদি ও অবিনাশী অস্তিত্বকে অমরত্ব বা অমৃতত্ব নাম দেওয়া চলে—মৃত্যুর পরেও তার নৈতিক ব্যক্তিত্বের সচেতনতা ও স্মৃতি লোপ পায় না।

3. **মানুষ :** জ্ঞান ও এষণা[2] এবং যৌক্তিক বুদ্ধি থাকায়, মানুষ প্রতি-চিন্তন অথবা প্রতি-সংবেদনে[3] সমর্থ, এবং মানুষ ঈশ্বরকে, সামান্য বা জাতিকে এবং শাশ্বত অর্থাৎ প্রাক্-সিদ্ধ[4] সত্যকে জানতে পারে। কিন্তু ইতর প্রাণীর জ্ঞান শুধু ইন্দ্রিয়-সংবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এবং

---

1 Order of co-existence and sequence.
Volition.
Reflection.
4 *A priori.*

এদের বিচারশক্তি শুধু স্মরণশক্তির সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ভেতর সম্বন্ধ বোধ করাতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। মানুষের উর্ধ্ব-প্রাণীদের থেকে তার প্রধান পার্থক্য এই যে, তার অধিকাংশ ধারণাই অস্পষ্ট ও অবিবিক্ত। অস্পষ্ট ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট বৌদ্ধিকজ্ঞানের মাঝামাঝি বেদনা[1] নামক আর এক রকম চেতনা আছে। লাইবনিজ ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ ও বেদনানামক চেতনা, এই দুটিকেই অস্পষ্ট ধারণার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে, আমরা যখন কোন সঙ্গীত শুনি, তখন ঐ সঙ্গীতের বিভিন্ন সুরে তাল ও সংগতিগত সম্বন্ধগুলো অজ্ঞাতসারে গুণতে ও মাপতে থাকি; আর এরই ওপর গানের আনন্দ নির্ভর করে। শুধু সংগীত নয়, কিন্তু সর্বসাধারণ সৌন্দর্যের উপভোগ, এমনকি ইন্দ্রিয়জ সুখ কিছু না কিছু পূর্ণতা, শৃঙ্খলা[2] অথবা সামঞ্জস্যের অবিবিক্ত, বা বিমিশ্র ধারণার দ্বারা সংঘটিত হয়।

অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতার অনুবর্তনের নিয়ম[3] অনুসারে, আভ্যন্তরিক জীবন সম্বন্ধে লাইবনিজ নিম্নলিখিত মতগুলো আমাদের সামনে রেখে গেছেন। (১) আমাদের মনে সর্বদা কোন না কোন চিন্তা চলতে থাকে; (২) মনের প্রত্যেকটি ধারণা তার উৎপাদক পূর্ববর্তী অপর একটি ধারণার অস্তিত্ব সূচিত করে; (৩) ইন্দ্রিয়-সংবেদন ও বিচারবুদ্ধির[4] প্রভেদ শুধু মাত্রাগত, তা ভিন্ন জাতির ভেদ নয়; (৪) অবশ্য, কালের দিক থেকে, ঐন্দ্রিয়িক ধারণাকে বৌদ্ধিক ধারণার পূর্ববর্তী বলতে হবে; (৫) কখনও আমাদের মনের ধারণাবিহীন অবস্থা হতে পারে না। অবশ্য, অনেক সময় আমরা আমাদের মনের ধারণার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন নই। সুষুপ্তিতে যদি চিন্তা বা ধারণার অত্যন্তাভাব থাকত, তাহলে জেগে ওঠার পর, আমাদের মনে কোন ধারণাই উৎপন্ন হ'ত না; কারণ, প্রত্যেক নূতন ধারণা তৎপূর্ববর্তী অন্য ধারণা থেকে উদ্গত হয়। অবশ্য, এই অন্য ধারণাটির সম্বন্ধে আমরা সচেতন না হতে পারি।

লাইবনিজ তাঁর "মানববুদ্ধি সম্বন্ধে নূতন প্রবন্ধাবলী" নামক বহু গভীর চিন্তাসমৃদ্ধ পুস্তকে তাঁর জ্ঞান-বিষয়ক মত উপস্থাপন করেছেন। এতে প্রধানতঃ ইংরাজ দার্শনিক লক্ প্রণীত মুখ্য গ্রন্থের বিতর্কমূলক সমালোচনা

1 Feeling.
2 Order.
3 Law of continuity.
4 Sensation and Thought.

রয়েছে। দেকার্তের মতে, এমন কিছু-সংখ্যক ধারণা আছে, যেগুলোকে সহজাত ও অন্তর্নিহিত বলা যেতে পারে। লকের মতে কিন্তু কোন ধারণাই সহজাত নয়। এই উভয় দার্শনিকের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ, লক-এর বিরুদ্ধে, লাইবনিজ বললেন যে, মনের সর্ব ধারণাই সহজাত। দেকার্ৎ বলেছেন যে, ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ থেকে উৎপন্ন ধারণাগুলো মনের বাইরে থেকে আসে, আর লক্ বলেছেন যে, মনের সর্ব ধারণাই বাইরে থেকে আসে। কিন্তু লাইবনিজ বলতে চান যে, প্রথম থেকেই মনের ভেতরে তার প্রত্যেকটি ধারণা বিদ্যমান। অবশ্য, দেকার্তের বিরুদ্ধে, লকের সাথে একমত হয়ে, তিনি স্বীকার করেছেন যে, চিন্তা বা বিচার হচ্ছে ইন্দ্রিয়-সংবেদনের পরবর্তী, আর জাতি বা সার্বিক ধারণা ব্যক্তির জ্ঞানের পরে দেখা দেয়। তবু, এটা ভুলে গেলে ঠিক হবে না যে, যে অর্থে দেকার্ৎ বৌদ্ধিক ধারণাকে সহজাত বলে স্বীকার করেছেন, এবং লক অস্বীকার করেছেন, ঠিক সেই অর্থে, লাইবনিজ "সহজাত ধারণা" নামক পদার্থটি বোঝেন নি। তাঁর মতে, বৌদ্ধিক ধারণা মাত্রই এই অর্থে সহজাত যে, তা কখনও আত্মার বাইরে থেকে মনের ভেতরে ঢোকে না, অথবা কোন বাহ্য পদার্থের দ্বারা তার মনে জনিত অথবা অঙ্কিত হয়না। কিন্তু যেহেতু লাইবনিজ বলেন যে, বিচারাত্মক ধারণা মাত্রই ঐন্দ্রিয়িক ধারণা থেকে উৎপন্ন ও বিকশিত হয়, অতএব, দেকার্ৎ যে-অর্থে বৌদ্ধিক ধারণাকে সহজাত বলেছেন, সেই অর্থে লাইবনিজ তা বলতে পারেন না। অবশ্য, দেকার্ৎ-সম্মত অর্থেও লাইবনিজ চিন্তা বা বিচারাত্মক ধারণাকে সহজাত বলতে পারেন ; কারণ, তাঁর মতে, ঐন্দ্রিয়িক ও (সুতরাং) অবিবিক্ত ধারণা থেকে বিকশিত হলেও, এগুলো বিকশিত ও বিবিক্ত ধারণার আকার পাবার আগেই বীজরূপে অথবা অব্যক্তভাবে প্রথম থেকেই অবিবিক্ত এবং মিশ্র ধারণার মধ্যে নিহিত থাকে। এইভাবে লাইবনিজ দেকার্ৎ ও লক্ এই দুই দার্শনিকের সাথে কিছু অংশে সহমত হতে পারলেন ; মনই বিশুদ্ধ ধারণার উৎস, এই কথা মেনে নিয়ে, তিনি দেকার্ৎকে সমর্থন করলেন, এরকম বলা চলে আবার এই ধারণাগুলো মনের আদি জ্ঞানীয় বৃত্তি নয়, কিন্তু এদের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়-সংবেদনসাপেক্ষ, এই কথা বলে, তিনি লককে সমর্থন করেছেন। লাইবনিজ যে উক্ত দুই দার্শনিকের মতে সমন্বয় করতে পারলেন, তার কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়-সংবেদনের স্বরূপ সম্বন্ধে এই উভয় দার্শনিকের থেকেই তিনি ভিন্ন মত পোষণ করতেন। বিচার বা চিন্তা ইন্দ্রিয়-সংবেদন থেকে উৎপন্ন হয়, এই কথার সাথে যদি তা যে অন্য

কিছুর দ্বারা জনিত নয়, এই মতটিও একই সঙ্গে পোষণ করতে হয়, তা হলে, স্বীকার করা দরকার যে, ইন্দ্রিয়-সংবেদনই হচ্ছে অস্পষ্ট বিচার বা সার্বিক ধারণা। তাছাড়া, যেকোন ধারণাই নিজেও স্বয়ংক্রিয় এবং মৌলিক। চিদণুর ভেতরে, বাইরের থেকে কোন ধারণা আসতে পারেনা —এটাই লাইবনিজের, "চিদণুর কোন জানালা নেই", এই উক্তিতে বলা হয়েছে। মনের সর্বপ্রকার অনুভব প্রথম থেকেই অর্থাৎ মনের জন্মের সময় থেকেই অব্যক্তভাবে বীজরূপে নিহিত থাকে। লক্ কোরা কাগজের সাথে মন বা বুদ্ধির তুলনা দিয়েছেন। কিন্তু এটা সমীচীন নয়। বরং বলা যেতে পারে যে, মন যেন হচ্ছে এমন একখণ্ড মার্বেল পাথর, যার শিরায় শিরায়, তার থেকে যে মূর্তিটি তৈরি হবে, তার আদরা সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত থাকে। স্কলাসটিক্‌স্‌রা বলতেন যে, যা আগে ইন্দ্রিয়-সংবেদনে গৃহীত হয়নি, এমন কিছুই চিন্তা বা বিচার-বুদ্ধিতে ধরতে পারা অসম্ভব। এদের এইকথা নিশ্চয়ই সত্য। তবু এর সঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা উচিত—চিন্তা বা বিচারশক্তি অর্থাৎ নিজের ভেতর থেকে জ্ঞানকে আবিষ্কার ও বিকাশ করার ক্ষমতা মূলতঃ সংবেদন-শক্তি থেকে পৃথক নয়। ইন্দ্রিয়-সংবেদনে এমন কিছু বিদ্যমান থাকে, যাকে সুপ্ত বা বীজরূপে বিদ্যমান বৌদ্ধিক ধারণা বলা সংগত হবে। বল-বিজ্ঞান একথা অবশ্যই বলে যে, ইন্দ্রিয়-সংবেদন হচ্ছে যৌক্তিক ধারণার নিয়ত পূর্ববর্তী এবং নিয়ামক। আর উদ্দেশ্যতাবাদ বলে যে, যৌক্তিক ধারণার বিকাশ সম্ভবপর করার জন্যেই ঐন্দ্রিয়িক ধারণার অস্তিত্ব। ইন্দ্রিয়-সংবেদনের এই লক্ষ্য স্বীকার করে, লাইবনিজ তাকে এক নতুন মর্যাদার অধিকারী করলেন। ইন্দ্রিয়-সংবেদন মানে যৌক্তিক বিচারের এমন একটি অসম্পূর্ণ অবস্থা, যা যৌক্তিক বিচারে পরিণত হওয়ার জন্য প্রথম থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে। ইন্দ্রিয়-সংবেদন ও বিচারবুদ্ধি, এ দুয়ের ভেতর কোন জাতিগত বিভেদ নেই। প্রথমটিকে নিষ্ক্রিয় বা প্রভাব্য[1] বলে মানলেও, মনে রাখতে হবে যে, নিষ্ক্রিয়তা মানে অত্যল্প ও বাধাপ্রাপ্ত সক্রিয়তাই—তা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা নয়। তাছাড়া, সংবেদন ও বিচার উভয়েই স্বয়ংক্রিয়। শুধু একটি অপরটির চেয়ে অধিক সক্রিয় এই যা তাদের পার্থক্য।

ইন্দ্রিয়-সংবেদন ও বেদনা[2] হচ্ছে চিন্তার প্রাথমিক সোপান, এই মতের

---

1 Affected.
2 Feeling.

সাহায্যে লাইবনিজ স্পষ্টভাবে বুদ্ধিবাদের প্রতিষ্ঠা করলেন। পরবর্তীকালে, হেগেলের দর্শনে এই বুদ্ধিবাদই সমগ্র বিশ্বকে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য স্ব-বিকাশে ব্যাপৃত অদ্বয়তত্ত্বরূপে উপস্থাপিত করেছিল। বুদ্ধিবাদের দৃষ্টিতে, রূপ-রস-গন্ধ, স্থাবর ও জঙ্গম, সামান্য-বিশেষ প্রভৃতি সর্বপ্রকার জাতিগত বা গুণগত বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং মাত্রাগত তারতম্যের ভেদ ছাড়া আর কোন ভেদ প্রতীয়মান হয় না। কাণ্ট কিন্তু লাইবনিজীয় যুক্তিবাদের এই দিকটির তীব্রভাবে সমালোচনা করেন এবং এই বিতর্কে কাণ্ট জয়ী হয়েছিলেন বললে অন্যায় হবে না। তথাপি, লাইবনিজই তাঁর "সহজাত ধারণা" এই বিশিষ্ট মত প্রতিপাদন করে "বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার সমালোচনা"[1] নামক কাণ্টের বিখ্যাত গ্রন্থের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, এটাও অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞান-তত্ত্বের জন্য লাইবনিজকে দেকার্ৎ ও কাণ্টের সংযোগস্থাপক বললে, অত্যুক্তি হবে না। কারণ, অবশ্যম্ভব সত্য গোড়া থেকেই পূর্ণ পরিস্ফুটরূপে মনের ভেতর দেওয়া থাকে, এই দেকার্তীয় মতের পরিবর্তে লাইবনিজ বললেন যে, অবশ্যম্ভব সত্য ইন্দ্রিয়-সংবেদনকে নিমিত্ত ক'রে তার থেকেই পরিস্ফুট আকার ধারণ করে, অথবা স্পষ্ট সংবিদ্‌রূপে উন্নীত হয়। আসলে কিন্তু এটাই দেকার্তেরও মত। অবশ্য, যথাযোগ্য ব্যাখ্যার দ্বারা দেকার্ৎ নিজের মত স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন না করায়, তাঁর সমর্থক ও ভাষ্যকাররা তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। তদুপরি, লক্‌ দেকার্তের কাঁধে যে মতটি চাপিয়ে ছিলেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দেকার্ৎ কখনও এমন কথা বলেন নি যে, দোলনায় দোলায়মান শিশুও পুরাপুরি স্পষ্টভাবে চিন্তা ও বিস্তৃতি এবং ঈশ্বরের ধারণা করতে সক্ষম। বস্তুত:, লাইবনিজ দেকার্তীয় মতের পুন:প্রতিষ্ঠা অথবা উন্নতি সাধন, যাই করে থাকুন না কেন, অন্তত: এক বিষয়ে তিনি নিশ্চয়ই জ্ঞানতত্ত্বের বিচারে দেকার্তীয় মতের সামনে, আরও কয়েক পা অগ্রসর হতে পেরে-ছিলেন। আর এই বিষয়টি হচ্ছে ইন্দ্রিয়-সংবেদন ও যৌক্তিক চিন্তা, এ দুয়ের সম্বন্ধটি স্ফুটতর করা, যৌক্তিক চিন্তার বিশিষ্ট মর্যাদা ও ক্ষমতা স্বীকার করা এবং যৌক্তিক চিন্তার উৎপত্তি অথবা স্পষ্ট অভিব্যক্তি ইন্দ্রিয়ানুভূতির ওপর নির্ভর করে, এই কথা স্বীকার করা।

জ্ঞানতত্ত্বে, ধারণার সহজাতত্ববাদের বিরুদ্ধে লক্‌ যে আপত্তিটি তুলে-ছিলেন, লাইবনিজ তার এইভাবে নিরসন করলেন যে, মনের অভ্যন্তরে

1 *Critique of Pure of Reason.*

প্রায় নির্জ্ঞাতভাবে, অথবা সূক্ষ্মভাবে ধারণার অস্তিত্ব রয়েছে। একই রকম যুক্তির দ্বারা, লাইবনিজ নীতিবিজ্ঞানে স্বাধীন ইচ্ছাবাদের অর্থাৎ অকারণতা-বাদের[1] প্রত্যাখ্যান করেন। এ সম্বন্ধে লাইবনিজের মত এই। ইচ্ছা ও সংকল্প সর্বদাই কোন না কোন ধারণার অথবা কয়েকটি ধারণার সমষ্টির দ্বারা জনিত হয়ে থাকে। যেসব স্থলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আমরা বাহ্য প্ররোচনার বিরুদ্ধে নিজেকে স্বেচ্ছায় পরিচালিত করেছি, সেখানেও বুঝতে হবে যে, আমাদের অভ্যন্তরে অত্যন্ত বলবান প্ররোচনা কয়েকটি দুর্বল প্ররোচনার সংহতির দ্বারা পরাভূত হয়। উদ্দেশ্যের ধারণা সংকল্পের উৎপাদক, সাধারণত: এই উদ্দেশ্যীয় ধারণাটি খুবই জটিল। ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি প্ররোচনা দুই দলে বিভক্ত হয়ে, পরস্পরের শক্তি পরীক্ষায় যে-পক্ষের জয় হয়, সংকল্পও সেইদিকে ধাবিত হয়। যে উন্নত চিত্ত স্বীয় অভ্যন্তর পুরোপুরিভাবে জানতে সক্ষম, তা তার অভ্যন্তরস্থ প্রত্যেকটি ইচ্ছা ও কৃতি নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করতে পারবে এবং তখন সে বুঝতে পারবে যে মনের ভেতরে যা কিছু ঘটে, সর্বদাই তার একটি নিয়ত পূর্ববর্তী কারণ থাকে।

আমাদের সংকল্প ও কৃতি অনিবার্যভাবে কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এ কথা মেনে নিলেও, তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। এটা ঠিক যে, দেশকালাবচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে, এগুলো অন্যরকম হতে পারত, তা বলা যায় না। তবু, এদের বিপরীত সংকল্প ও কৃতিতে যৌক্তিক বিরোধ নেই; তাই, এরকম ভাবা অসম্ভব নয়। এই কথাই লাইবনিজ অন্য ভাষাতেও ব্যক্ত করেছেন। প্ররোচক ধারণাগুলো ইচ্ছাশক্তিকে একটা কিছু করার জন্য শুধু প্রেরণা, অথবা উৎসাহ দেয়, কিন্তু বলপূর্বক অনিবার্যভাবে তাদের নিয়ন্ত্রিত করে না। লাইবনিজের পরেও, অন্য অনেকে বহুবার এই কথাই বলেছেন। কিন্তু এতে লাইবনিজের বক্তব্য যে আগের চেয়ে ভালভাবে বলা হল, তা নয়। দ্বিতীয়ত:, সংকল্পের অবশ্যম্ভবতা[2] প্রকৃতপক্ষে কর্তারই স্বনিয়ন্ত্রণ—এটা কর্তার অন্ত:-স্বভাব থেকে কোন বাহ্য কারণের চাপ ছাড়াই প্রস্তুত হয়। কর্তা নিজ স্বভাব অনুযায়ী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেন; এবং প্রত্যেকেই নিজের কাঁধে স্ব-নিয়ন্ত্রণের এই দায়িত্ব বহন করে; কারণ, ঈশ্বর যখন চিদণুগুলোকে তাদের সম্ভাবনা-অবস্থা থেকে অস্তিত্বের রাজ্যে

---

1 Indeterminism.
2 Necessitation.

এনেছিলেন, তখন সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরের বুদ্ধিতে কূটস্থ-স্বভাব বিধারণারূপে তাদের যে স্বভাব ছিল, সেই স্বভাবের কোন পরিবর্তন ঘটান নি। এইভাবে, লাইবনিজ স্বপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণবাদ আর স্পিনোজীয় নিয়ন্ত্রণবাদের মধ্যে পার্থক্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার যে অপর এক ব্যাখ্যা লাইবনিজ নিজেই দিয়ে গেছেন, তা সম্পূর্ণভাবে স্পিনোজীয় মতের অনুরূপ। লাইবনিজের এই নতুন ব্যাখ্যাটি এইরকম। সংকল্পের নিয়ন্ত্রক ধারণাগুলো যতবেশী বিবিক্ত হবে, সংকল্প-স্বাধীনতার মাত্রাও তত বেশী হবে এবং মানুষ তার সংকল্পশক্তিকে যতবেশী হৃদয়াবেগ অর্থাৎ বিজড়িত ধারণার প্রভাব থেকে দূরে রেখে বিচার-বুদ্ধির অনুবর্তী রাখবে, ততই সে অধিক স্বাধীন হবে। একমাত্র ঈশ্বরই সম্পূর্ণ স্বাধীন ; কারণ, তাঁর কোন অবিবিক্ত ধারণা নেই। স্বাধীনতার এই দুটি অর্থ পরস্পরের সাথে অসমঞ্জস নয়। কারণ, অন্যান্য ধারণার তুলনায় বিচারমূলক ধারণাই মানুষের উচ্চতর স্বরূপ প্রকট করে—বিচার-বুদ্ধি থাকাতেই মানুষ ইতর জীব থেকে শ্রেষ্ঠ। প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে, মানুষকে সর্বদাই স্বাধীন বলতে হবে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে স্বাধীনতা মানে সক্রিয়তা, পূর্ণতা এবং নীতিমত্তা ; সুতরাং এই অর্থে মানুষের স্বাধীনতাকে পুরোপুরি বাস্তবও বলা যায় না ; বরং এই অর্থে স্বাধীনতা হচ্ছে মানুষের আদর্শ এবং স্বাধীন হওয়া তার কর্ত্তব্য। নীতিমত্তা হচ্ছে ব্যক্তির স্বাভাবিক উন্নতির ফল। প্রত্যেক প্রাণী পূর্ণতা বা ক্রমবর্ধিত সক্রিয়তা অর্থাৎ অধিক বিবিক্ত ধারণার জন্য চেষ্টা করে থাকে। এই জ্ঞানীয় প্রগতির সাথে সমানতালে ব্যবহারিক প্রগতিও হতে থাকে। ব্যবহারিক প্রগতির দুটি রূপ: (১) ধারণাগত বিবিক্ততার জ্ঞান বা বুদ্ধি-বিবেচনার বৃদ্ধি হ'লে, ক্ষণস্থায়ী ঐন্দ্রিয়িক সুখের পরিবর্তে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে স্থায়ী সুখ ও আনন্দের আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। তাছাড়া, এতে সর্বপ্রাণীর পারস্পরিক সম্বন্ধ ও বিশ্ব-রচনার পরম সামঞ্জস্যের উপলব্ধি হওয়ায়, নীতিমান ব্যক্তি স্ব-পর সকলের পূর্ণতা ও আনন্দ বাড়াতে চাইবে, অর্থাৎ সকলকে ভালবাসবে ; কারণ অন্যকে ভালবাসা মানে তার সুখে সুখী হওয়া। আবার সকলের মঙ্গলসাধন করা মানে জগতের সামঞ্জস্য বিধানে এবং ঈশ্বরের পালন ক্রিয়ায় তাঁকে যথাশক্তি সাহায্য করা। সততা[1] এবং ধর্ম-পরায়ণতা একই জিনিষ। এটাই লাইবনিজ-সম্মত স্বাভাবিক ন্যায়-

1 Probity.

পরায়ণতার সর্বোচ্চ স্তর। ন্যায়পরায়ণতার তিনটি স্তর আছে: (১) কেবল ন্যায়বুদ্ধি[1]—এর আদেশ-বাক্যটি হচ্ছে, কারো অনিষ্ট করবে না; (২) সমতা[2] অথবা উদারতা[3]—এর উপদেশ-বাক্যটি হচ্ছে, যার যা প্রাপ্য, তাকে তা দাও; (৩) এবং সততা ও ধার্মিকতার সংযোগ-এর আদেশবাণী হচ্ছে সৎ ও বিশুদ্ধ নৈতিক-জীবন যাপন কর। এই তিনটিকে ক্রমান্বয়ে (১) শান্তির লঘুতা-সম্পাদক ন্যায়পরায়ণতা, (২) সর্বত্র ন্যায্যতার বিতরণকারক ন্যায়পরায়ণতা, (৩) এবং সর্বব্যাপী ন্যায়পরায়ণতা, এসব নামে অভিহিত করা যায়। শেষেরটির আচরণের জন্য ঈশ্বরে এবং আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস আবশ্যক।

4. ঈশ্বরতত্ত্ব ও আত্মার অমরত্ব

ঈশ্বর জগতের কারণ, অধিষ্ঠান ও লক্ষ্য। সকল জীব তাঁর থেকেই এসেছে, আবার তাঁর দিকেই যাওয়ার চেষ্টা করছে। জীব-জগতের এই সাধারণ ঈশ-প্রবণতা মানুষের ভেতর সচেতন ভগবৎ প্রেমের স্তরে উন্নীত হয়। ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান এই প্রেমের নিয়ামক এবং সৎ আচরণ[4] এর ফল। জ্ঞানের জ্যোতি এবং নৈতিক সদ্‌গুণ[5] বা সচ্চরিত্র, এ দুটি হচ্ছে ধর্মের স্বরূপগত উপাদান[6]। ধার্মিক আচার অনুষ্ঠান এবং অভিমত প্রভৃতির নিজস্ব কোন মূল্য নেই। জ্ঞান ও সচ্চরিত্রের ওপরই এদের মূল্য নির্ভর করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতি ধর্মপরায়ণতার[7] ব্যবহারিক দিকের অপূর্ণ অভিব্যক্তি। আর বিনা বিচারে গৃহীত ও বিশ্বসিত ধর্মীয় মতবাদ হচ্ছে ধর্মপরায়ণতার জ্ঞানীয় দিকের অপূর্ণ প্রকাশ। নীতিমত্তার সাথে সম্বন্ধ নেই, এরকম ধর্মীয় গুপ্ত আচার অনুষ্ঠান, যন্ত্রমন্ত্র প্রভৃতিকে প্রাধান্য দেওয়া মানে আধ্যাত্মিক গুরুর[8] প্রকৃত অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ আচরণ করা। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মপন্থাতে যে মতবৈষম্য দেখা দেয়, সেগুলোর চেয়ে তাদের মতৈক্যগুলিই বেশী গুরুত্ববান। খৃষ্টধর্মে আমরা নৈসর্গিক ধর্মের সর্বোৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি

---

1 Mere right.
2 Equity.
3 Charity.
4 Virtuous action.
5 Virtue.
6 Essential constituents.
7 Piety.
8 Divine Teacher.

দেখতে পাই। অবশ্য, ইহুদি এবং প্রাচীন গ্রীক ও অন্যান্য অখৃষ্টীয় ধর্মেও সত্যের আংশিক প্রকাশ রয়েছে। অখৃষ্টীয়রা যে মুক্তির অনধিকারী, তা নয়। কারণ, ভগবৎ-কৃপা লাভের জন্য নৈতিক নির্মলতা ছাড়া অন্যকিছুর প্রয়োজন হয় না।

মানুষ মাত্রেই একটি নৈসর্গিক ধর্মবোধ আছে। তদুপরি, স্বয়ং ঈশ্বরও মানুষের কল্যাণার্থ কতক ধর্মতত্ত্ব কোন কোন মহাপুরুষের কাছে প্রকাশ করেন। এসকল তত্ত্ব আমাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ আকলন না করতে পারলেও, এরা যে বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে, এমন নয়। তা ছাড়া, বিচারবুদ্ধি মোটামুটি-ভাবে এদের স্বরূপ ধারণা করতে পারে এবং এসকল তত্ত্বের যথার্থতা সমর্থন করতে সক্ষম। ঈশ্বরের বিভূতির দ্বারা অপ্রাকৃত অলৌকিক ঘটনাও ঘটতে পারে। অবশ্য, এগুলোর উদ্দেশ্য এবং উৎপত্তি-প্রণালী আমরা বুঝতে পারি না। প্রাকৃতিক নিয়মের অবশ্যম্ভবতা অন্য-নিরপেক্ষ নয়—ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনে এদের যোগ্যতা আছে বলেই এসকল প্রাকৃতিক নিয়ম ঈশ্বর প্রণয়ন করেছেন। তাই, কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবানের পক্ষে ক্ষেত্র বিশেষে এসকল নিয়ম বাতিল করে দেওয়া সম্ভবপর।

ঈশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত ধর্মতত্ত্বগুলো শুধু শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করতে হয়—এদের সত্য বলে প্রমাণ করা যায় না; অবশ্য, যুক্তির দ্বারা এদের নিরাকরণও অসম্ভব। নৈসর্গিক ধর্মের তত্ত্বগুলো কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক যুক্তিগুলোর উপযোগিতা আছে বটে, তবু এদের কিছু কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। পূর্ণ দ্রব্যের ধারণা থেকে পূর্ণদ্রব্যের অস্তিত্ব নির্গত হয়, দেকার্ৎ-প্রদত্ত এই সত্তা-বিষয়ক যুক্তিটি[1] নির্দোষ বটে। তথাপি, এই যুক্তিটি দেওয়ার আগে, এটা দেখানো দরকার যে, ঈশ্বরের ধারণাটি সম্ভবপর, অর্থাৎ এই ধারণায় কোন স্ব-বিরোধ নেই। সৃষ্টি-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয়[2] যুক্তিটি এইরকম:—কদাচিদ্-ভব ও অন্যসাপেক্ষ সত্তা হচ্ছে কোন অবশ্যম্ভব ও স্ব-সাপেক্ষ সত্তার নিদর্শক; তেমনি আমাদের পরিজ্ঞাত সত্য-সমূহ তাদের অধিষ্ঠানরূপে কোন নিত্যবুদ্ধি ও চৈতন্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। যে-কোন পদার্থ অথবা সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে আমরা যদি

1 Ontological argument.
2 Cosmological.

জিজ্ঞাসা করি, "ঠিক এইরকম বস্তুটিই কেন অস্তিত্ববান?" তাহলে, আমাদের জিজ্ঞাস্য এই অন্ত্যহেতু জগতের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক কদাচিদ্-ভব পদার্থ অথবা কাযপদার্থের কারণ অপর কোন কার্য-পদার্থ। এই কারণ-পরম্পরা যতদূর ইচ্ছা অতীতের দিকে বিস্তৃত করলেও, কোথাও অন্ত্য ও কারণাজনিত কারণের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। কাজেই, এই পরম্পরার পূর্ণহেতু বাইরে অবস্থিত, এবং বিশ্বরচনার অপূর্ব সামঞ্জস্য দেখে এটাই স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, এই অন্ত্য জগৎ-কারণ হচ্ছে অনন্ত-জ্ঞান-সম্পন্ন এবং পরম কল্যাণময়। এইস্থলে উদ্দেশ্যবাদীয়[1] প্রমাণটির নির্দেশ যথাযোগ্য হবে। যুক্তিটি এই:—জগৎ এক উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিকে ক্রমশ: অগ্রসর হচ্ছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, জগতের এমন একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি তাঁর অগাধ বুদ্ধি, কল্যাণকর গুণ এবং শক্তির দ্বারা পরম মঙ্গলের সংকল্প ক'রে, তা নানাভাবে চরিতার্থ করছেন। লাইবনিজের প্রাক্-প্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্যবাদ বিশেষভাবে এই যুক্তির সমর্থন করে। কারণ, বিভিন্ন দ্রব্যের ভেতর যে অপূর্ব সারূপ্য লক্ষিত হয়, যেহেতু তা দ্রব্য সকলের পারস্পরিক পরিণাম-কারিতার দ্বারা ব্যাখ্যেয় নয়, তাই এটা যে এক অনন্ত জ্ঞান ও শক্তিশালী কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তা অবশ্য মানতে হবে।

আশাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে, সামান্য মানুষের সাধারণ অনুভবের দিকে দৃষ্টি রেখে, তা করতে হবে; আর এটাও দেখাতে হবে যে, আমরা যে-জগতে বাস করছি, তার অবশ্যস্বীকার্য অপূর্ণতা সত্ত্বেও, অন্য কোন জগৎ তার থেকে বেশী উৎকর্ষবান হওয়া সম্ভবপর নয়। এটা অবশ্য সত্য যে, ভগবান ইচ্ছা করলে, আমাদের জগৎ থেকে কিছু অল্প সংখ্যক ত্রুটিযুক্ত জগৎ নির্মাণ করতে পারতেন। কিন্তু ঐরকম জগতে বিভিন্ন পূর্ণতার সংখ্যাও তদনুপাতে কমে যেতে বাধ্য। এমন জগৎ থাকতেই পারেনা, যাতে খারাপ অথবা সসীম বলে কিছুই নেই। সসীমতা ও তার ওপর নির্ভরশীল কতকগুলো দোষত্রুটি যে-কোন সসীম পদার্থের সৃষ্টিতে অপরিহার্য আনুষঙ্গিক। সৃষ্ট পদার্থ সৃষ্ট বলেই, অপূর্ণতাযুক্ত। তদুপরি ঈশ্বর আরো কয়েকটি দোষ অনুমোদন করেছেন। এর হেতু এই যে, এসব দোষ না থাকলে, এমন কয়েকটি সদ্গুণের অভাব হত যে, সেগুলো পরিত্যাগ করা সংগত হবে না। উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধের কথা বিবেচনা

1 Teleological.

করা যেতে পারে। যুদ্ধের সময় যুদ্ধজনিত যে প্রাণ ও ধন-সম্পত্তির হানি হয় এবং আরো অনেক লোক অশেষ দুঃখ দুর্দশায় পতিত হয়, তা দেখে, বহু দয়ালু লোক যুদ্ধের প্রথা পৃথিবী থেকে তুলে দিতে চান। কিন্তু যুদ্ধ-প্রথা একেবারে উঠে গেলে, দেশব্যাপী সর্বসাধারণের ভেতর যে উচ্চ ভাবাবেগ, উদাত্ত সংকল্প এবং মহৎ কৃত্য পরিদৃষ্ট হয়, তা কেমন করে থাকবে ?

যে অমঙ্গল বা অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী, তা শেষ পর্যন্ত কল্যাণেরই সহায়ক এবং পরিপোষক, এই কথা লাইবনিজ অপর একটি যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তিন প্রকার অকল্যাণ আছে : (১) সৃষ্ট সত্তারূপ আধিবৈজ্ঞানিক[1] অমঙ্গল, (২) দুঃখভোগ রূপ শারীরিক বা জড়-জগতীয় অমঙ্গল[2] এবং (৩) পাপ বা অধর্মরূপ নৈতিক অমঙ্গল।[3] আধিবৈজ্ঞানিক অমঙ্গল হচ্ছে সৃষ্টির অপরিহার্য আনুষঙ্গিক—সৃষ্ট প্রাণীর অপূর্ণতা অথবা সসীমতা থাকবে না, এটা ধারণার অতীত। জড়-জগতীয় দুঃখের সমর্থন এই যে, তাও কল্যাণের কাজেই লাগে। অসন্তুষ্ট মানুষ জগতে যত দুঃখ যন্ত্রণা আছে ব'লে এবং জীবন যতটা দুঃসহ ব'লে ভাবে, তার তুলনায়, প্রকৃত-পক্ষে সাধারণতঃ সংসারে বেশী সুখলাভের ব্যবস্থা রয়েছে। সুখ বেশী, না দুঃখ বেশী, তা হিসাব করবার সময়, কাজ করার সুখ, ভাল স্বাস্থ্যের সুখ এবং স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় না অথচ যে-সুখ না থাকলে খুব কষ্ট হয়, এই সবই জমার দিকে রাখার কথা ভুলে গেলে চলবে না। অধিকাংশ দুঃখই এমন ধরণের যে, তা আমাদের অধিক সুখলাভের জন্য অথবা দুঃখ দূর করার জন্য সাহায্য করে। আর বহু দুঃখকষ্ট আমাদের স্ব-কৃত পাপের ফল এবং এইজন্য এগুলো আত্মোদ্ধারের উপায়রূপে গণনা করার যোগ্য। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে, তার দুঃখ পরিণামে সুখের কারণ হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমগ্র জগতের কথা বিবেচনা করলে, স্পষ্ট প্রতিভাত হবে যে, অকল্যাণের যোগফল কল্যাণের সমষ্টির কাছে দাঁড়াতেই পারে না। মানবজাতির আনন্দকেই সমগ্র জগতের একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করা ভুল। ঈশ্বর নিশ্চয়ই বিচার-শীল প্রাণীর সুখ কামনা করেন। কিন্তু এটাই তাঁর একমাত্র কাম্য নয়। কারণ, বিচারশীল প্রাণী সমগ্র জগতের একটি অংশমাত্র। হয়তো, তারাই

1 Metaphysical evil.
2 Physical evil.
3 Moral evil.

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। তথাপি নিখিল বিশ্বের সামগ্রিক শৃঙ্খলা ও সুষমাই ভগবানের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সামগ্রিক সুষমার জন্য সত্তার সর্ব সম্ভবনীয় উচ্চ-নীচ স্তর বা মাত্রা প্রয়োজনীয়; অর্থাৎ অবিবিক্ত ধারণা, ইন্দ্রিয়ানুভব প্রভৃতি, এ সবই বিশ্বে থাকা দরকার—শুধু বিশুদ্ধ চৈতন্য-সম্পন্ন আত্মা থাকলে চলবে না; আর, এগুলোর সঙ্গে অপূর্ণতা, দুঃখ, জ্ঞান ও কৃতির নানারকম ভ্রান্তির কারণগুলো অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। বিশ্বের সুসংবদ্ধতা ও শৃঙ্খলার জন্য চিদণুর একটি জড়ীয় উপাদানও অত্যাবশ্যক। আর এইজন্য, অবিমিশ্র সুখ এই জড় উপাদানযুক্ত দেহী আত্মার পক্ষে সম্ভবপর নয়। নৈতিক অহিতের ক্ষেত্রেও বিচার করলে বোঝা যাবে যে, ভালর চেয়ে খারাপের পরিমাণ অনেক কম। তাছাড়া, নৈতিক অমঙ্গল আধিবৈজ্ঞানিক অমঙ্গলের সাথে নিবিড়ভাবে সম্বন্ধ সৃষ্ট জীবের পূর্ণতা, সুতরাং তার নৈতিক পূর্ণতা অথবা নিষ্পাপত্ব থাকা অসম্ভব। কিন্তু এর বিপরীত দিকে, অপর একটি কথাও বিচারার্হ। এমন কোন অস্তিত্ববান পদার্থ নেই, যা সর্বতোভাবে অপূর্ণ, যা শুধু খারাপ। এ সব যুক্তির সাথে লাইবনিজ প্রাচীন দার্শনিকদের একটি যুক্তিরও সাহায্য নিয়েছেন। যুক্তিটি হচ্ছে এই: অহিতের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নেই; এর স্বরূপ হচ্ছে অভাবাত্মক; স্পষ্ট বিচার ও সংকল্প-শক্তির ন্যূনতাই হচ্ছে অহিত। অপকর্মের ভেতর যেটুকু ভাল, তা হচ্ছে কাজ করার ক্ষমতা, আর এই ক্ষমতা তার নিজস্ব স্বরূপে পরিপূর্ণ এবং কল্যাণপ্রদ। বল বা শক্তি একমাত্র ভগবান থেকেই আসে; সুতরাং অসৎকর্মের খারাপ অংশটুকুর জন্য কর্তা নিজে দায়ী; দুটি সম আকারের জাহাজের ভেতর একটিতে অপরটির চেয়ে বেশী মাল চাপিয়ে তাদের নদীর স্রোতে চলতে দিলে, বলা যায় যে, তাদের গতিবেগ স্রোত থেকে আসে এবং এই গতির অন্তরায়টি হচ্ছে জাহাজে চাপানো মাল। পাপের জন্য ঈশ্বর দায়ী নন। অবশ্য, এই ব্যাপারে, ঈশ্বরের অনুমতি নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎ সংকল্প ও প্রবৃত্তি নেই; তা ছাড়া, সৃষ্টির পূর্বে, মানুষ অকল্যাণ-প্রবণ ছিল; ভগবান আগে থেকেই জানতেন যে, মানুষ পাপাচরণ করবে; কিন্তু ঈশ্বরের এই ভবিষ্যৎ জ্ঞান মানুষকে দুষ্কর্ম করতে বাধ্য করে না। মানুষের দুষ্কৃতি তার নিজ স্বভাব থেকে প্রসূত হয়। ভগবান যখন মানুষকে অস্তিত্ব দান করেন, তখন তার যে মূল স্বভাব ছিল, তাই রেখেছেন। অমঙ্গল থেকে যে সকল নানারকম মঙ্গলের উৎপত্তি হয়, তা থেকেই বোঝা যায় যে, অমঙ্গলের জন্য ভগবানের অনুমতি রয়েছে। তা ছাড়া, বিশ্বের এখানে সেখানে কিছু

অমঙ্গল সমগ্র বিশ্বের পূর্ণতার জন্য আবশ্যক। সঙ্গীতে বিষমবাদী[1] সুরের যে কাজ, অথবা চিত্রে আলোর পাশে ছায়ার যে কাজ, বিশ্বে অমঙ্গলেরও ঐ একই কাজ—এতে সমগ্রের সৌন্দর্য বর্ধিত হয়।

ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা ও কল্যাণময়ত্বের জন্য লাইবনিজ যে যুক্তি দিয়েছেন, তার ভেতর নৈতিক অমঙ্গলের সমর্থনটি সকলের চেয়ে দুর্বল। এর তুলনায়, হেগেল-প্রদত্ত নৈতিক অমঙ্গলের সমর্থন অনেক বেশী সন্তোষজনক। হেগেলের মতে, কল্যাণ শুধু শান্ত ও অপ্রতিবন্ধ সরল বিকাশের ফল নয়, কিন্তু তা হচ্ছে বলিষ্ঠ উদ্যম ও পরিশ্রমের ফল, মঙ্গলের অস্তিত্ব অমঙ্গল-সাপেক্ষ। কর্মকর্তার ভেতরে বাইরে যে অহিত রয়েছে, তার সাথে যুদ্ধ করা যে শুধু ভাল, তা নয়; অধিকন্তু এই যুদ্ধ মঙ্গলপ্রাপ্তির জন্য অত্যাবশ্যক। নীতিমত্তা পদার্থটি যেমন একদিকে আশয়-শুদ্ধির ওপর নির্ভর করে, তেমনি সংকল্প-বলের ওপর নির্ভর করে, আর বলের বিকাশ দ্বন্দ্ব ও প্রতিরোধ ছাড়া সম্ভবপর নয়।

নীতির ক্ষেত্রে, পরিমাণীয় দৃষ্টি প্রয়োগ করে, লাইবনিজ অহিতকে অনভিব্যক্ত হিত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ভ্রান্ত বলে মনে হয়। তবু, তিনি দুঃখভোগের যে একটি গভীর অর্থ দেখতে পেয়েছেন, তা পুরোপুরিভাবে হৃদয়ঙ্গম করা কিছু কঠিন হলেও, এ সম্পর্কে তাঁর মতটি বেশ বিচার-সহ ও সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয়।

1 Discord.

শব্দ কোষ

ইংরেজী-বাঙলা

Abstract—নিষ্কৃষ্ট
Abstraction—নিষ্কর্ষণ
Appendix—পরিশিষ্ট
Apperceived—প্রতিসংবেদিত
Apperception—প্রতিসংবেদন
Archetype—মূল আকৃতি, মূল ছাঁচ
Attribute—গুণ, ধর্ম

Best of all possible worlds—সম্ভাব্য জগৎগুলোর ভেতর সর্বোত্তম জগৎ

Categorical Imperative—সর্তহীন আদেশ
Causa sui—স্ব-কারণ, নিজেই নিজের কারণ
Complex—মিশ্র, বিমিশ্র
Conato—প্রচেষ্টা, প্রযত্ন
Concept—বিধারণা
Confused—ব্যামিশ্র, বিজড়িত, গোলমেলে
Consequence—সমনুগমন
Contingent—আকস্মিক, কাদাচিৎক
Continuous—অবিচ্ছিন্নভাবে ধারাবাহিক
Co-ordinate geometry—সমকোটিক জ্যামিতি
Correspondence—আনুরূপ্য
Correspondent—অনুরূপ
Cosmological argument—সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যুক্তি
Cosmology—ব্রহ্মাণ্ড শাস্ত্র, জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব

Deduction—অবরোহ, নিগমন
Desire—ইচ্ছা
Determinatio est negatio—বিশেষণ দিলে নিষেধ করা হয়
Dialectical method—দ্বন্দ্বাত্মক পদ্ধতি
Distinct—বিবিক্ত

Emotion—হৃদয়াবেগ, আবেগ, ভাবাবেগ
Epistemology—জ্ঞানশাস্ত্র, জ্ঞানবিদ্যা, জ্ঞানবিষয়ক বিজ্ঞান
Existence—বস্তু-সত্তা, অস্তিত্ব
Evolution—উৎক্রান্তি, বিকাশ

Fact—বস্তু-স্থিতি
Feeling—হার্দিক বেদন, হার্দিক চেতনা, হার্দিক ভাব

Force—বল, শক্তি
Fortitude—মনোবল

General concept, General idea — সামান্যায় ধারণা
Good—মঙ্গল, কল্যাণ, ভাল

Harmony—সুর-সঙ্গতি, সুর-সামঞ্জস্য

Identity—অভেদ
Identity of indiscernibles—ভেদ-গ্রহাযোগ্যের অভেদ
Image—মনশ্চিত্র
Implication—অর্থাক্ষেপ, অর্থাপত্তি
Implied—অর্থাপন্ন, অর্থাৎসিদ্ধ
Impulse—প্রেরণা
Indeterminism—অকারণতাবাদ
Indistinct—অবিবিক্ত
Individual—ব্যক্তি, বৈয়ক্তিক
Induction—আরোহ পদ্ধতি
Innate idea—অন্তর্নিহিত ধারণা
Insight—অন্তর্দৃষ্টি
Insight of genius—প্রাতিভ

Intellectual—বৌদ্ধিক
Intellectual love—প্রজ্ঞা-সম্ভূত প্রেম, বিচারাত্মক প্রেম
Intelligible—বোধগম্য, সোপপত্তিক

Judgement—অবধারণ

Logical—যৌক্তিক
Logically—যুক্তিত:

Magnanimity—ঔদার্য, উদারতা
Mechanics—বলবিজ্ঞান
Metaphysics—অধিবিজ্ঞান
Methodic doubt—বিচারপদ্ধতীয় সংশয়
Modal—প্রকারীয়
Mode—বিশিষ্ট প্রকার, প্রকার, বিশেষ অবস্থা
Modern—আধুনিক
Monad—চিদণু, চেতন অণু
Mutilated—খণ্ডিত

Natural—স্বাভাবিক
Natura naturans—প্রকৃতির প্রকৃতি, প্রকৃতির মূল স্বরূপ
Natura naturata—প্রকৃতির প্রকর্তা, প্রকৃতির স্রষ্টা
Nature—প্রকৃতি, জড়জগৎ, স্বভাব
Necessary—অবশ্যম্ভব, অপরিহার্য
Necessary connection—অবিনাভাব, অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ
Necessitation—অবশ্যম্ভবতা

Objective—বিষয়-সম্বন্ধী
Occasionalism—উপলক্ষবাদ
Ontological argument—সত্তা-জ্ঞাপক যুক্তি
Ontology—সত্তা-শাস্ত্র, সত্তা-বিজ্ঞান
Optimism—আশাবাদ

Order of sequence—অনুবৃত্তির ক্রম
Organic whole — সু-সংঘটিত সংঘাত
Organic world—জীবজগৎ
Organism—জীব
Original—মৌলিক

Passion—চিত্তের নিষ্ক্রিয় অবস্থা
Perceived—প্রত্যক্ষীকৃত, সংবেদিত
Perception—ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ
Pessimism—দুঃখবাদ, নৈরাশ্যবাদ
Phenomenological method—ভান-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি
Phenomenology—ভান বিজ্ঞান
Power—শক্তি, ক্ষমতা
Practical reason—কৃত্যাত্মক প্রজ্ঞা
Pre-determination—পূর্ববিধায়িত্ব
Pre-established harmony—পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত মিল, পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্য
Primary—প্রাথমিক
Principle—মৌলিক তত্ত্ব, মূল তত্ত্ব
Principle of sufficient reason—পর্যাপ্ত হেতুর তত্ত্ব অথবা নিয়ম
Probandum—উপপাদ্য, সিদ্ধান্ত
Probans—উপান্ত
Proposition—বিধান

Rational—যৌক্তিক, যুক্তিবিচারানুগ
Rationalism—যুক্তিবাদ, বুদ্ধিবাদ
Rational knowledge—যৌক্তিক
Reality—বস্তু-সত্তা, অস্তিত্ব
Real object—ভূতার্থ
Reason—প্রজ্ঞা, যুক্তিবিচার, বিচার-বুদ্ধি
Recent—সমপ্রতিকালীন
Reflection—অনুচিন্তন, প্রতিবিম্ব
Reformation—ধর্ম-সংস্কার
Representative force—ধারণা-জনক বল

Scholasticism—পণ্ডিতীয় দর্শন
Secondary—দ্বৈতীয়িক
Self-evident—স্বতঃসিদ্ধ
Sensation—ইন্দ্রিয়-সংবেদন, সংবেদন
Sense-datum—ইন্দ্রিয়োপাত্ত
Solipsism—নিজৈক-সত্তাবাদ
Spirit—আত্মা
Subjective—জ্ঞাতৃ-সম্বন্ধী
Sub specie aeternitatis—শাশ্বত তত্ত্বের দৃষ্টিতে, শাশ্বত তত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে
Substance—দ্রব্য
Sufficient reason—পর্যাপ্ত হেতু, যথাপ্রয়োজন হেতু

Teleological causality—উদ্দেশ্য-কারণতা
Teleology—উদ্দেশ্য-কারণতাবাদ
Temperance—মিতাচার

Transcendental method—অনুভবাতিগ পদ্ধতি

Universal — জাতি, সামান্য, সার্বিক

Vigour of soul—আত্মিক বীর্য

Virtue—সদ্‌গুণ, নীতিমত্তা

Volition—নিজ-নির্বাচিত ইচ্ছা

Will—সঙ্কল্প, ইচ্ছা-প্রযত্ন

শব্দ কোষ

বাংলা-ইংরেজী

অনুবৃত্তি—Continuation
অবিবিক্ত—Indistinct
অর্থাক্ষেপ } Implication
অর্থাপত্তি }
অর্থাপন্ন—Implied

আকলন—Comprehension, Understanding

ইন্দ্রিয়-সংবেদন—Sensation

উপপত্তি—Intelligibility

উহাপোহ—Detailed discussion

এষণা—Volition

কর্তব্যাত্মক প্রজ্ঞা—Practical reason

নির্ঘণ্ট—Index
নির্বচন—Interpretation
নির্বাচন—Choice
নিষ্কর্ষণ—Abstraction
নিষ্কৃষ্ট—Abstract

বিবিক্ত—Distinct
বিসংগত—Inconsistent
বিসংগতি—Discordance
বেদন—Feeling
ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম—A character which belongs to many things collectively

মজ্জাতন্তু—Nerve

সঙ্গতি—Harmony
সন্ততভাব—Serial continuity
সম্যক—True, Proper, Right
সর্বানুস্যূত—All-permeating
সর্তহীন আদেশ—Categorical Imperative
সোপপত্তিক—Intelligible, Reasoned

স্ব-সংবেদক—Self-conscious

হার্দিক—Of the heart
হার্দিক-সংবেদন—Feeling
হৃদয়াবেগ—Emotion

নির্ঘণ্ট

বিষয়

বিষয়

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
2	প্রভতি	প্রভৃতি
3	বিচারব্দ্ধি	বিচারবুদ্ধি
17	গাভতার্থ	গর্ভিতার্থ
	প্রতিনিবত্ত	প্রতিনিবৃত্ত
27	হেত	হেতু
29	বিবিত্তভাবে	বিবিক্তভাবে